নিসর্গ

মির্জি অণ্ণারায়

অনুবাদ
ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

ভূমিকা

কন্নড় সাহিত্যের ইতিহাস এক হাজার বছরের বেশি হয়ে গেলেও, কন্নড়/কর্ণাটকী উপন্যাসের বয়েস এখনো একশো বছর হয় নি, তবুও, এরই মধ্যে কন্নড় উপন্যাস কল্পনাতীত সমৃদ্ধি লাভ করেছে, এবং প্রত্যেক বছরে সমৃদ্ধতর হচ্ছে। কাজেই, একটি মাত্র উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করে কন্নড় উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ণ খুবই অসম্ভব। অবশ্য এটাও ঠিক যে বিপুলায়তনই সাহিত্যের গুণ নির্ণয় করে না।

উপন্যাস কী, সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম, কোথায়, কখন? তার বিকাশ, রূপরেখা কন্নড় সাহিত্যে উপন্যাসের অস্তিত্ব ভূমিকা এবং বিকাশ হিসাবে তারই একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার জন্যে এই লেখা, সামগ্রিক কন্নড় উপন্যাসের আলোচনার জন্যে নয়।

উপন্যাস কী তার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় অসম্ভব, সাহিত্যে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এর কোনো নিশ্চিত, নির্দিষ্ট রূপ নেই। সাধারণত, উপন্যাসে কোনো জাতিবিশেষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, রুচি, সংস্কৃতি, আচার বিচার প্রতিফলিত হয়। দেশ কাল বদলের চিহ্ন উপন্যাসের কাহিনী অংশে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। যেহেতু মানুষী কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্তু

—সেই হেতু যে-কোনো সাহিত্যে উপন্যাস একটি জীবন্ত ও জনপ্রিয় ধারা।

কন্নড় উপন্যাসের আকর পশ্চিমী সাহিত্য। মুখ্যত ইংরেজি। কন্নড় 'রেনেসাঁতেই' ইংরিজি সাহিত্যের প্রভাব আছে। ইউরোপে যখন উপন্যাসের বয়স তিনশ বছর হয়ে গেছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, কারুকর্মে, গঠন-শৈলে, তখন, এই সবের ফল দেখা গেল কন্নড় সাহিত্যে এই শতাব্দীর তিন দশকে।

একথা বলছি না যে 1920-র আগে কন্নড় উপন্যাস লেখা হয় নি। হয়েছিল, কিন্তু ভালো উপন্যাস ছিল খুবই কম। মুদ্দন্যার 'গোদাবরী' উপন্যাস ছিল অর্ধলিখিত, কৌপুনারায়ণের 'মুদ্রামঞ্জুষ' ছিল সরলীকৃত ভাষার উপন্যাস-সুলভ কথনশৈলী। গুলবাদি অন্নারায় 1899 সালে একটি সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। এই সময়ে মৌলিক উপন্যাসের শুরুতে বোলার বাবুরায়ের 'বাগদেবী', এম. এস. পুটুনীর 'মাতিদ্যুনো মহারায়া', কেরুর বাসুদেবাচার্যের 'ইন্দিরে' আর শ্রীমতী নিরুমল্যম্মার উপন্যাসগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম উপন্যাসে বৈদিক সমাজের অবনতির চিত্রণ, দ্বিতীয়টিতে মহীশূরের জনজীবন, তৃতীয়টিতে সুখী সমাজের কাল্পনিক ছবি, এবং চতুর্থে, অর্থাৎ শ্রীমতী নিরুমল্যম্মার উপন্যাসে, সামাজিক চর্চা এত বেশি যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

আসলে, কন্নড় উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাব এসেছে বাংলা আর মারাঠি উপন্যাসের মাধ্যমে। ওয়ালটার স্কট-অনুসৃত বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসের কন্নড় তরজমা করেন বি. বেঙ্কটাচার্য। বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী—আজও সমান জনপ্রিয়। ঠিক এইভাবেই আপ্তের মারাঠি উপন্যাস 'ইখরিসূত্র', মারাঠার 'অভ্যুদয়', 'কুমুদিনী', প্রভৃতির কন্নড়ে অনুবাদ করেছিলেন গোলকনাথ।

গঙ্গানাথ 'মাধরকরুণ বিলাস' নামে একটি মৌলিক উপন্যাস লিখেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর অনূদিত উপন্যাসের ন্যূনতম মানেও পৌঁছয় নি। তবে, এই শেষোক্ত দুই অনুবাদকের জন্যে কন্নড়-এর পাঠক-পাঠিকা উপন্যাসের স্বাদ প্রথম বুঝতে পারেন। এই সমস্ত লেখকদের জন্যেই

কন্নড় গদ্যে এক নব্যরীতি দেখা গেল।

কন্নড় সাহিত্যে যথার্থ 'নবোদয়' শুরু হয় বি. এম. শ্রীকংটয়্যর কলমে। শ্রীকংটয়্যর-প্রদর্শিত পথে যে পরিক্রমা আরম্ভ হয়, তা এখনো চলছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ, অনুসরণ, সেইসঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত নিজস্ব প্রকাশ, এ সবই শ্রীকংটয়্যর জন্যে সম্ভব হয়েছে। যদিও, এই প্রভাব সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, তবুও উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটু বেশি আলোচ্য বিষয়-ও উপন্যাস।

1920 থেকে 1947 সাল কন্নড় উপন্যাসের 'সংক্রান্তি কাল'— তার পরের বছরগুলো 'ঔৎকর্ষ কাল' হিসেবে চিহ্নিত। এই সময়ের উপন্যাসের বিষয়বস্তু এইভাবে ভাগ করা যায়ঃ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, আঞ্চলিক, সমস্যাভিত্তিক, বিচারভিত্তিক, রাজনীতিভিত্তিক ও মনস্তত্ত্বভিত্তিক। এক-একটি উপন্যাসে এক-একটি বিষয়ের-যে চর্চা হোত তা নয়—সব বিষয়ই একত্রিত হয়েও চর্চা হোত।

রেনেসাঁর আগে ছিল ঐতিহাসিক যুগ বা অনূদিত উপন্যাসের যুগ। সংক্রান্তি যুগে ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রায় লেখাই হয় নি তিনটি উল্লেখ-যোগ্য ছাড়াঃ দেবুড়ু নরসিং শাস্ত্রীর 'ময়ূর', আনন্দকন্দর 'রাজযোগী' ও 'অশান্তিপর্ব'। আনন্দের উপন্যাসের বিষয় ছিল বিজয়নগরের রাজ-নীতিক-সামাজিক জীবন। এ ছাড়া আরো তিনটি উল্লেখ্যঃ শিবরাম কারন্ত-এরপ্রথম উপন্যাস 'দেবদূত', শ্রীরঙ্গ-এর 'বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি' ও না, কস্তুরী'র 'গালিগোপুরা'। প্রথম উপন্যাসটি সামাজিক চিত্রলেখ ও পৌরাণিক আখ্যানের এক সূচিমুখ বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়টি চরিত্র-বিশ্লেষণে অপূর্ব এবং তৃতীয়টি হাস্যরসপ্রধান বিভিন্ন সামাজিক বিড়ম্বনার কাহিনী। কস্তুরীর আর-একটি হাসির উপন্যাস 'চক্রদৃষ্টি'। চক্রদৃষ্টি—চরিত্রপ্রধান নবরীতির গদ্য লেখার প্রথম প্রয়াস যা দেবুড়ু'র 'অন্তরঙ্গ' উপন্যাসেও পাওয়া যায়। 'অন্তরঙ্গ' উপন্যাসে মনস্তত্ত্বপ্রধান চৈতন্যবাহী আঙ্গিক প্রথম উপস্থিত হয়। এই জাতীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে কারন্ত-এর 'সুলের সংসারা' 'বৈদদজীব' আঞ্চলিক, শ্রীরঙ্গর 'ভয়মপ্পন ভূত' গোয়েন্দা উপন্যাস ও রসিকরঙ্গ-এর 'বালুরি', 'কারণ পুরুষ' সমস্যাভিত্তিক উপন্যাস।

অন্যান্যদের মধ্যে, শ্রীরঙ্গর রাজনৈতিক উপন্যাস 'সুদর্শন', 'বিভুগডে বোলে' ছাড়া—মাস্তি বেঙ্কটেশ আয়েংগারের 'সুবন্যা' লঘু উপন্যাস, এতে নায়ক একজন গায়ক।

গায়ক নায়কের পরেই, এ. এন. কৃষ্ণরাও-এর 'সন্ধ্যারাগ' প্রথম লেখা 'উদয়রাগ' চিত্রকর নায়কের কাহিনী তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কৃষ্ণরাও এর পরেই 'সাহিত্যরত্নে' সাহিত্যিককে নিয়ে, 'নটসার্বভৌম'-তে একজন নটের জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখেন। সমাজজীবনের সঙ্গে শিল্পীজীবনের বিরোধিতা দেখানোই ছিল এই উপন্যাসগুলির মূল বিষয়।

কন্নড় উপন্যাসের আরম্ভের যুগে সর্বাধিক উপন্যাস লিখেছেন শিবরাম কান্ত। 45 বছর বয়েসের মধ্যে 30-35টি উপন্যাস লেখা অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। 1947-এর আগে শিবরামের উপন্যাসের সংখ্যা ছিল সাত-আটটি। 'সুলেয় সংসারা'-এর কথা আগেই বলেছি, শিবরাম-এর 'নরসম্মান সমাধি' নীরস দাম্পত্যজীবন-কেন্দ্রিক, 'চোমন ডুডি' অস্পৃশ্যসমস্যাভিত্তিক ও 'বৈদজীব' আঞ্চলিক উপন্যাস। 1942-এ প্রকাশিত 'মরলিমনিগে' শিবরামের শ্রেষ্ট উপন্যাস, তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার চূড়ান্ত পরিব্যাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত। 'মরলিসন্নিগে'-তে নিসর্গ ও মানবজীবন একাকার হয়ে গেছে।

এই জাতীয় আর একটি উপন্যাস কে. বি. পুটুপ্পা'র (কুবেপু) 'কানরু হেবগডতি'—স্বাদে আঞ্চলিক হলেও আবেদন সর্বজনীন। কন্নড় সাহিত্যের উপন্যাসে এই উপন্যাসটি 'গদ্য-মহাকাব্য' হিসেবে স্বীকৃত।

কন্নড় ভাষায় বৃহদাকার উপন্যাস 'সমরসবে জীবন'-এর প্রথম খণ্ড 'ইজজোড়ু'—কারন্ত ও কুবেপু যেভাবে তাঁদের উপন্যাসে চরিত্রলেখন করেছিলেন—ঠিক ওইভাবে বিনায়ক (বি. কে. গোকাক) তাঁর 'সমরসবে জীবন'-এ উত্তর কর্ণাটকের পটভূমিতে কাহিনী শুরু করেছিলেন। দুই পরিবারের প্রকোষ্ঠবদ্ধ জীবন কীভাবে বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে পারিপার্শ্বিক অবস্থায়—বিনায়ক তাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন এই বৃহৎ উপন্যাসে। বিশ বছর ধরে তিনি এই উপন্যাস শেষ করেন। বিনায়কী জীবনদর্শন, জীবন-অনুভব ও প্রতিভার প্রামাণ্য

দলিল 'সময়সবে জীবন'।

এই সময়, বিভিন্ন বিষয়মুখী আরো অনেক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। আঙ্গিকে, গল্পে, বর্ণনায়— এই সময়ের আশি-নব্বুইটা উপন্যাস যে-কোনো ভারতীয় ভাষায় লেখা উপন্যাসের চেয়ে নিকৃষ্ট তো নয়ই, বরং উৎকৃষ্ট। পরের অবস্থায়, দেশকাল আলাদা হল, কর্ণাটক পুনর্গঠিত হল, আরো বেশি মননশীল, সৃজনশীল লেখার আবির্ভাব ঘটল।

বিনায়কের 1934-এর আরম্ভ করা 'ইজজোডু' 1954 সালে শেষ হয়ে 'সময়সবে জীবন' নামে প্রকাশিত হয়। এর কিছু পরেই, কুবেপু'র দ্বিতীয় উপন্যাস 'মলয়েল্লি মদুমগলু' বেরোলো।

এই ছাব্বিশ বছরের মধ্যে কারন্ত এত উপন্যাস লিখেছেন যে কন্নড় ভাষায় এমন একজন পাঠকও নেই যিনি কারন্ত-এর কোনো-না-কোনো উপন্যাস না পড়েছেন। শিল্পানুগ এই উপন্যাসগুলিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বুদ্ধিদীপ্তির চমক পাঠককে অবাক করে দেয়। লেখক দেশের এক কোণ থেকে আর এক কোণে বার বার ঘুরে বেড়িয়েছেন উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করার জন্যে। সনিষ্ঠ এই লেখকের প্রতিটি উপন্যাসই তাই বাস্তব এবং যথার্থ। এঁর আজও সমাদৃত উপন্যাসগুলি ; 'কুদিঅর কুস্থ', মুগিয়দযুনদ, সন্দাসিয় বটুকু, মোগপডেদ মন, চিগুরিদ কনস্থ, করুলিন করে, আল নিরাল, অলিদ মেলে। এই মহান ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে সারা ভারত গর্ব করতে পারে।

'উৎকর্ষ' কালের অন্যান্য অনেক উপন্যাসের মধ্যে 'মঙ্গল সূত্র', 'গৃহলক্ষ্মী'— আদর্শপ্রধান উপন্যাস। 'শিবসন্তান', 'নগ্নসত্য', 'সংজে গতেলু' ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে মানুষের অধঃপতনের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। এই ধরনের উপন্যাস লিখিয়েদের মধ্যে ত. রা. সুব্বারাও পতিতাজীবন, পর-স্ত্রী প্রবণতা ইন্দ্রিয়সচেতন শ্লথ জীবনের সমস্যা সম্পর্কিত উপন্যাস লিখেছেন। এ ছাড়া, তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও যেমন, হংসগীতে, কমবনিয়কুয়িলু, রক্তরাত্রি, তিরগুবাণ, খুবই লোক-প্রিয়। অতীতের ঘটনা বর্তমানের ভাষায় ব্যক্ত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল সুব্বারাওয়ের।

ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার চেষ্টা আরো অনেকেই করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার মতো কল্পনার সমৃদ্ধি বা আঙ্গিক সবার ছিল না— এটা অনায়াসেই বলা যায়। যে কজনের ছিল তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীজী। শাস্ত্রীজী'র 'চেন্নবসব নায়ক' ও 'চিক্যবীর রাজেন্দ্র' পড়লে বোঝা যায় লেখক হিসেবে তিনি কতটা নিষ্ঠাবান, বিদগ্ধ, রুচিশীল ছিলেন। শাস্ত্রীজী'র পরেই নাম করা যায় কে. বি. আয়ার-এর। আয়ার-এর 'শাঁওতলা', 'রুপদর্শী' পুরাণ-ইতিহাস মিশ্রিত। প্রসঙ্গত, সমেতনইললি রামরায়-এর 'গন্দবরণী' স্মর্তব্য। পৌরাণিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ছিলেন মাত্র একজন: দেবেড়ু নরসিং শাস্ত্রী। দেবেড়ুর তিনটি উপন্যাস 'মহাব্রাহ্মণ', 'মহাক্ষত্রিয়', 'মহাদর্শন'— প্রাগৈতিহাসিক পটভূমিকায় অতীত ও বর্তমানের এক শিল্পিত সেতু।

অতীত-বর্তমানের সেতু উপন্যাসের মাধ্যমে স্থাপনের চেষ্টা আরো দু-একজন করেছিলেন। কোটি শ্রীনিবাস রায়-এর টিপু সুলতানের কাহিনী, বীর কেশরীর 'দোলন' ও এম. এন. মূর্তি'র 'সন্দান', 'সংবিধান' ও 'সংহার'— বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বি. পুটটুসাম্যার 'ক্রান্তিকল্যাণ' ছয় খণ্ডে প্রকাশিত উপন্যাস। দ্বাদশ শতাব্দীর কর্ণাটক এই উপন্যাসের উপজীব্য। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, প্রশাসন, কীভাবে একসূত্রে গ্রথিত হতে পারে 'ক্রান্তিকল্যাণ' তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সীমিত ক্ষেত্র নিয়েও কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছিল। কারন্ত-এর 'কুডিয়র কুসু', গণপতির 'কন্নিকাবেরি', ভারতীসূত-এর 'হুলিঅবা'ণু, 'চিগরু হাসেগি'— সীমাবদ্ধ কোনো এলাকার সীমিত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস। বিন্দু মাধব-এর 'বলিপীঠ' এই ধরণের উপন্যাস। মির্জি অন্নারাও-এর 'নিসর্গ'-ও এই ধরনের—উত্তর কর্ণাটকী গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য। বি. এম. ইনামদার-এর 'কতসিত মনে', 'কটিদৃসনে' ও 'বাড়িটহুউবু' সুশিক্ষিত মানুষের জীবন নিয়ে সুশিক্ষিত পাঠকদের জন্যে লেখা। গোরুর রামস্বামি আয়েংগার-এর 'নমমুম্মিত রসিকরু'-এ এক

গাঁয়ের বহু মানুষের কাহিনী রম্য আঙ্গিকে চিত্রিত। পুরোপুরি 'পিকউইক পেপারস'-এর অনুসরণে এই রম্য উপন্যাস।

গোরুর-এর সমসাময়িক আর একজন শ্রীরঙ্গ (আদ্য রঙ্গাচার্য)। শ্রীরঙ্গ-এর হাস্যরস অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। এই লেখকদের প্রত্যেকেই পুরোনো দিনের জীবনপ্রবাহকে উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। ফলে, কন্নড় উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি' সম্ভব হয়েছে। শ্রীরঙ্গ পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির গভীর অনুশীলন করেছিলেন বলেই তাঁর উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ একটি উল্লেখযোগ্য দিক—যা আজও বেশ টাটকা এবং তাজা। শ্রীরঙ্গ-এর 'পুরুষার্থ', 'অনাদি', 'প্রকৃতি,' 'পুরুষ', 'কুমারসম্ভব'—প্রত্যেকটি উপন্যাসই দুর্বোধ্য প্রকৃতি আর মানুষের কাহিনী। প্রকৃতির বিচিত্র নিত্যতা, মানুষের তাৎক্ষণিক অস্তিত্ব এবং সংঘর্ষকে প্রতিপাদ্য করে রায় বাহাদুর 'গ্রামায়ণ' উপন্যাসে একালের রামায়ণ লিখে ফেলেছেন।

সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে এস. এল. ভেরাপ্পা 'বংশবৃক্ষ' উপন্যাসে জীবনের মূল্যবোধ ও মানুষের ব্যক্তিগত সংকটকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন এক বিরাট দৃশ্যপটে। জীবনের অন্বেষা ভেরাপ্পার উপন্যাসের মূল বিষয়। এঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে, 'গৃহভঙ্গ', 'মতদান', 'জলপাত', 'দূরসরিতুরু' ও 'নায়িরানেরলু'—খুবই উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, 'অন্তিম'-এ ভেরাপ্পা পুনর্জন্মবিষয়ক এক অনবদ্য কাহিনীতে, কিছু জাতিস্মর সমাবেশে সমাজ কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে—তা নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন।

পুরোপুরি মনোবিশ্লেষক উপন্যাসের প্রথম সূত্রপাত হয় শ্রীমতী অনুসূয়া ত্রিবেণীর লেখনীতে। 'বেধিকন কন্নু', 'দূরদবেউ', 'মুচ্চি-দবাগিলু,' 'শরপঞ্জর' ইত্যাদি উপন্যাসে এই ধারাটি লক্ষ করা যায়। শ্রীমতী অনুসূয়া'র 'হৃদয়গীত,' 'তাবরেকোল', 'ইল্লে চিগুরিদাগ', 'বসন্তগান', 'বেলিমোড' অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার কারণ লেখিকার বুদ্ধিদৃপ্ত জীবনবোধ, কৌতূহলী বাকবিন্যাস এবং লালিত্যময় আঙ্গিক। শ্রীমতীর উপন্যাসের মধ্যবিত্ত চরিত্র এত বাস্তব যে তা

প্রত্যেকেরই খুব পরিচিত মনে হয়। পুরোপুরি মেয়েলি-চোখে-দেখা সমাজটাকে উপন্যাসে যাঁরা চিত্রিত করেছেন তাঁদের মধ্যে বাণী, কে. এম. জয়লক্ষ্মী, এম. কে. ইন্দিরা ও অনুপমা নিরঞ্জন খুবই উল্লেখযোগ্য।

নিরঞ্জন, কৃষ্ণমূর্তি পুরানিক এবং বাসবরাজ কট্টিমণি—এই তিনজন লেখক প্রচণ্ড শক্তিমান। পশ্চিমের 'রাগী যুবকদের (angry youngmen) মতোই এঁরা সমাজটাকে সংশ্লেষণ করেছেন। অন্যায় অসত্য দুর্নীতি, সেইসঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ এঁদের লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়। কট্টিমণি'র 'জ্বালামুখীয় মৈলা' ও 'মন্ন্ মত্তু ঈনে', নিরঞ্জন-এর 'বনশংকরী' ও 'রঙ্গম্মন বটার'; পুরানিক-এর 'মুত্রেদে' ও 'বেবন্বিত বেলে' এই ধারার উল্লেখ্য সংযোজন। অন্যায় আর দুর্নীতির ফলশ্রুতিকেন্দ্রিক—'বরদসিরি' শিল্পীত এক সৃষ্টি। 'হস্বল' আদর্শ পথের বিপত্তি নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর এক কাহিনী।

অন্যান্য সনিষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আছেন হেমন্ত (ভগ্নমন্দির), যশরায় বল্লাল (হেমন্তগান), শান্তিনাথ দেশাই (মুক্তি), যশবন্ত চিত্রাল (মুরু দারি গলু : তিন যাত্রী), শংকর মোকাশি (গঙ্গব্বা গঙ্গামাই) ও ইউ. আর. অনন্তমূর্তি (সংস্কার)। এঁদের মূল্যায়ন এখনই অসম্ভব।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, কন্নড়-এর উপন্যাস-সাহিত্য সমুদ্রের মতো; দাবি করাটা অযৌক্তিক হবে না, ভারতীয় যে-কোনো ভাষার উপন্যাসের তুলনায় কন্নড় উপন্যাস কোনো অংশে কম নয়।

'নিসর্গ' মির্জি অন্নারাও-এর প্রথম হলেও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বেলগাঁ জেলার উত্তরদিকের এক গ্রামীণ জীবন/জনমানস এই প্রথম উপন্যাসে বিধৃত হল। আঞ্চলিক ভাষা-শৈলীতে অসাধারণ দক্ষতার জন্যে এই উপন্যাস সনিষ্ঠ, স্বাভাবিক ও সরল। দৈনিক জীবনের ভাষায়, ছোটো পরিবেশে মির্জি বিশিষ্ট একটা সৌধ নির্মাণ করেছেন। সমাজের কৃত্রিম শৃঙ্খল ও নিসর্গের নিজস্ব নিয়ম— যা সব সময়েই অম্লান ও অপরাজেয়— 'নিসর্গ' উপন্যাসের মূল কথা। সাংকেতিক, প্রতীকে

এই উপন্যাসের ক্ষেত্র খুবই পরিব্যাপ্ত। নিসর্গের প্রভাবে, বিবাহ-ধর্মের বিরোধে— অনন্ত আর তারার মিলন নিসর্গীয়। বিষয়টি সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করা হলেও অমুক্ত থাকে নি। লেখক স্পষ্ট করে বলেছেন : 'নিসর্গ নিজস্ব নিয়মে এগিয়ে চলে।'

যেহেতু উপন্যাসটি আঞ্চলিক, সেই হেতু বিশেষ অঞ্চলটির রীতিনীতি, আচারবিচার, অনুষ্ঠান, জীবন— সবই এতে নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই পরিবেশের মধ্যে শুরু হয়েছে অনন্ত আর তারার গল্প। নিসর্গীয় অনুভবে এদের প্রেম যখন গভীর— তখন সামাজিক উপাচারের চাপে এদের কীভাবে বিলীন হয়ে যেতে হোলো— বাল্যপ্রেম কীভাবে মৃত্যুতে পূর্ণতা— তা সুদক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে। জীবনবাহী মূল্যবোধকে অস্বীকার করার চেষ্টা করলে বিনাশ সুনিশ্চিত। নায়ক অনন্ত আদর্শবাদী নয়, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে জীবনের চোরাবালিতে আটকে পড়েছিল।

অন্নারাও-এর অন্যান্য উপন্যাসও গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য ও উন্মোচন; রাজনীতিক ও সামাজিক সমস্যার প্রকাশ। 'রাষ্ট্রপুরুষ', 'প্রতি সরকার', 'অশোকচক্র' 'ভস্মাসুর', 'রামানমাস্তর', আন্নারাও-এর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলেও, এর একটিও 'নিসর্গ'-এর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি।

সি. ডি. গোবিন্দরায়

গ্রীষ্মকাল। চৈত্র মাস প্রায় শেষ। সন্ধ্যের দিকে রোদের ঝাঁজ কমে এলেও, গরম কমার কোনো লক্ষণ নেই। ঘাম ঝরে দরদরিয়ে।

এই রকম এক বিকেলে, মগতুমদের উঠোনে বাচ্চারা খেলছিলো। বেশ জমাটি খেলা। একজন মাঝে দাঁড়ানো, তাকে ঘিরে চারপাশে এক গোলাকার বৃত্ত। বৃত্তটিতে, মাথায় ছোটো বড়ো ছেলে-মেয়েদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলো তারকা। বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে। বৃত্তের বাইরে সুমতি— তারকার বান্ধবী— খেলা চালু করার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো।

কাজ শেষ ক'রে তারকা বললো, 'সব হাত বাড়া এবার— খেলা চালু হবে।'

বাচ্চারা হাত বাড়িয়ে পরস্পরকে ধরে ফেললো। বৃত্তের ভেতরে একজন, বাইরে আর একজন। ওরা গান ধরলো প্রথমে :

উড়ুক, উড়ুক, পায়রা উড়ুক! ঘরেতে তেল নেই, বেরালের দুধ নেই, কুকুরের হাড় নেই— উড়ুক পায়রা উড়ুক, উড়ুক!

তারপর গানটি গাইতে-গাইতে সবাই সেই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। আর তারকা, মাঝে-মাঝে, কারুর কারুর মাথায় হাত দিয়ে গাইতে লাগলো সুর ক'রে :

মোতির মতো মা দেবো, সোনার মতো বউ দেবো ···

এই গানটি গাইতে-গাইতে এক-একজনের মাথায় হাত রেখে সে তাকে মোড় ক'রে বসিয়ে দিচ্ছে।

বিয়ের ধুমধাম গতকালই শেষ হয়ে গেছে। প্যানডেল অনেকটা খোলা হয়ে গেলেও, ছোটোখাটো কাজ তখনো চলছিলো। বিয়েবাড়ির কাজ-কর্ম করার জন্যে পাড়াপড়শিদের কাছ থেকে যেসব জিনিসপত্র আনা হয়েছিলো, সেগুলো ফেরত দেওয়ার জন্যেও মল্ল আজ তাদের ডেকেছে। ফলে, আজ মল্লদের বাড়িতেই ওদের খাওয়ার বন্দোবস্ত। ভেতরে, রান্নাবান্নার কাজ চলছিলো। ম্যারাপের এক কোণে, একটা তক্তপোষের ওপর জনা পাঁচ-ছয়—খাওয়ার ডাক না আসা অবধি—নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা চালাচ্ছিলো। আলোচনা হচ্ছিলো এই বিয়ে নিয়ে।

একজন বলে উঠলো : তারা ভালো ঘর পেয়েছে, এইটাই যথেষ্ট।

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটলো : ঘর ভালো পেলে কী হবে —বর ভালো পায় নি! ঘোড়ার পিঠে ইয়া মোটকা গদি দিয়ে ছেলেটাকে বসিয়েছিলো— যাতে ওকে কনের চেয়ে বড়ো দেখায়!

'কিন্তু আমাদের তারা', এক বৃদ্ধ তারকার বুদ্ধির তারিফ ক'রে সায় দিলেন, 'খুব চালাক মেয়ে। ব্যাপারটা টের পেয়েই ঘুড়চড়ি থেকে বাড়ি আসা অবধি একবারও মুখ তুলে তাকায় নি। কার মেয়ে দেখতে হবে তো! অমন গুণবতী মা।'

'আরে বাবা— সবই রক্তের সম্পর্ক। মল্ল তো নিজের বোনের ঘরেই মেয়ে দিলো। এতে আর হয়েছে কী—'

'গোড়া থেকেই সব ঠিকঠাক ছিলো। নিজের সাক্ষাৎ ছোটো বোনের ঘর, বাইরের তো কেউ নয়—'

'বাইরের হলে কী হোতো? চারশো পণ তো দিতোই আর মেয়েকে মাথায় ক'রে নিয়ে যেতো। ওই রকম মেয়ে পেলে—'

'কেন, এরাই বা কী কম দিয়েছে শুনি? নগদ হয়তো দেয় নি, কিন্তু জামাইকে ঢের সোনাদানা দিয়েছে—মল্ল তো, বলতে গেলে, সামর্থ্যের বেশি খরচাপাতি করেছে।' মল্লর স্বপক্ষে একজন তরুণ কথাগুলো বললো।

আরে—আমি কি তেমন কিছু বলেছি না কী? আর, খরচাপাতির কথা? মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে তো খরচাপাতি হবেই। তবে, শুনেছি রত্নার নাকি এখানে বিয়ে দেবার এতোটুকু ইচ্ছে ছিলো না—ওইটুকু এক রত্তি মেয়ে—কিন্তু নিজের বোনের বাড়ি ব'লে কোনোকিছু না ভেবে-চিন্তে মল্ল ওখানেই মেয়েটাকে দিলো। কাল যদি মেয়ে সুখী না হয়—দেখো কী হাল হবে! এই গাঁয়ে আমরা সবাই আছি— সকালে উঠে যদি একটা কচি মেয়েকে কাঁদতে দেখি—আমিও সহ্য করবো না—হুঁ! আর ওই চিম্মা বাপু বড়ো দজ্জাল মেয়ে— মল্ল'র বোন ব'লে তো আর ঢাক-ঢাক গুড়গুড় করবো না— শুনেছি, রত্না নাকি মল্লকে অনেক ক'রে বুঝিয়েছিলো—কিন্তু মল্ল সেসব কথা কানেই তোলে নি— পুরোপুরি নিজের মতে বিয়েটা দিলো।'

কথাগুলো কারুরই তেমন ভালো লাগছিলো না। তাই, উঠোনে বাচ্চাদের খেলা দেখতে মন দিলো সবাই। একটি ছেলে তখন ছড়া কাটছিলো: মোতির মতো বউ দেবো…

কিন্তু যেই তার চোখ পড়লো বড়োরা তার দিকে তাকিয়ে আছে, সে বেচারা লজ্জায় লাল হয়ে ঝুপ ক'রে ব'সে পড়লো। কাণ্ড দেখে সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলো। বড়োরা হাসছে দেখে ছোটোরাও হেসে গড়িয়ে পড়লো। ছেলেটি এবার আরও লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট ক'রে ফেললো। খেলাটা, এইভাবে আরো জোরে এগিয়ে চললো। তারকা আর সুমতি চক্রাকারে গান গাইতে-গাইতে দৌড়তে লাগলো, আর এক-একটি ছেলের মাথায় হাত রেখে-রেখে বসিয়ে দিতে লাগলো।

ঠিক এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটলো। তারকার বিয়েতে, ওই ছেলেটি, মামাতো ভাই, বছর আট বয়েস— এসেছিলো মাথায় চমৎকার একটা জরির কাজ করা টুপি প'রে। সে খেলছিলোও সযত্নে টুপিটা মাথায় চাপিয়ে রেখে। গাঁয়ের ছেলেরা তো বটেই, একটু বেশি বয়েসের মেয়ে-বউরাও সপ্রশংস দৃষ্টিতে টুপিটা দেখতে-দেখতে বলেছিলো : 'কী সুন্দর টুপি!' অনন্তর টুপিটার জন্যে তারকাও বেশ গর্ব অনুভব করেছিলো : আমার অনন্তর টুপিটা কতো সুন্দর!

এদিক হোলো কি, খেলার নিয়ম অনুযায়ী—সুমতি অনন্তর মাথায় হাত দিতে তারকা বেজায় রেগে গেলো, 'এই! তুই কী করলি! দিলি তো অনন্তর টুপির ভাঁজটা নষ্ট ক'রে? ছাড় আমার হাত—' ব'লে সুমতির হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে, অনন্তর টুপির ভাঁজটা যেদিকটায় তুমড়ে গিয়েছিলো সেইদিকটা *ঠিক* করতে বসে গেলো।

সুমতি বলে উঠলো, 'একটু তুমড়ে গেছে তো কী হয়েছে?'

'তুই কী বুঝবি এর কদর? বিয়ের জন্যে মামা দশটা টাকা খরচা ক'রে টুপিটা কিনে দিয়েছিলো ওকে।'

অনন্তও তারকার হাতে ওর টুপিটা দেখছিলো। মুখে ঈষৎ লজ্জা, চোখ জলে টলটলে। তারা ওর দিকে একবার তাকাতেই বেচারা ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেললো লজ্জায়— তারপর বৃত্তের মাঝামাঝি জায়গাটায় ব'সে পড়লো।

'কাঁদিস নি-- লক্ষ্মীসোনা আমার!' ব'লে তারকা ওকে কোলে তুলে নিয়ে নাচানাচি শুরু ক'রে দিলো। 'সোনার চাঁদ আমার—রাজপুত্তুর আমার—' গান গেয়ে ওকে ভোলাবার চেষ্টা করলো, চোখ মুছিয়ে দিলো সযত্নে।

মাঝখান থেকে, এই সবের জন্যে খেলাটা পণ্ড হয়ে গেলো। গোলাকৃতি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। সুমতির ওপর রেগে গেলো কেউ কেউ, গজগজ করতে লাগলো খেলাটা এইভাবে ভেস্তে গেলো ব'লে। সুমতি ঈষৎ নির্বিকার ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, এগিয়ে গেলো তক্তপোষের-ওপর-বসা লোকগুলোর দিকে।

ভেতর থেকে অনন্তর মা সুন্দরাবাঈ-এর গলা ভেসে এলো : ওকে কোলে নিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করিস নি— হুমড়ি খেয়ে পড়বি !

হাঁক ডাক শুনে রত্নাবাঈ-ও বেরিয়ে এলো : 'য়্যাঁ ! নামা, নামা ওকে কোল থেকে ! সাবধানে নামা— নামাতে গিয়ে আমার চাঁতুর চাঁদ-মুখে যেন আঁচড় না লাগে !' এই ব'লে রত্না আবার ভেতরে যেতে-যেতে হাসতে হাসতে বললো : 'দেখেছো সুন্দরা— আমাদের তারা অন্তকে কতো ভালোবাসে ? ওকে যদি অন্য কারুর ছেলেকে কোলে নিতে বারণ করি পড়ে' যাওয়ার ভয়ে, ও কী বলে জানো ? 'ঠিক আছে— এনাপুরমে আমার মামাতো ভাই আছে— ওকে কোলে তুলে আমি খেলা করবো, হুঁ—' —।'

এই সময় তক্তপোষের ওপর বসা সেই বৃদ্ধ ব'লে উঠলেন, 'রত্না ! তোর মেয়ে এবার ছেলেটাকে নিয়ে ঠিক হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ওর নিজেরই হুঁস নেই—' তারপর তারকাকে উদ্দেশ ক'রে, 'দেখছিস কেমন দাপাদাপি করছে—আর ছেলেটাও কেমন মজাসে বসে আছে দিব্যি ! এই ! নামা ওকে মুখপুড়ি—' বৃদ্ধ এবার সরাসরি ভৎসনা করলেন।

তারকা এবার অনন্তকে কোল থেকে নামিয়ে, তক্তপোষের দিকে পা বাড়ালো। যারা এতক্ষণ ধ'রে ব্যাপারটা দেখছিল তাদের একজন মন্তব্য করলো : এই রকম নাচা-কোঁদা অভ্যেস হয়ে গেলে—ভরমা কাল থেকে চুপ করে থাকবে কি ক'রে ? যতো পারিস বাপু আজ নেচে নে, চার দিনের ব্যাপার— শ্বশুরবাড়ি গেলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কোনো হই-চই আর চলবে না !

'হ্যাস ! ও-তো এখনো বাচ্চা। তাইতো, এখনো এতো হই-চই করছে। বড়ো হয়ে গেলে গলা থেকে আর রা কাড়বে না অবধি।'

'ও এখনো বাচ্চা ?'

'বাচ্চা ছাড়া আর কি ? আরে বাবা যতই ডাগর হোক দেখতে, যদ্দিন না বাচ্চার মা হয়, তদ্দিন আমি ওকে বাচ্চা বলেই ভাববো।' কথাটা বললো সুন্দরা।

'ডাগর হ'তে আর কদ্দিন ? বড়ো জোর দু বছর ? এখন থেকেই

সোনাদানা বন্দোবস্ত করো রত্না।' ভীমাপ্পা একটু দাবির সুরে অভিমত প্রকাশ করলো।

'সোনাদানা কেন?' সুন্দরা কৌতূহলী-প্রশ্ন করলো।

'কেন আবার— জামাইয়ের জন্যে! তারার বরপণ দিতে হবে না? পাঁচ তোলা নগদ সোনা না পেলে ভরমা মেয়েকে ঘরে তুলবে ভেবেছো? কথাটা খেয়াল রেখো বাপু, আমরা এমনিতেই গরিব-গুরবো...'

'আরে ব্বাস্ রে! ভীমাপ্পাও দেখছি গৌগুলের দলে— বেশ, বেশ, তোমরা সবাই ওর সালিশী হয়ে থাকো— এদিকে আমার ঘরটা যে কানা হয়ে গেলো— তোমরা সবাই মিলে এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছো। বসে বসে কথা বলতে সব মিঞাই পারে!'

'ঠিক আছে বাপু, ঠিক আছে!' ঈষৎ রাগ ঈষৎ কটাক্ষ ক'রে রত্না এবার জবাব দিলো, 'পণ গোনার দিন তো আসুক, যা দিতে পারার দেবো। মাঝখানে থেকে খামোকা এতো কথা ব'লে কী হবে?'

রত্নার কথাগুলো বৃদ্ধের কানে যেতে, বৃদ্ধ প্রসঙ্গ পালটাবার চেষ্টা করলেন, 'ত্যুৎ! এতো রাগ করছিস কেন রে রত্না! তারা, এদিকে আয়, তোর বরের নামটা কী বল দেখি— বুড়ো মানুষ, বিয়ের হট্টচট্ট-য় নামটা একেবারে শুনতে পাই নি!'

'আমিও শুনিনি!' একজন তরুণ-বয়েসী বৃদ্ধের সঙ্গে যোগ দিলো।

'আবার ওর পেছনে কেন? চলো, সব খেতে চলো।' রত্না এবার সবাইকে খেতে বসার জন্যে অনুরোধ জানালো। তক্তপোষ থেকে উঠে, হাত পা ধুয়ে অভ্যাগতরা ভেতরে গেলো— শুধু বাচ্চারা ব'সে রইলো এক জায়গায়, জড়ো হয়ে! দলে ওরা জনা পাঁচ-ছয়, ফলে তক্তপোষে সবার বসার মতো জায়গা নেই। অনন্ত নিচে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, তারকা দু-একজনকে মৃদু ধাক্কা দিলো, 'সরে বস তোরা— অনন্তকে বসার জায়গা দে।'

'খালি অনন্ত আর অনন্ত! ঢঙ দেখে আর বাঁচি না— বলি এতো চোখ রাঙাবার কী আছে?' সুমতি, তারাকে মুখ ভেংচে কথাগুলো বলতে একজন বললো, 'যেতে দে সুমি— তারা যখন এতো রেগে যাচ্ছে, আমরা

বরং এখানে থেকে চলে যাই। গোড়*-এর উঠোনটা বেশ বড়ো, ওখানে খেলি গে।'

ভেতর থেকে সুন্দরার গলা শোনা গেলো: তারা! খেয়ে যা, সঙ্গে অনন্তকে আনিস। তোরা খেয়ে নিলে আমার ঝক্কি মিটে যায়—

আত্মীয়-স্বজনের চার-পাঁচজন ছেলেমেয়ে, তারকা, অনন্ত— সুন্দরার ডাক শুনে ভেতরে চলে গেলো।

'চ' আমরাও এবার বাড়ি যাই।' সুমতির সঙ্গে পাড়াপড়শির ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে এলো। পথে যেতে-যেতে ওরা তারা সম্বন্ধে আলোচনা করতে ব্যস্ত হোলো:

'সুমিটা একেবারে গো-বেচারা। সাদাসিধে।'

'আসলে, ওদের বাড়ি ব'লে সুমি ওকে কথা শোনাতে পারেনি।'

'হুঁ— টুপিতে একটু হাত লেগেছে— তার এ্যা ত্তো!'

'বুড়ো ধাড়ি— এখনো কোলে উঠে বেড়ায়! আর দিন চারেক যাক— দেখবো ওকে কে কোলে নেয়!' সুমতি অঙ্গ-ভঙ্গি ক'রে সবার কথার জবাব দিলো।

'কদ্দিন আর কোলে নেবে ওই ধেড়ে-খোকাকে? সামনের বুধবার তো শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে।'

'শ্বশুরবাড়ি গেলে মজা টের পাবে। চিন্মার মতো দজ্জাল শাশুড়িকে খুশি রাখা কাকে বলে— হাড়ে-হাড়ে টের পাবে।' বয়েসে একটু বড়ো একটি মেয়ে অভিমত দিলো।

'অদ্দূর আর যেতে হবে না, আজ সন্ধ্যেবেলাতেই তারা মজা টের পাবে— কানের দুলটা হারিয়েছে, তখনি বলতুম আমি কিন্তু ঝগড়া হবে বলে বলিনি।' সুমতি আর একটু ভালো সাজার চেষ্টা করলো ওদের কাছে।

সামনে ভরমাপ্পাকে আসতে দেখা গেলো। ওরা সবাই হই-হই ক'রে ঘিরে ধরলো ওকে। একজন জিজ্ঞেস করলো:

* গোড়: জাতিবিশেষ। মুখ্যত জমিদার, অতএব অভিজাত। গণ্য-মান্য।

'তারাকে কবে নিয়ে যাবে ?'

'কেন ?'

'আমাদের সঙ্গে আড়ি হয়ে গেছে ওর !'

'তাই নাকি ? একেবারে আড়ি হয়ে গেছে ?' ব'লে ভরমা হাসতে হাসতে চলে গেলো।

ভরমার মনের ভাব ওরা ঠিক আঁচ করতে পারলো না। ভরমার বাবা ভুবনা চৌগুলে। মগতুমদের সঙ্গে ওদের আত্মীয়তা অনেকদিনের। ভুবনা প্রথম দিকে বেশ গরিব ছিলো, কিন্তু এখন জমি-জিরেৎ যা করেছে, তাতে খাওয়া-পরার অভাব নেই। এক কথায়, পয়সাওলা লোক। আট-দশ বিঘে হাল-চষা ক্ষেত, দু-একটা বাড়ি। গাঁয়ের লোক বেশ খাতির ক'রে চলে। বিয়ে বা সামাজিক কাজে আসতে না পারলে লোকে বাড়ি ব'য়ে মিষ্টি আর পান-সুপুরি পৌঁছে দিয়ে আসে।

রাতে শোয়ার সময়ে, উঠোনে একটা লম্বা বিছানা পেতে আট-দশজন বাচ্চাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিলো মগতুমদের ওখানে। অনন্ত শুয়েছিলো তারার পাশে। বাচ্চারা কেউ-ই তখনো ঘুমিয়ে পড়ে নি, নিজেদের মধ্যে কথা-বলাবলি-গল্প-স্বল্প করছিলো। অনন্ত গম্ভীরভাবে তারকাকে শোনাচ্ছিলো ওর ইশকুলের গল্প। কিন্তু তারকার মন অন্যদিকে তখন। তারকা মতলব করছিলো কী ক'রে অনন্তকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে— ওর চেয়ে বড়ো একটা মেয়ের কাছ থেকে শ্বশুরবাড়ির কথাবার্তা জেনে নেবে। এ যাবৎ তারকা কোনোদিন বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি। এই ঘরের মধ্যেই সে বড়ো হয়েছে এতো কাল, ফলে শ্বশুরবাড়ি এই মুহূর্তে এক মহা রহস্যের মনে হোলো তার কাছে। বড়ো জানতে ইচ্ছে করছিলো শ্বশুরবাড়ি ব্যাপারটা আসলে কি। যার জন্যে, অনন্তর বকবকানি থামিয়ে সে মৃদু ধমক দিলো, 'তুই একটু ওদিকে সর— আমি দিদির সঙ্গে কথা বলবো ততক্ষণ।'

ব্যাস, আর যায় কোথায়! অনন্ত রেগে অস্থির হয়ে জবাব দিলো, 'তুই যা— আমি সরবো না— কিছুতেই সরবো না—'

'আমার কথা শুনবি না— অনন্ত ?' তারকা অনুনয়ের সুরে বললো।

'নৃন্না! তুই আমার কথা শুনছিস না কেন?' চোখ পাকিয়ে অনন্ত পালটা জবাব দিলো।

আবেদন নিবেদন অনুনয় অনুরোধ প্রার্থনা ক'রেও অনন্তকে যখন টলানো গেলো না, তখন তারকা নিজেই উঠে যাবে বলে ঠিক করলো। কিন্তু অনন্ত তাতেও বাধা দিলো, শাড়ীর আঁচল ধ'রে, হাত ধ'রে সে তারকাকে আটকাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারকা জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে চলে গেলো দেখে আরও রেগে গেলো অনন্ত। মনে-মনে ঠিক করলো ওদের কিছুতেই কথা বলতে দেবে না, অতএব সে জোরে-জোরে ওর পড়ার-বই থেকে শেখা একটা কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো; ওদের পাশে গিয়ে কথাবার্তাতে নানাভাবে বাগড়া দেবার চেষ্টা করলো। চেঁচামেচি শুনে ওর মা ভেতর থেকে হাঁক ডাক দিলো: 'অনন্ত— চুপ ক'রে শুয়ে পড়।' কিন্তু অনন্ত এতোটুকু চুপ করলো না, বরং মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। ফলে, তারকা আর সহ্য করতে না পেরে অনন্তকে ধাক্কা দিয়ে বললো, 'এখান থেকে চলে যা বলছি!'

'যাবো না।'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছে। তোর তাতে কি?'

তারকা এবার রাগের চোটে অনন্তর হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে বিছানার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে হালকা একটা ধাক্কা মেরে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করলো, 'আমাকে তুই একটু শান্তিতে কথা বলতে দিবি না?'

কোনো উত্তর না দিয়ে, গাল ফুলিয়ে, গোমড়া মুখে অনন্ত বিছানার ওপর বসে রইলো দেখে তারকা বললো, 'এখানে চুপটি ক'রে বসে থাক্।'

'থাকবো না।' অনন্ত তারস্বরে গর্জে উঠলো এবার, 'তোদের আমি কিছুতেই কথা বলতে দেবো না— দেবো না— দেখবো তুই কী করিস!'

'বটে! দেখা যাবে।' তারকা আবার যার সঙ্গে কথা বলছিলো, তার দিকে চলে গেলো।

অনন্ত কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইলো। মানুষ ছোটো হ'লে কী হয় অনন্তর জেদ বড়ো মানুষকেও হার মানায়। এবার নতুন বুদ্ধি আঁটলো

সে মাথায় : বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে বেদম কান্না জুড়ে দিলো।

'অনন্ত— কী হ্ল আবার তোর ? ভেতরে চলে আয়।' রত্না ডাকলো ভেতর থেকে। অনন্ত বুঝলো, এই কান্নাটায় ঠিক কাজ হয়নি— অতএব সে দ্বিগুণ জোরে কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। কাজ হোলো—রত্না বেরিয়ে এসে ওকে কোলে তুলে আদর করতে-করতে জিজ্ঞেস করলো, 'কিরে ছেলে— এতো কাঁদছিস কেন ?'

'এ্যাঁ…এ্যাঁ…এ্যাঁ…' আরো খানিকটা কেঁদে নিলো অনন্ত, 'তারা আমাকে মেরেছে !'

রত্না নকল-রাগ দেখালো, 'বটে ! এতো বড়ো আস্পদ্দা-কিনা আমার ছেলের গায়ে হাত !'

সঙ্গে-সঙ্গে অনন্তর কান্না থেমে গেলো, খুশি-খুশি স্বরে বললো, 'কেন মেরেছে জানো ? কানের দুলটা হারিয়ে ফেলেছে, তোমাকে ব'লে দেবো বলেছি, তাই আমাকে মেরেছে !'

রত্না এবার সত্যি-সত্যিই রেগে গেলো, 'কীরে— তারা, সত্যি ?'

তারকা নিরুত্তর থেকে এক চোখ জল নিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

'কালই ওটা তৈরী করলাম। এই নিয়ে তিন-তিনবার দুল হারালো। একটার পর একটা হারিয়ে যাচ্ছিস, এটা না-হয় একটু কম দামি, আর একটা করানো যেতে পারে, কিন্তু বার-বার হারালে— আসবে কোথা থেকে শুনি ? এতো বড়ো ধাড়ি মেয়ে, এখনো আক্কেল হোলো না তোর ? কোথায় হারালি ওটা ? যা খুঁজে নিয়ে আয় এক্ষুনি !'

রত্না তারকাকে ভালো রকম বকুনি দিচ্ছে শুনে অনন্ত মহা খুশি, বললো, 'যেখানে মোষ বাঁধা হয়—ওইখানে হারিয়েছে ওটা। যেই বলেছি তোমাকে বলে দেবো, অমনি আমাকে তেড়ে মারতে এলো !'

'বেআক্কেলে মেয়ে কোথাকার !' ব'লে রত্না তারকাকে মারার জন্যে হাত উঠিয়েছে, সুন্দরা দৌড়ে এলো, 'ব্যাস্ ! ব্যাস্ ! খুব হয়েছে। সামান্য ব্যাপার, এতো বকবার কী আছে ?' সুন্দরা রত্নাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'এতোগুলো বাচ্চা এখানে, কে কোন্‌খানে কী হারায় তার ঠিক আছে ? কোন্ বাচ্চা না জিনিস হারায় ? তাহ'লে আর লোক

'বাচ্চা' বলে কেন ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি ?'

'কী যে বলো সুন্দরা। এখন বড়ো হয়ে গেছে, কাল শ্বশুরবাড়ি যাবে —এখনো জ্ঞান হলো না মেয়ের ! এখন কিনা ঘরের কাজ দেখাশোনা করবে, রান্নাবান্না শিখবে, তা নয়, রাত-দিন শুধু খেলা আর খেলা। আজ একটা হারিয়েছে, কাল দুটো হারাবে— আমাদের টাকা কি খোলামকুচি পেয়েছে নাকি ও ?'

'দূর ! সামান্য একটা দুলের জন্যে তুমি এই তুলকালাম করছো ? গত বছর অনন্তর বিয়ের সময় আমার কী হল জানো ? অনন্তর বিয়ে তো, বলতে গেলে, এক রাত্তিরেই ঠিক হয়ে গেলো—ব্যাস, তারপরই রাজ্যের তাড়াহুড়ো শুরু হয়ে গেলো। বিয়ের আংটি বানাবার সময় পেলুম না —তাড়াতাড়ি এক গোঁড়ের বাড়ি থেকে আংটি চেয়ে এনে ওকে পরিয়ে দিলুম— ব্যাস, সেই রাত্তিরেই আংটিটা গেলো খোয়া ! রাত্তির বেলা, কোথায় আংটি আঙুল থেকে গলে গেলো কে জানে, আমরা তো খুঁজে-খুঁজে হাল্লাক—তবুও পেলুম না। শেষ অবধি নতুন আংটি গড়িয়ে ফেরত দিতে হোলো—কিন্তু কি করা যাবে—'

'বুঝলুম। অনন্ত বাচ্চা—ও হারাতে পারে। কিন্তু তারা কি কচি খুকি ? সোনার জিনিস হারাবে, দুল হারাবে—ভালো ক'রে একটা চড় বসালে তবে ওর শিক্ষা হবে—হ্যাঁ !' রত্না বেশ রেগেই কথাগুলো বললো।

তারকা বিছানায় মুখ গুজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। যতটা না দুঃখে—তার চেয়ে বেশি অনন্তর ওপর রাগ ক'রে।

2

পরের দিন তারকা অনেকক্ষণ ধ'রে শুয়ে রইলো। চট করে বিছানা ছেড়ে উঠলো না। মা এসে দু-একবার ডাকলো, কিন্তু তারকা জবাব না দিয়ে চাদরটা মুখ অবধি টেনে নিলো। সুন্দরা বললো, 'শুতে দাও —যখন হোক উঠবে।' সবাই নিজের নিজের কাজে চলে গেলো। একটু বেলা বাড়তে সুমতি এলো তারকাকে ডাকতে।

রত্না বললো, 'তারা শুয়ে আছে,' তারপর একটু থেমে, 'হ্যাঁ রে সুমি—তারার দুলটা কোথায় হারালো রে—বলতে পারিস ?'

প্রশ্নটা শুনে সুমতি একটু থতমত খেয়ে গেলো। বুঝলো, তারকা মা'র কাছে ভালোরকম বকুনি খেয়েছে। যদিও, সুমতি নিজেই তারকার মা'র কাছে কথাটা লাগাবে ভেবেছিলো— তবুও, তার নিজেরই কেমন যেন খারাপ লাগছিলো তারকার বিরুদ্ধে কিছু বলতে। রত্নার প্রশ্নের উত্তরে কোনোক্রমে আমতা-আমতা একটা জবাব দিয়ে সে তারকা যেখানে শুয়েছিলো, সেই দিকে গেলো।

তারকার কপালে হাত দিয়ে বার দুয়েক ডাকতেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো অগত্যা। খুব নিচু গলায় সুমতি জানালো, 'কাচ্চিল গুলি আর চুড়ির টুকরো এনেছি···চ' পেছনে ঘর বানিয়ে খেলবো। আর ইন্দি আসবে, তুইও চ।'

বাড়ির পেছনে ছোট্ট একটা নিমগাছ। নিচেটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওখানেই সুমতিরা বাড়ি বানিয়ে খেলবে ব'লে ঠিক করলো। পাড়ার আরও চার-পাঁচজন মেয়েও এসেছে।

ইতিমধ্যে, অনন্তও এসে গেছে। তারকা একবার কড়া চোখে তাকালো ওর দিকে, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো: 'চুকলি-খোর কোথাকার। কাল আমার নামে লাগিয়ে আজ আবার খেলতে এসেছে, দেখি তোকে কে খেলতে নেয় আজ!' চোখের ইশারায় সুমতিকে কাছে ডেকে, তার কানে কানে তারকা বলে দিলো অনন্তকে যাতে খেলতে না নেয়।

অনন্ত ব'লে উঠলো, 'দিদি! আমিও খেলবো।'

তারকা জবাব দিলো না দেখে সুমতি জবাব দিলো, 'মেয়েরা খেলবে—মেয়েদের মধ্যে তুই কেন থাকবি ? যা—যা।'

'আমি যাবো না।'

'আমরা তোর সঙ্গে খেলবো না।'

'কী! খেলবি না!' অনন্ত চোখ লাল করে জিজ্ঞেস করলো।

'না।' তারকা এবার একটু রূঢ়ভাবে উত্তর দিলো।

'আমি খেলবোই।' অনন্তও না-ছোড়বান্দা হয়ে বসে পড়লো সেখানে।

'যা এখান থেকে।' সুমতি জোর করলো।

'তোরা চলে যা।'

সুমতি চুপ ক'রে থেকে তারকার দিকে তাকালো।

'কেন আমাদের পেছন-পেছন আসছিস হ্যাংলার মতো?' ঈষৎ গর্বিত সুরে তারকা বাধা দিলো অনন্তকে।

এইভাবে কিছুসময় স্নায়ু-যুদ্ধ ক'রে কাটলো। কেউ কোনো কথা বললো না। পাশের একটা ফোকর থেকে একটা কাঠবেরালি বেরিয়ে এসেই পালিয়ে গেলো। একটু হাওয়া নেই। গাছের পাতা স্থির। সূর্য আরো ওপরে। ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া চাপ-চাপ হয়ে ওপর দিকে উঠে গেলো।

'এই— যা এখান থেকে।' তারকা অনন্তকে উঠে যেতে বললো।

'আমি এখানে বসে থাকবো। তোরা চলে যা।'

'সুমি—' তারা বললো, 'চ' আমরা বরং ওই দেওয়ালের ছাদে গিয়ে ঘর বানাই।'

সুমতি খেলার জিনিসপত্তর নিয়ে তারকাকে অনুসরণ করলো। বাকিরাও কাঠের টুকরো, খালি কৌটো, চুড়ি ভাঙা, মারবেল গুলি, পুতুল— এইসব নিয়ে ওদের সঙ্গে-সঙ্গে গেলো।

অনন্ত গম্ভীরভাবে একবার তাকালো। খুব খারাপ লাগছিলো ব্যাপারটা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেউ আর ওকে খেলতে নেবে না। আবার, খেলা ছেড়ে থাকাটাও বেশ মুশকিলের। পাঁচ-সাত চিন্তা ক'রে, অনন্ত হাই তুলে উঠে দাঁড়ালো— ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে, একটু হেসে, হালকা চালে, মজা করার ভঙ্গিতে বলে উঠলো, 'আমি এখানেও এসে গেছি!'

তারকা গম্ভীরভাবে জবাব দিলো, 'তুই এখানে আসবি না ব'লে দিচ্ছি!'

অনন্ত যেন শুনতে পায় নি, এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো। সুমতি রেগে গেলো, 'অনন্ত, ভালো হচ্ছে না ব'লে দিচ্ছি—'

অনন্ত সুমতিকে একেবারে গ্রাহ্যই করলো না।

এবার, সুমতি রেগে অনন্তকে আটকাতে গেলে— অনন্ত সঙ্গে-সঙ্গে ওর হাতে একটা চিমটি কাটলো। সুমতি খুব জোরে একটা ধাক্কা দিলো ওকে। টাল সামলাতে না পেরে অনন্ত সজোরে গিয়ে ছিটকে পড়লো দেওয়ালের ওপর। মাথায় ঘা লাগতে—প্রায় কাঁদো-কাঁদো অনন্তর চোখ জল ভরে' উঠলো। অভিমানে কাঁপা-কাঁপা ঠোঁট, রক্তিম মুখ— অনন্ত আর একটাও কথা না ব'লে, চলে এলে৷ সেখান থেকে। খানিকটা গিয়ে, পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে—বাড়ির দিকে এগোলো সে।

তারকা ডাকলো : অনন্ত ! অনন্ত !

অনন্ত শুনেও শুনলো না। তারকা আবার ডাক দিলো : 'অনন্ত— আয়, খেলে যা।' অনন্ত তবুও কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। তারকা একটু চুপ ক'রে থেকে সুমতির উদ্দেশে বললো এবার : 'তোদের জন্যে আমাকে বকুনি খেতে হবে এবার।'

'বাঃ রে ! আমি কী করলুম ? তুই-ই তো বলেছিলি .

'কী বলেছিলুম ? খেলায় না নিতে বলেছিলুম— ধাক্কা মারতে তো বলিনি।'

'তোর ওই এক কথা শুধু ! কাল টুপির ভাঁজ নষ্ট হয়েছিলো ব'লে খেলাটা দিলি পণ্ড ক'রে, আজ আবার ধাক্কার কথা ব'লে...'

তারকা ঈষৎ বিষণ্ণভাবে বললো, 'ঠিক আছে।' খুব খারাপ লাগ-ছিলো ওর।

অনন্তকে কাঁদতে দেখে রত্না জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে রে ?'

'দিদি খেলতে নেয়নি।'

অনন্ত কিন্তু সত্যিই এ জন্যে কাঁদেনি— সুমতি ধাক্কা মেরেছে বললে দিদি ভীষণ বকুনি খাবে— এই ভেবেই সে কাঁদছিলো। রত্না আদর করলো ওকে : 'চল, খাবি চল। ওদের সঙ্গে আর খেলতে যাস নি। মুখপুড়ি মেয়েগুলো...'

এই সব বলে রত্না অনন্তর হাতে লাড্ডু আর গুঁজিয়া দিলো, একটু

বেশি করেই দিলো, যাতে ও চট করে ঠাণ্ডা হয়। কি কাজের জন্য সুন্দরা ভেতরে এসেছিলো। ব্যাপার দেখে ব'লে উঠলো, 'এতো দিলে কেন ওকে ? খেতে পারবে না— সব ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করবে।'

'খেতে দাও। বেচারা সকাল থেকে কিছু খায় নি।' ব'লে রত্না বেরিয়ে গেলো।

'খাস নি ওগুলো— সব তেলের তৈরি। কবেকার বাসি কে জানে—' ব'লে সুন্দরা নিজেদের সঙ্গে আনা একটা বাক্স খুলে ঘিয়ের তৈরি লাড্ডু বের ক'রে দিলো।

অনন্ত চুপ ক'রে বসে রইলো খানিকক্ষণ। একটু খাওয়ার পর যেই দেখলো মা চলে গেছে—সে সঙ্গে-সঙ্গে জামার মধ্যে লাড্ডুগুলো লুকিয়ে ফেললো। দরজার কাছে যেই দেখলো আশপাশে কেউ নেই—সে সঙ্গে-সঙ্গে দৌড় দিলো তারকারা যেখানে খেলছিলো সেই দিকে।

'এই দ্যাখ—খাবার জিনিস এনেছি !' অনন্ত জামার ভেতর থেকে লাড্ডু বের ক'রে দেখালো, বেশ একটু গর্বিতভাবে।

অনন্ত ফিরে এসেছে দেখে তারকা খুব খুশি হোলো। মেয়েরা তত-ক্ষণে খেলার চৌকো ঘর সাজিয়ে ফেলেছে। তারকার মুখ লক্ষ্য করে সুমতি বলে উঠলো, 'অনন্ত মিষ্টি এনেছে, ভালোই হোলো— আমরা তাহ'লে বিয়ে-বিয়ে খেলা খেলতে পারি।'

তারকা কোনো জবাব দিলো না। মুখটা খুশিতে চকচক ক'রে উঠলো শুধু। অনন্ত ততক্ষণে এক টুকরো গুঁজিয়া ভেঙে মুখে পুরে দিয়েছে। খেলুড়েরা অনন্তর উদ্দেশে জানালো, 'কাল যেমন ক'রে তারার বিয়ে হয়েছিলো, আমরা ওই রকম খেলা খেলবো আজ। খেলবি তুই ?'

সুমতি বললো, 'সাবাস ! তারার গায়ে তো হলুদ লাগানোই আছে —ওকে আমরা বউ বানাই, আর অনন্ত— তুই বর হবি ওর ?'

তারকা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না। লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখ ক'রে উঠলো, 'ও আমার বর হবে কেন ? আমার কি বিয়ে হয়নি নাকি ?'

'বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে ? বিয়ে-বিয়ে খেলায় অনন্ত যদি তোর

বর হয় তো কী হয়েছে তাতে ? খেলায় সব হয়— হুঁ !'

'আমি বউ হবো না। বরং ইন্দীকে বউ বানা !'

'ইন্দীর সঙ্গে যে ঠিক মানাবে না! অনন্ত এদিকে আয়।'

অনন্ত ভাবছিলো, খাবার এনেছি ব'লেই ওরা আমাকে খেলতে ডাকছে। ফলে, সে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো। সুমতি একটু নিরাশ হয়ে অন্য মেয়েদের নিয়ে পুরোনো খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অনন্ত ঠিক করলো, আর একবার ওরা যদি ডাকে— তাহলেই সে খেলতে যাবে। কিন্তু, আর একবার কেউ ডাকলো না দেখে, সে নিজে থেকেই বললো, 'এই ! এগুলো তোরা খেয়ে নে।' মেয়েরা ওর দিকে একবার ঘুরে তাকালো, শুধু একটা বাচ্চা মেয়ে এগিয়ে এলো মিষ্টি খাওয়ার লোভে। অন্যরা পাত্তা দিলো না, কী করা যায়— যে মেয়েটি এসেছিলো তাকেই মিষ্টি দিয়ে অনন্ত বললো, 'একটা গল্প শুনবি তুই ?'

'উঁ।'

অনন্ত পাঠশালায় মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে শোনা গল্পগুলো এক এক ক'রে ব'লে গেলো তাকে। সুন্দরভাবে গল্প বলার কায়দা অনন্ত রপ্ত করেছিলো একটি কারণে, মাস্টারমশাইরা গল্প শুনিয়েই অনন্তকে দাঁড় করিয়ে দিতো শোনা গল্পের পুনরাবৃত্তি করার জন্যে। তাছাড়া আদুরে মুখ, মিষ্টি হাসি, আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি— এইসবের জন্যেও অনন্ত গল্প বললে সবাইকে দাঁড়িয়ে পড়তে হোতো অবাক হয়ে। গাঁয়ের মেয়েদের আবার এইসব গল্প শুনতে দারুণ ভালো লাগে। কেননা, ওরা এমনিতেই এই ধরনের গল্প শোনার কোনো সুযোগ পায় না। তাছাড়া, শিশু কাহিনী বলতেও অনন্তর বেশ মুনসিআনা ছিলো, যার জন্যে বাচ্চারা এক মনে ওর গল্প শুনতে বসে যেতো। অনন্ত, সেই মেয়েটিকে একটি বাঁদরের মজাদার গল্প শোনাতে বসেছিলো বেশ হাত-পা নেড়ে-নেড়ে, ফলে যে মেয়েরা খেলছিলো তাদের মন এদিকে চলে এলো। অনন্ত যখন দ্বিতীয় গল্প শুরু করলো, তখন সব মেয়েই খেলা ছেড়ে ওর চারপাশে এক এক ক'রে বসে পড়তে লাগলো। অনন্ত সেই গল্প শেষ করে আর একটা গল্প ধরলো।

এইভাবে আসর যখন মশগুল তখন রত্না এলো অনন্তকে আর তারকাকে খেতে যাবার জন্যে বলতে। বাকি মেয়েরা যে যার ঘরের দিকে পা বাড়ালো। অনন্ত বাইরে খাওয়ার জিনিসপত্তর এনেছিলো ব'লে সুন্দরা সকাল থেকেই একটু রেগে ছিলো ছেলের ওপর : ভেতরে আসুক একবার— মজা দেখাবো!

অনন্ত খেতে বসতে, সুন্দরার মুখ ছুটলো : 'খুব বিদ্যে হয়েছে তোর না? পিসির বাড়ি এসেই এক-একটা খারাপ কথা শিখে গেছিস, গাঁয়ে চল একবার তোকে বুঝিয়ে দেবো কত ধানে কত চাল!'

অনন্ত চুপ ক'রে মাথা হেঁট করে খেতে লাগলো। সুন্দরা কিন্তু এক নাগাড়ে ছেলেকে ব'কে চললো, 'আসবার সময় তো খুব বললি 'এখানে এসে পড়াশোনা করবো'— বইপত্তর নিয়ে এলি ঘটা ক'রে, বলি, এখানে আসা ইস্তক একবারও বই ছুঁয়েছিস? দিনভোর শুধু হুড়ুম হুড়ুম করে খেলা! এবার যদি ফেল করিস— তাহলে লেখাপড়া ছাড়িয়ে তোকে গোরু-মোষ চড়াতে দেবো হ্যাঁ!'

তারকা-ও মুখ নিচু করে আরক্ত মুখে খেয়ে যাচ্ছে। চোখে জল টল-টল করছে। গলা থেকে গ্রাস নামতে চাইছে না। অনন্ত অবশ্য এত সহজে কাবু হওয়ার নয়, সে একটু গম্ভীরভাবে খেতে ব্যস্ত হোলো। পরিবেশটা হালকা করার জন্যে রত্না মাঝখান থেকে বলে উঠলো, 'গোরু-মোষ চরালে লেখাপড়া হয় না নাকি?'

সুন্দরা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো, 'লেখাপড়া শিখে কী হবে? ওকে দিয়ে বরং ডোমের কাজ করাবো— আমার চারটে করে টাকা বেঁচে যাবে তাতে।'

সুন্দরার মন্তব্যে অনন্ত আহত হোলো মনে-মনে। বোধ হয়, বাড়ির গোরু-মোষ চরানো চাকরটার কথা মনে পড়লো। ছেঁড়া জামা, দুর্গন্ধে ভরা গা— ভাবলেই গা-টা গুলিয়ে ওঠে। মার এই রকম একটা উদাহরণ দেওয়া ঠিক হয়নি। অনন্ত চট ক'রে খাওয়া সেরে উঠে পড়লো, তারপর— বাইরে যাবার সময় মাঝের কামরায় রাখা বইপত্তরগুলো বগলদাবা ক'রে নিয়ে গেলো।

তারকা খাওয়া শেষ ক'রে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো। অনন্তকে দেখতে পেলো না। পেছন দিকটা দেখে এলো— সেখানেও নেই। সারা ঘর অনন্তকে খুঁজে, কোথাও না পেয়ে, তারকা হতাশ হয়ে চুপ ক'রে বসে পড়লো এক জায়গায়। কোথায় যেতে পারে? একটু ভেবে সে এবার ভেতরে গেলো। সবাই খেতে বসেছে, সুন্দরা তারকাকে ডাকলো, 'তারা, আয়— একটু খেয়ে যা।'

'ন্না।' তারকা বেরিয়ে গেলো।

'ও আর এখন খেয়েছে। নিশ্চই অনন্তকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন।'

তারকা ততক্ষণে উঠোনে। কি করবে ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না। একটা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়বে, এমন সময় জোয়ারের বস্তার কাছ থেকে কার যেন গুনগুনুনি ভেসে এলো। উত্তেজনায় তারকা উঠে দাঁড়ালো।

অনন্ত পড়ছে।

'অনন্ত!' তারকা খুশি হয়ে ডাক দিলো।

'কী?'

'চল— খেলতে যাই।'

'ন্না। মা বকেছে।'

'তুই মা'র সামনে ওরকম করলি কেন? লাড্ডু নিয়ে বাইরে এসেছিলি ব'লেই তো মা বকলো তোকে।'

'তুই আমাকে খেলতে নিস নি আজ। ভাবলুম, লাড্ডু নিয়ে গেলে খেলতে দিবি— তাই তো নিয়ে গিয়েছিলুম।' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

তারকার চোখও ছলছল করে উঠলো। ভালোবাসার গভীর মায়ায় অনন্তর হাত ধরলো সে, আর বললো, 'আর কখখনো তোকে বাদ দিয়ে খেলবো না।'

অনন্ত মাথা নাড়ল।

3

এইভাবেই দিন তিনেক কেটে গেলো। বিয়েবাড়িতে যে-সব আত্মীয়-স্বজনরা এসেছিলো, তারা যে যার চলে গেল এক সময়। সুন্দরা এক মাস ধরে আছে, সে-ও এবার চলে যাবে বললো। একদিন সকালে রত্না মল্লকে জানালো, 'সুন্দরা যাবার জন্যে ছটপট করছে, আমি আরো দিন-চারেক থেকে যেতে বলেছি, তারা শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর যেন ও যায়— কিন্তু আমার কথা শুনছে না সুন্দরা। বলছে, ছেলের ইশকুল কামাই হচ্ছে, বাড়িতে রাজ্যের কাজ— এই সব ব'লে ও কালই চলে যেতে চাইছে, কাল নাকি দিনটা ভালো। কিন্তু, বাজার থেকে তো একটা শাড়ি কেনা দরকার—'

মল্ল জবাব দিলো, 'বেশ— আমি তাহলে ক্ষেত থেকে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। বাজারে গিয়ে যা যা দরকার তোমরা কিনে নিও, শাড়িটা ওর পছন্দমত কিনবে—'

মাঝখানের কামরা থেকে সুন্দরা বলে উঠলো, 'আবার বাজার-টাজার কেন ? কাল ভোরেই আমি চলে যাবো, এখনি শাড়ি কেনার কোনো দরকার নেই— পরে এক সময় এসে নিয়ে যাবে'খন। তাছাড়া এত খরচপত্তরের পর খামোকা খরচ বাড়িয়ে লাভ কী ?' সুন্দরা অবিশ্যি মনে-মনে জানে শাড়ি না দিয়ে ওরা ছাড়বে না।

'না-না— তা কী হয় ? লোকে কী বলবে ? তারার শাড়ি কেনার সময় ভেবেছিলুম তোমারটাও ওই সঙ্গে কিনে নি— তারপর যদি তোমার অপছন্দ হয় এই ভেবে আর কিনি নি। তাছাড়া, বিয়ের পর যখন কিছুদিন থাকবে— তখনই ঠিক করেছিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মনের মতো শাড়ি কিনে দেবো। চলো এখন, বাড়ির গাড়ি— কোনো অসুবিধে হবে না।' খুবই আগ্রহ দেখালো রত্না। সুন্দরা চুপ ক'রে গেলো।

অনন্ত সেই ফাঁকে দৌড়ে এসে মা'কে বললো, 'মা, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে। গোরুর গাড়ি, গোরুর গলায় টুং টাং আওয়াজ— ওহ্ দারুণ মজা হবে ! আমিও যাবো।'

'তুই কেন এই রোদে বেরোবি? তার চেয়ে বাড়িতে থেকে তারার সঙ্গে খেলা কর।'

'গাড়ির কথা শুনেছে, আর রক্ষে আছে!' রত্না বললো।

খুশির চোটে অনন্ত লাফাতে-লাফাতে দাওয়ার দিকে এলো। তারপর দাওয়া থেকে উঠোনে। তারা জিজ্ঞেস করলো, 'কে কে যাবে রে তোদের সঙ্গে?'

'আমি—'

'তুই কা'র সঙ্গে যাবি?'

'আমি, পিসি, মা— সব্বাই যাবে। ক্ষেত থেকে গাড়ি আসবে এখুনি।'

'কে বললো?'

'মা।'

'অনন্ত— তুই যাস নি।'

অনন্ত নিরুত্তর।

'দুপুরবেলায় আমরা ঘর বানিয়ে খেলবো।'

'ন্ন না। তুই চল্-না আমাদের সঙ্গে।'

'আমি তো যেতে পারবো না, আমার যে গায়ে এখনো হলুদ আছে।'

গায়ে হলুদের সঙ্গে বাইরে যাওয়ার সম্পর্কটা অনন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। অতএব, সে সোচ্চারে বললো:

'তাহলে তুই থাক্— আমি যাই।'

'কাল তো তুই চলেই যাবি। আজকের দিনটা আমার সঙ্গে খেলা কর।'

তারার এই মিনতির গভীরতা উপলব্ধি করার অবস্থা তখন অনন্তর নেই। ছোটো শহরের শহুরে পরিবেশে মানুষ অনন্ত তাৎক্ষণিক বন্ধুত্বে যতোটা অভ্যস্ত— তাতে গ্রামীণ পরিবেশের আন্তরিকতা তার কাছে একেবারেই অনভ্যস্ত অনুভূতি। ফলে, সে জোর দিয়ে বললো, 'না— আমি যাবোই, আর ওই গ্রামটাও আমার ভালোভাবে দেখা হয় নি।'

অগত্যা, তারবা জবাব দিলো, 'তাহ'লে যা', কিন্তু মনে-মনে মতলব ভাঁজতে লাগলো কী ক'রে মা'কে ব'লে অনন্তকে আটকানো যায়। কিন্তু, কিছু করা গেলো না— ততক্ষণে বাজার যাওয়ার জন্যে সবাই তৈরি

হয়ে গেছে। গাড়িটা বাইরে দাঁড় করানোই ছিলো। অনন্ত, সবার আগে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। তারকা মুখ ছোটো ক'রে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে লাগলো। অনিবার্য কারণেই আজ সে ওদের সঙ্গে যেতে পারলো না। সুন্দরা সান্ত্বনা দিলো, 'একলা খুব খারাপ লাগছে— না? সুমিটাও কাল শ্বশুরবাড়ি চলে' গেছে— অন্তু, তুই থেকে যা না দিদির সঙ্গে?'

অনন্ত সরাসরি না ক'রে দিলো। অনন্ত থেকে গেলে তারকা নিশ্চয়ই খুব খুশি হোতো, কিন্তু প্রচণ্ড অভিমানে সে অনন্তকে আর অনুরোধ জানালো না। গাড়িটা ছেড়ে দিতে, যতো দূর চোখ যায়— সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, তারপর অসহায়ভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো। বিয়েবাড়ির হট্টগোলে এই কটা দিন কীভাবে কেটে গেছে, সে একেবারেই টের পায় নি। যার জন্যে, ফাঁকা ঘরের মধ্যে থাকতে খুব কষ্ট হোলো, চোখ দুটো কান্নায় আবছা হয়ে এলো, এবং এক সময় শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে ভাবনা শুরু হয়ে গেলো।

'আসছে বুধবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। কিন্তু মা-বাবাকে ছেড়ে ওখানে থাকবো কেমন ক'রে? না, মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই খারাপ— জন্মের পরই নিজের ঘর ছেড়ে পরের বাড়ি চলে যেতে হয়।'...এইসব ভাবতে ভাবতে তারকার মাথা ধরে গেলো। উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে সময় কাটালো! আজ খেলার জন্যেও কেউ আসছে না। সুমতি গতকালই শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। সুমতি তারারই সমবয়েসী— বিয়েটা একটু আগে হয়ে গেছে। এরই মধ্যে কয়েকবার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করেছে। গতকাল চলে যাওয়ার আগে তারকার সঙ্গে মন খুলে গল্প ক'রে গেছে সে। শাশুড়ির বকা-ঝকা, তর্জন, গর্জন, শাসন— সুমি যা ব'লে গেছে, সে সঙ্গে নিজের অবস্থার কথা ভেবে তারকা এবার প্রায় কেঁদে ফেললো। কিছু সময় এই ভেবে কেটে যাওয়ার পর— এধার-ওধার খুঁজে তারকা পরশু দিন খেলার সময় অনন্তর ছিঁড়ে-যাওয়া জামাটা বের ক'রে, দরোজার কাছে ব'সে গেলো সেলাই করতে! ছোটো বা বড়ো কোনো ভাই নেই— তাই বোধ হয় অনন্তর

কাজ করতে ওর খুব ভালো লাগতো।

দুপুরের দিকে একটু জিরোবার জন্যে, পাড়ার চাঙ্গলাবুড়ি এসে হাজির : 'কী করছিস রে তারা ?'

'খেলার সময় অনন্তর জামাটা ছিঁড়ে গিয়েছিলো, তাই সেলাই করে দিচ্ছি।'

'ওরে মেয়ে ! তুই আবার সেলাই-ফোঁড়াঃ শিখলি কবে ?'— তারপর একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে, 'হ্যাঁরে এখানে কেউ পেচ্ছাপ-টেচ্ছাপ করে নি তো ?'

তারকা মনে-মনে 'ও কী পরিষ্কার রে' ব'লে মুখে বললো, 'না, না— দরজার কাছে কেউ ও-কাজ করে ?'

বুড়ি নিশ্চিন্ত হয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলো, ভেতরে উঁকি দিলো, 'কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে ?'

'সব বাজারে গেছে।'

'এখন আবার কিসের বাজার ?'

'কাল মামী চ'লে যাবে, তাই…'

'সুন্দরা কাল যাচ্ছে বুঝি ? আরো দিন চারেক থেকে তোকে পাঠিয়ে দিয়ে গেলেই পারতো।'

'অন্তুর ইশকুল কামাই হচ্ছে, পড়ার ক্ষতি হচ্ছে—' একটু আনমনা হ'য়ে তারকা জবাব দিলো।

'হুঁ ! ওই এক ফোঁটা ছেলে— ওর আবার পড়া। চার দিন থাকলে এমন কী ক্ষতি হোতো বাপু ? বার-বার তো আর আসে না এখানে।'

কথাগুলো তারার ঠিক ভালো লাগলো না, অনন্তর স্ব-পক্ষে সে যুক্তি দিলো : 'এক ফোঁটা ছেলে হ'লে কী হবে, 'কেলাস থিরি'-তে পড়ে ! আমাদের এই গাঁয়ের ছেলেদের মতো ? বছরের পর বছর 'এক কেলাসে'-ই গড়ায় !' অনন্তকে অসাধারণ মেধাবী প্রতিপন্ন করার জন্যে তারকা আরো বললো, 'এখানকার পাঠশালা আর ওখানকার ? কীসে আর কীসে— ওখানে তো একজনের পড়া দেখে, আর একজন পড়া শিখে নেয়। আর আমাদের অনন্ত বড়ো হ'লে ঠিক দেখো তহশীলদার হয়ে

যাবে।' তহশীলদারের পদমর্যাদা ঠিক কোন্ ধরনের তা তারকা বেচারার ঠিক জানা নেই।

'ত'শীলদার? ওরে ব্বাপ রে!' শব্দটা বুড়ির বেশ মনে ধরলো। 'সুন্দরার তাহলে কপাল ফিরে যাবে— বল? ওর তো ওই একটাই ছেলে— না?'

'একটা বোন ছিলো, তবে মারা যায়— তারপর এই পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে আর কিছু হয় নি।' একটু বিষণ্ণস্বরে তারা কথাটা বললো।

'হবে, ঠিক হবে। ওরা তো আর এখনো বুড়িয়ে যায় নি— সুন্দরা মন্দিরে যায় তো— না?'

বুড়ির ধারণা ধর্মটর্ম মেনে চললে সব ধরনের প্রাপ্তিযোগ, এমন-কি সন্তানসম্ভবা হওয়াও সম্ভব। আরো কিছুক্ষণ এই জাতীয় কথাবার্তার পর চাঙ্গলাবুড়ি চ'লে গেলো। আর, আর একটু পরে তারকা রান্না চাপাতে ব'সে গেলো। সময়টা এইভাবে গড়িয়ে গেলো।

ওদের বাজার থেকে ফিরে আসার আওয়াজ কানে আসতেই তারকা দা'ওয়ার ওপর ছুটে এলো।

'ছুঁসনি— ছুঁসনি এখন আমাদের, বাজার থেকে আসছি— ব'লে বাজারের কাপড় ছাড়ার জন্যে রত্না ঘরের ভেতর থেকে মেয়েকে অন্য কাপড় এনে দেবার জন্যে বললো।

অনন্তকেও জামা ছাড়তে হবে। তারকা ঘরের ভেতর থেকে সবার জন্যে কাপড় আর অনন্তর জন্যে দুপুরে-সেলাই-করা মলমলের জামাটা নিয়ে এলো। অনন্ত জামাটা দেখলো, পছন্দ হোলো না। মেসিন সেলাই দেখে অভ্যস্ত চোখ— হাতে-সেলাই পছন্দ হবার কথা নয়। মা'কে দেখালো সে, 'কি বিচ্ছিরি সেলাই!'

'আরে, হাতে সেলাই এই রকমই হয়। তারা— তুই সেলাই করলি বুঝি?' খুশি-খুশি গলায় কথাটা ব'লে একটু আদরও করলো তারাকে। তারকার চুলে বিলি কাটতে-কাটতে সুন্দরা আবার সেলাইটা দেখলো ভালো ক'রে, রত্নার উদ্দেশে বললো, 'তুমি তো চিন্তা করছিলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়ে কি করবে— ওর নাকি এক ফোঁটা বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, না বললে

নাকি কিছু করে না, ভূতের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, এখন দেখো তো কী সুন্দর সেলাই করেছে নিজে থেকে— আমি তো ভুলেই গিয়েছিলুম, ও-তো দেখছি নিজেই ছুঁচ সুতো যোগাড় ক'রে দিব্যি সেলাই ক'রে রেখেছে। বড়ো হ'লে বুদ্ধি-সুদ্ধি আপনা থেকেই খুলে যায়—' ব'লে সুন্দরা অনন্তকে জামা পরাতে যাবে, কিন্তু অনন্ত হাত ছাড়িয়ে পালালো।

'এ রকম জামা প'রে ইশকুলে গেলে সবাই হাসবে— হি হি হি।'

কথাটা শুনেই তারার মুখ ছোটো হয়ে গেলো। সুন্দরা রেগে গেলো অনন্তর ওপর, 'ইশকুলের ছেলেরা হাসবে বললেই হোলো? তোর ইশকুলের ছেলেরা জামার বোঝেটা কী?'...তারপর, তারার পিঠে হাত রেখে, 'আর চার বছর পরে জন্মালে তোর সঙ্গে আমি ঠিক অনন্তর বিয়ে দিয়ে ছাড়তুম!'

রত্না জবাব দিলো, 'খুব বললে যা হোক! নিজেদের ঘর ছেড়ে, কোনো খোঁজ-খবর না নিয়ে রাতারাতি ব্যাটার বিয়ে দিলে— আমরা জানতে অবধি পারলুম না...'

রত্নার কথায় সুন্দরা বিব্রত বোধ করলো। ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিলো, 'নিজের ঘরের মেয়ে আনলেও কি ঝঞ্ঝাট কম হোতো ভাই? তবে হ্যাঁ, বলতে পারো ঘরের মেয়ে ছেড়ে পরের মেয়ে আনার কি দরকার ছিলো —কিন্তু কি করবো, আমার কোনো হাত ছিলো না এতে।'

সন্ধ্যেবেলায়, খাওয়াদাওয়ার পর, অনন্ত কেন কে জানে, দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে গেলো। অনন্তর মতলব বোঝা গেলো একটু পরে— তারকা খাওয়া সেরে বেরোতে যাবে, সে পথ আটকালো, কিছুতেই যেতে দেবে না। তারকা বললো, 'পথ ছাড়।'

অনন্ত জবাবে হি হি ক'রে হেসে উঠলো দুষ্টুমি ক'রে।

তারকা আবার বললো, 'যেতে দে আমাকে।'

'দেবো— তবে তোর বরের নাম বল আগে!'

'তার আগে—' রত্না-ই তারকার হয়ে জবাব দিলো, 'তোর বউয়ের নাম বল!'

'ঠিক, ঠিক— বউয়ের নামটা বল তো অন্ত— অনেক দিন হয়ে গেলো,

আমারও ছাই মনে পড়ছে না।' সুন্দরা-ও এই পরিহাসে যোগ দিলো।

'আগে ও বলুক— তারপর আমি বলবো।'

তারকা অবিশ্যি জানে অনন্ত পরেও বলবে না। তবুও, মাসীর আগ্রহ দেখে সলজ্জ হয়ে তারকা একটা ধাঁধার মাধ্যমে জবাব দিলো :

দু ছড় মুক্তোর মালা / আট ছড় মুক্তোর হার / দান দেবে হাতিতে ব'সে / খেলবে পাশা পালকিতে / পালংকে বসে ছেলে নাচাবে / ছেলে হিসেব মেলাবে বস্তায় ব'সে / হিসেব না মিললে বোন ডাকবে : ভ র ম— প ড় কে !

সুন্দরা এবার খুশি হয়ে ছেলেকে বললো, 'খাসা হয়েছে! এর চেয়েও একটা ভালো ধাঁধা বল দিকি তুই।'

ধাঁটা-টাঁধা আমি জানি না। তবে, তোমাদের ওই কেলটে মেয়েকে আমি হ'লে বিয়ে করতুম না— হি হি হি—'

ব'লেই অনন্ত ছুট্‌টে পালিয়ে গেলো। বাচ্চা ছেলের কথা হলে কী হবে— সুন্দরার মনে হোলো বয়স্ক কেউ যেন বুকে একটা প্রচণ্ড ঘা দিয়ে চলে গেলো।

4

সেদিন রাত-ভোর অবধি অনন্ত বাড়ি যাওয়ার স্বপ্ন দেখলো। মাঝে-মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে, মনে হচ্ছিলো সে যেন এনাপুরেই শুয়ে আছে, কিংবা সঙ্গীদের সঙ্গে ইশকুলে যাচ্ছে। চন্দুরে এসে প্রথমটা ভালোই লেগেছিলো, সবাই বেশ ডেকে আদর ক'রে কথা বলছে— কিন্তু শেষের দিকে পুরো ব্যাপারটাই একঘেয়ে লাগতে শুরু করলো। প্রথম দিকে, ওদের ছোটো শহরের চেয়ে এই গাঁ ঢের ভালো মনে হলেও, শেষ অবধি হাঁফিয়ে উঠতে হোলো এখানে থাকতে-থাকতে। খেলার সঙ্গীসাথী নেই, বড়ো কোনো ইশকুল নেই— আছে শুধু দেওয়া-নেওয়ার খেলাধুলো।

হয় তারকার সঙ্গে, নয় পাড়ার অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে। কাঁহাতক আর এসব ভালো লাগে?

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই, বিছানার ওপর ব'সে অনন্ত চারিদিকে চোখ বোলালো। আজই রওনা হওয়ার দিন— অথচ তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না! সন্দিগ্ধভাবে সে মাকে ডাকলো: মা!

মাঝখানের কামরা থেকে সুন্দরার জবাব এলো, 'কী রে— আজ এত ভোরে ঘুম ভাঙলো যে?'

'বাড়ি যাবে কখন?'

নিরুত্তর থেকে সুন্দরা ছেলের বাড়ি যাওয়ার ব্যাকুলতায় হেসে উঠলো। অনন্ত আবার ডাক দিলো: মা!

'তোদের আর যাওয়া হবে না—' হাসতে-হাসতে রত্না জবাব দিলো, 'আমার এখানে থেকে তুই গোরু-টোরু চরাবি!'

জবাব শুনে অনন্ত বজ্রাহত। নিস্তেজ, হতাশ হয়ে ছোটো মুখ ক'রে আবার শাল জড়িয়ে শুয়ে পড়লো। ভাববার চেষ্টা করলো আজ না যাওয়ার কারণটা কি হতে পারে। মা'র ওপর ভীষণ রাগ হোলো, এমনকি রাগের চোটে কান্না এসে গেলো। সেই মুহূর্তে মনে হোলো, বাবা আর ওদের ছোট্টো শহরটা ছেড়ে সে বোধ হয় এখানে আজ পাঁচ-ছ বছর ধ'রে আছে। অনন্তর আজ যাওয়া হচ্ছে না দেখে একজন খুব খুশি হোলো। সে তারকা।

দাওয়ার ওপর এসে, আশপাশে কেউ নেই দেখে, তারকা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে অনন্ত, তোর আজ যাওয়া হোলো না?'

অনন্ত ঈষৎ করুণভাবে পালটা প্রশ্ন করলো, 'মা যেতে দেরি করিয়ে দিচ্ছে কেন?'

'বুধবার, আমি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার পর— তোরা যেতে পারবি।'

'না। আজ আমি যাবোই।' মা বুধবার অবধি থাকবে না এটা ভেবেই অনন্ত কথাটা বললো!

'কার সঙ্গে যাবি?'

'কেন— মার সঙ্গে!'

'এক মাসের আগে তোর মা যাবে না রে— বুদ্ধু!' ব'লে তারা ভেংচি কাটলো।

কথাটা শুনেই অনন্তর মুখ কালো হয়ে গেলো। বেশ বুঝতে পারলো মা সকালে ওর কথায় হেসে চুপ হয়ে গিয়েছিলো কেন, তবুও তারকার কথাটা বিশ্বাস করতে ওর মন চাইলো না। বিছানা থেকে উঠে, সে মাঝখানের কামরায় এলো। এক কোণে সুন্দরা ব'সে। সন্দিগ্ধ চোখে অনন্ত তাকাচ্ছে দেখে, মা বলে উঠলো, 'ছুঁস নি— ওখানে শাড়ি রেখেছি।' অনন্তর কাছে এবার পুরো ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে উঠলো। কোনো ক্রমে চাপা গলায় মা-র কথার জবাবে 'না' ব'লে সে ভেতরে গেলো, তারপর, একটু পরে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে, খেলতে চলে গেলো বাইরে।

অনন্ত চার দিনের হিসেব করছিলো। এখন ওর একমাত্র সঙ্গী তারকা। বিয়ে হয়ে গেছে ব'লে— তারকাও বাড়ির বাইরে যেতে পারতো না। ঘরের উঠোন আর দাওয়া— এইটুকুই ছিলো ওদের খেলাধুলার জায়গা। কখনো ঘর, কখনো বাড়ি, কখনো গাড়ি বানানো, এই ছিলো ওদের খেলা। কখনো সখনো অনন্ত আবার পাঠশালায় শেখা খেলা আর মজার ধাঁধা আলোচনা ক'রে ক'রে তারকাকে বোঝাতো। যদিও তারকা কিছুই বুঝতো না ও-সব, তবুও মহা উৎসাহের সঙ্গে সব কিছু শুনে যেতো। মাঝে মাঝে খেলতে ভালো না লাগলে, অনন্ত নিজের বইপত্র ওকে প'ড়ে প'ড়ে শোনাতো, বলতো, এই দেখ, এখানে কবিতাও আছে। অনন্তর এই প্রজ্ঞা লক্ষ করে তারকা খুশি হয়ে উঠতো মনে-মনে। মাঝে-মাঝে, অনন্ত কবিতা আবৃত্তি করেও শোনাতো আর তারকা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করতো, 'অনন্ত, তুই এত ছোটো ছোটো অক্ষর পড়িস কী ক'রে?' অনন্ত ঈষৎ গর্বের সঙ্গে জবাব দিতো, 'আরে—এ আর এমন কী ছোটো অক্ষর— এর চেয়েও ছোটো ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর আছে —সেগুলো দেখলে তুই কী বলবি তাহ'লে?' এহেন ক্ষুদে অক্ষর যখন, স্কুলের লেখাপড়া তাহলে খুবই কঠিন ব্যাপার— ভেবে তারা চুপ করে যেতো, আবার, অনন্তর একাগ্রতা দেখে খুবই খুশি হয়ে যেতো। বাবার কাছে অনন্তর কেতাবি বিদ্যে, কথাবার্তা, খেলা— এই সব একেবারে

সাত কাহন করে শোনাতে বসে যেতো। সন্ধ্যেবেলায়, ক্ষেতের কাজ সেরে মল্ল বাড়ি এলেই শুরু হয়ে যেতো এই গল্প।

একদিন দুপুরে, তারকাকে পাশে বসিয়ে রত্না আর সুন্দরা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে উপদেশ দিলো শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে, শাশুড়ির সঙ্গে কেমন করে মানিয়ে চলতে হয়, শ্বশুরের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়। এই সব শুনে তারার মনে হোলো শ্বশুরবাড়ি এক ভয়ংকর জায়গা, কেননা শ্বশুরবাড়ি বলতে কি বোঝায় তা ঠিকমতো বোঝার বয়েস ওর তখনো হয় নি। যাই হোক, ওরা যাই বলুক, তারকা শুধু ব'সে ব'সে ওঁ আঁ করে জবাব দিয়ে গেলো। ওর মন তখন অনন্তর সঙ্গে কখন খেলতে যাবে— এই সব ভাবছে। ওদিকে, অনন্তও বাইরে খেলার কোনো সঙ্গী না পেয়ে— গোয়ালঘরে এসে গোরু-বাছুরের সঙ্গে খেলতে লেগে গেছে। মাঝে-মাঝে দরজার ফাঁক দিয়ে মা দেখছে কিনা লক্ষ করলো, কেননা মা যদি এই খেলা দেখে তাহলে বেজায় রেগে যাবে। অতএব, ও মনে-মনে একটা উপায় ঠাউরে নিলো। বইপত্রগুলো সে পাশেই রেখেছিলো। ভেতর থেকে সুন্দরাকে বেরোতে দেখেই সে বই তুলে এমন ভাব দেখালো যেন কত পড়ছে। আর কেউ আসছে না দেখে, বাছুরের পিঠের ওপর চড়ে, তার ল্যাজ মুচড়ে— সে আরো নানা ধরনের খেলা খেললো। ছোট্ট বাছুরটা তার কাছে খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়। বাছুরের পিঠে চড়ে অনন্ত অনেকক্ষণ ধরে কান টানছিলো, বাছুরটা হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াতে— অনন্ত ধপ করে মাটিতে পড়ে যেতে বেশ ঘা লাগলো। বেচারা আঁ আঁ করে কেঁদে উঠলো সরবে!

ভেতর থেকে রত্না সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো, 'কী হয়েছে? বাছুর লাথি ছুঁড়েছে?'— বলেই রত্না ওকে কোলে তুলে নিলো। এর মধ্যেও অনন্ত কিন্তু বই-মুখ হ'তে ভোলে নি! চোখ মুছিয়ে দিতে রত্না বললো, 'আরে — ভেতরে ব'সে পড়লেই পারতিস— এখানে কেন এলি?' অতঃপর, অনন্তকে কাঁধে বসিয়ে রত্না ভেতরে গেলো। হইচই শুনে তারকাও ছুটে বেরিয়ে এসেছিলো। সুন্দরা একটু রেগে গিয়ে বললো, 'ওকে আবার এখানে নিয়ে এলে কেন? ওখানে ফেলে রাখতে বেশ হোতো।

বাছুরের সঙ্গে খেলিস নি— পই পই করে বলেছি ওকে— তবুও আমার কথা কানে নেয় নি— সারাক্ষণ শুধু ওখানে ঢুকে··· ।' অনন্তর পায়ে কতটা চোট লেগেছে দেখার জন্যে সে আরো কাছে এলো। রত্না অনন্তর কান্না থামাবার জন্যে একটা লাড্ডু দিলো। ব্যাস, হাতে লাড্ডু পেয়েই অনন্ত এক দৌড়ে পালিয়ে গেলো — বাইরে খেলা করার জন্যে !

ছেলে পাছে তেলের লাড্ডু খেয়ে ফেলে, এই ভেবে সুন্দরা অনন্তকে ডাক দিলো, 'অনন্ত— এখানে আয়— ওটা বাইরে নিয়ে যাস নি—' কিন্তু অনন্ত শুনলো না, দৌড়ে পালাতে ব্যস্ত। সুন্দরা ঈষৎ রূঢ়ভাবে মন্তব্য করলো, 'অনন্ত— তোকে ডাকছি, গ্রাহ্য হচ্ছে না ? বাচ্চা যদি বাচ্চার মতো না থাকে— হুঁ— চোখের ইশারা যে ছেলে বুঝতে না পারে, সে ছেলেই নয়—'

এইসব বলে গজগজ করতে করতে ভেতর থেকে নিজের ঝুলি থেকে ঘিয়ের তৈরি একটা লাড্ডু নিয়ে এসে— সুন্দরা, যাতে রত্না না দেখে, এমনভাবে শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে এনে, অনন্তকে দিলো, আর অনন্তর হাতের লাড্ডু কেড়ে নিয়ে তারকাকে দিয়ে দিলো।

পরের দিন সকালবেলায় অনন্ত আর তারকা খেলছিলো। বেলা বাড়লেও, দাওয়ার ওপর ছায়া পড়ে নি। তবুও ওদের কোনো খেয়াল নেই, বেশ মনের আনন্দে খেলছিলো ওরা দু জনে। এমন সময় এলো তারকার শ্বশুর। এসেই সে বললো, 'রত্না, কাল তোমরা তারকাকে 'বিদেয়' করবে··· এর পর আর কোনো ভালো দিন নেই।'

রত্না ঘড়া পরিষ্কার করছিলো। হাত ধুয়ে শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে সে চটপট বেরিয়ে এলো। তারকার শ্বশুরকে সে বসতে বললো না বটে, কিন্তু একটা কম্বল টেনে বিছিয়ে দিতে দিতে, তারকাকে এক চটকা দেখে নিয়ে একটু গলা উঁচিয়ে বললো, 'আমিও পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেছি— কালকের দিনটা অবশ্য ভালো। তারাকে পাঠাবার তোড়-জোড় আমি করেই রেখেছি।'

কথাটা কানে যেতেই তারকা পালালো। অনন্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে মাঝের কামরায় চলে গেলো। ভুবনা, তারকার শ্বশুর

—ততক্ষণে কম্বলের ওপর বসে পড়েছে।

ভুবনা বললো, 'তাই বলো, তাহলে তোমরাও তৈরি হয়ে আছ।' তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে, 'তারা এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, সঙ্গে কে যাবে ? সুন্দরা ?'

'না। আমি কাল চলে যাচ্ছি—যতো রাজ্যের কাজ জমে গেছে বাড়িতে। এখানে তো প্রায় দিন পনেরো কেটে গেলো, না ?' ভেতর থেকে সুন্দরা জবাব দিলো।

'আমিই মাঝে মাঝে, এই দু-চার দিন অন্তর যাতায়াত করবো। তোমাদের বাড়ি তো আমার কাছে নতুন ব্যাপার নয়। চিন্তার কী আছে এতে ?' রত্না জবাব দিলো।

'সবই জানাশোনার মধ্যে—তবুও ঘরের কিছু রীতিনীতি তো মানতে হয়—' ভুবনা উঠতে উঠতে কথাটা বললো।

'আরে, এখুনি উঠছো কেন ? একটু চা খেয়ে তো যাও।' রত্না বলে উঠলো।

'না, না, একটু আগেই খেয়েছি। এখন আর খাবো না। ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলাম, বাড়িতে বলে দিয়েছিলো তোমাদের সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলতে, তাই এসেছিলাম। এখন যাই— নইলে ক্ষেতে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।'

সুন্দরা বাধা দিলো, 'ওমা— তা কি হয়— নতুন সম্বন্ধী হয়েছো— চা না দিয়ে ছাড়ি কেমন ক'রে ?' সুন্দরার গলার আওয়াজে হালকা রসিকতার ছোঁয়া।

'আমার সঙ্গে তো আর নতুন কোনো সম্বন্ধ হয় নি— আমি আগেও তোমাদের কাছে যা ছিলাম, এখনো তাই আছি।'

'কী ক'রে ? এখন তো আমাদের বাড়ি থেকে বউ অবধি আদায় করে নিয়েছো। তখন আসতে শালার বাড়ি— এখন আসছো বেয়াইয়ের বাড়ি ! সম্বন্ধ নতুন হোলো না ?'

'কিছু অদলবদল হয় নি বোন-- তখনো সম্বন্ধীর বাড়ি ছিলো, এখনো তাই আছে। মেয়ে দিলেই কি ঘর পালটে যায় ?' কথাগুলো

ব'লে হুবনা পা বাড়ালো।

'আরে— যাচ্ছো কোথায়? চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছি— চা-টা খেয়েই যাও!' রত্না একান্ত সুরে অনুরোধ জানালো. তারপর ভেতর থেকে একটা কাপড়ের গাঁটরি এনে হুবনাকে শাড়ি ব্লাউজ দেখাতে বসে গেলো। হুবনা কাপড় দেখতে দেখতে কোন্‌টার কতো দাম হতে পারে আন্দাজে বলে গেলো। কাপড় দেখাতে দেখাতে রত্না মাঝে মাঝে ভেতরে গিয়ে চা তৈরির বন্দোবস্তও করছিলো। হুবনা চা খেতে খেতে বললো, 'সুন্দরা যদি মেয়ের সঙ্গে আসতো আমিই তাহলে ওকে শাড়ি পরিয়ে পাঠাতুম— তোমরা এত খরচা করতে গেলে কেন?'

'আমিও তো তাই বলেছিলাম, কিন্তু ও শুনলো না।' তারকার সঙ্গে গিয়ে পাঁচ-ছ দিন থেকে নতুন শাড়ি পরে আসার যে সম্ভাবনা ছিলো, সুন্দরা তা বলেই ফেললো।

'এই ভেবে আমিও আর শাড়ি কিনি নি— পরশুদিনই ও চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো।'

'তাতে কী হয়েছে? পরে দিলেও চলবে।' অবশ্য মনে মনে, 'ভগবান জানে-কবে-শাড়ি-দেবে-এরা' একথাও সুন্দরা ভাবছিলো।

রত্না বলে উঠলো, 'বার-বার তো আর বিয়ে হয় না। তোমার নামে কেনা শাড়ি বাপু তুমি পরেই যেও— আর ওখান থেকে যেটা পাবে— এখানে রেখে যেও।'

দিন চারেক থেকে শাড়ি নেওয়ার প্রস্তাব সুন্দরার ভালো লাগলো না। সে বললো, 'কেন, মিছিমিছি এত কষ্ট করবে— কাল তো আমি চলেই যাবো।'

অনন্তও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলো, মা যদি আরো চারদিন থেকে যায়— ভেবে খুব খারাপ লাগছিলো ওর— যেই শুনলো মা কাল যাবেই বলছে, সে খুশিতে লাফ দিয়ে উঠলো। একটু পরে, চা খেয়ে হুবনা চলে গেলো।

এর পরই রত্না তারকাকে নিয়ে পড়লো, 'শ্বশুর এলো— কম্বল পেতে দিতে কী হয়েছিলো তোর? অমনি খেলতে চলে গেলি? কাল

শাশুড়ির কাছে গিয়ে কী ক'রে থাকিস, দেখবো !' মা-র বকুনি শুনে তারকার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ভাবতে লাগলো, শ্বশুরবাড়িতে কেমন ক'রে থাকে লোকে, আজ একমাস ধ'রে শ্বশুরবাড়ির চালচলন তাকে বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু এখনো সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না শ্বশুরবাড়িতে কীভাবে থাকতে হয়। কখন কী ভুল-চুক হয়, কে জানে। এইসব চিন্তায় ভারাক্রান্ত মনে তারা মামীর কামরায় এসে আস্তে আস্তে বললো, 'তোমাদের ছেড়ে কাল আমি ওখানে একা-একা থাকবো কী ক'রে ?'

সুন্দরা হেসে বললো, 'ত্যুৎ ! ওসব কেউ ভাবে না কী ? দু-চার দিন ওখানে থাকার পর মা-বাবার কথাও ভুলে যাবি— বর এমন জিনিস !' সুন্দরার মুখে রহস্যের হাসি আরো সহজ, স্পষ্ট-।

তারকা ঠিক বুঝতে পারলো না মামী কী বলতে চাইছে। শুধু বললো, 'মাকে ছেড়ে আমি কোনোদিন বাইরে থাকি নি।'

'তাতে কী হয়েছে ? একই গাঁয়ে থাকবি, সকাল হলেই মাকে দেখতে পাবি। যদি অন্য কোনো গাঁয়ে তোর বিয়ে হোতো— তাহলে কী করতিস ? একবার গেলে ছ মাসের মধ্যে আর আসতে পারতিস না। ওই যে সুমি— কাল গেছে, দেখবি ফিরতে ফিরতে কালীপুজো এসে যাবে। তোর আর বাপের বাড়িই বা কি— শ্বশুরবাড়িই বা কি—'

'সুমি খুবই চালু মেয়ে মামী। আমার মতো নয়—'

'একই গাঁয়ে আছিস ব'লে বার-বার বাড়ি আসিস নি যেন। এখানকার কথা ওখানে— ওখানকার কথা এখানে নিয়ে চালাচালি করবি না কখনো। মনে রাখবি, ওটা তোর শ্বশুরবাড়ি। এমন কিছু কখনো করবি না যে ঝগড়া হয়ে যায় দু বাড়িতে। তোকে পই পই করে সব বলে দিচ্ছি আমি।'

তারকা আর বসলো না ওখানে। শ্বশুরবাড়িটা ওর কাছে ক্রমশ এক দুর্বোধ্য ধাঁধার মতো মনে হতে লাগলো। সুন্দরা তারকার কাছে এসে দাঁড়ালো এবার, 'তুই আর ছোটো খুকি নোস এখন, তবুও রোজ সকালে তোকে ডেকে তুলতে হয়। ওখানে গেলে, শাশুড়ির ঘুম

ভাঙার আগেই তুই উঠে পড়বি, উঠে বাটনা বাটতে, চাকি পিষতে বসে যাবি— যদি দেখিস শাশুড়ি কাজ করছে, তাহলে শাশুড়িকে বারণ করে তুই নিজে কাজে বসে যাবি। কাজ ছাড়া কখনো চুপচাপ বসে থাকবি না। এখানে যেমন মা কিছু করতে বললে তুই মুখ ফোলাস— ওখানে ভুলেও ও-সব করবি না। এখানে যেমন, যখন খুশি নিজেই তুলে তুলে খাস, ওখানে গিয়ে অমন করিস নি। শাশুড়ি যতটা দেয়, ততটাই খাবি, খবর্দার চেয়ে খাবি না।' এই ধরনের আরো কিছু কথা ব'লে সুন্দরা চুপ করলো।

ওই দিনটা বড়ো খারাপ কাটলো তারকার। দুপুরে অনন্তর সঙ্গে খেলতেও পারে নি। জোয়ার পরিষ্কার করতে করতে, ঘরের কাজ করতে করতে আর জ্বালানী কাঠ বইতে বইতে, সন্ধ্যে অবধি কেটে গেল। মাঝে মাঝে অনন্ত খেলবার জন্যে ডাকতে এসেছিলো, তারকার যে ইচ্ছে ছিলো না— তা নয়, তবুও যায় নি। অনন্তর মা অবিশ্যি অনন্তকে বলেছিলো, 'কাল চলে যাবো আমরা— তুই পড়াশোনা শুরু করে দে এখন থেকে।' চলে-যাওয়ার-কথা-শুনে-খুশি অনন্ত খেলা ভুলে গেল বটে, কিন্তু বইপত্র নিয়েও বসলো না। সেদিন সন্ধ্যেবেলায়, অনন্ত আর তারার মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিলো অনেকক্ষণ ধ'রে। অনন্ত কিন্তু সব কথার জবাব হুঁ হাঁ দিয়েই সেরে যাচ্ছিলো। শেষে, তারা জিজ্ঞেস করলো, 'তোরা কাল যাবি— আবার আসবি কবে?'

'কেন?'

'বল্ না— কবে আসবি আবার?' অনন্তকে কেন আবার আসতে হবে, তারা তার সঠিক কোনো জবাব দিতে পারলো না।

একটু ভেবে অনন্ত জবাব দিলো, 'ছুটির সময় বাবাকে বলে চলে আসবো এখানে, কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারবো না।'

তারকা হঠাৎ অনন্তর হাতটা ধরে, খুবই কাতরভাবে মিনতি জানালো, 'চার দিন তো থাকতে পারবি?'

পরের দিন সকালে হুবনা এলো তারকাকে নিয়ে যাবার জন্যে। শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্যে তারকাকে তৈরি হতে হোলো। পাড়ার সব মেয়ে

বউ এক জায়গায় এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। নতুন শাড়ি পরে তারা পাঁচ জনের ঘরে গেল— মাঙ্গলিক চাল আর ফল দিয়ে সবাই ওর কোঁচড় ভরে দিলো। সুন্দরা এক ফাঁকে ওকে ভেতরে ডেকে কিছু খাইয়ে দিলো, কিন্তু ওর গলা দিয়ে কিছু যেন আর নামতে চাইলো না। দু-এক গ্রাস কোনোক্রমে গলাধঃকরণ ক'রে সে বেরিয়ে এলো। মা বলতে পুজোর জায়গায় প্রণাম করলো প্রথমে, ত'রপর মা, বাবা আর অন্যান্য গুরুজনকে। উপস্থিত সবাই তারকার গুণবর্ণন'য় পঞ্চমুখ। নিজের গুণের কথা শুনে তারার মুখ লজ্জায় লাল হোলো ; চোখে জল এলো ; ভারী ভারী পা ফেলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

অন্যান্য মেয়ে-বউরাও ওর সঙ্গে সঙ্গে এলো। শ্বশুর হুবনা সবার আগে। তার পেছনে পাঁচ জনের হাতে কলার কাঁদি। পাঁচ পা এগিয়ে সুন্দরা বলে উঠলো, 'জল দিয়ে কুলকুচো কর।' মামীর হাত থেকে জলের ঘটি নিয়ে তারা কুলকুচো করলো।

মেয়েদের ভেতর থেকে একজন বললো, 'পাগলি ! এই গাঁ ছেড়ে তো আর যাচ্ছিস না, রোজ মা-বাবাকে দেখতে পাবি, কাঁদছিস কেন ?'

রত্নার চোখও কান্নায় ভারী। আরো দু জন বউয়ের চোখেও জল এলো। মল্ল ধুতির খোঁট দিয়ে চোখ মুছে নিলো। এবার, তারকার চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়লো, মামীকে জড়িয়ে ধরে সে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠলো এবার। এইসব দেখে, অনন্তর চোখেও জল দেখা দিলো। হুবনা কড়া সুরে ধমক দিলো : কী হচ্ছে এসব ? আমি কি ওকে ফাঁসি-কাঠে চড়াতে নিয়ে যাচ্ছি না কী ?

'আরে, শ্বশুরবাড়িতে হাসতে হাসতে যেতে হয়···পুরাণে আছে সীতা রামের সঙ্গে জঙ্গল অবধি গিয়েছিলো।' বিধবা চাঙ্গলাবুড়ী দূরে দাঁড়িয়ে-ছিলো, সে-ই কথাটা বললো।

তারকা আগে আগে চললো। মেয়েরাও ওর সঙ্গে কয়েক পা এগোলো। তারকা অস্ফুট স্বরে ওদের ফিরে যাবার জন্যে বললো। এক-একজন করে থেমে গেলো এগোতে এগোতে।

হুবনা কাপড়ের গাঁটরি তুলে আরো কয়েক পা এগোলো, মেয়েরা

হাতে ফল নিয়ে ভুবনার আগে আগে চললো, তারকা কয়েক পা এগিয়ে অনন্তকে বললো, 'তুই চল আমার সঙ্গে, আবার ফিরে আসিস।'

অনন্ত নীরব থেকে ভাবতে লাগলো যাবে কি যাবে না, ওর মা বললো, 'অনন্ত— তুই যা না দিদির সঙ্গে!'

তারকার কাছে এক ছুটে চলে এলো অনন্ত। বউ আর ননদ এবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারকাকে যেতে দেখলো। চোখের আড়াল না হওয়া অবধি তারকাও ফিরে-ফিরে ওদের পেছন দেখতে লাগলো। 'তারকা বিদায়' সমাপন হোলো।

রত্না চোখ মুছতে মুছতে সুন্দরাকে বললো, 'মাকে ছেড়ে বেচারী কোনোদিন বাড়ির বাইরে যায় নি এর আগে।'

সমাগতাদের একজন জবাব দিলো, 'দুঃখু করার কী আছে? ও তো আর পরের বাড়ি যাচ্ছে না।'

'মেয়ে আমাদের খুব চালাক। অনন্তকে ভীষণ ভালোবাসে। ঠিক ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।' সুন্দরা চার-দিন-একসঙ্গে-থাকার মনোভাব ব্যক্ত করলো।

'ওখানে গেলেও ওর কোনো অসুবিধে হবে না। ঠিক মিলে মিশে থাকবে, দেখো।'

'তবে— ওদেরও মিলে মিশে থাকার মনটা থাকা চাই। আমাদের সোনার মতো মেয়ে...

'ছেড়ে দাও ওসব কথা— মনের মতো বউ ব্যাটা কে না চায়? অবশ্য তারার শাশুড়ি একটু বদমেজাজি— কাল মন্দিরে যাবার সময় ওর সঙ্গে দেখা হবে আমার, ওকে বোঝাবো এখন বউ-ব্যাটা লায়েক হয়ে গেছে —তুই বরং পুজো-আর্চায় মন দে।' চাঙ্গলাবুড়ি অভয় দিলো সবাইকে।

সবাই এবার নিজের নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দিলো।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অনন্ত পালিয়ে এলো তারকার শ্বশুরবাড়ি থেকে।

সুন্দরা জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি?' —তারপর নিজের মনেই গজগজ করে উঠলো, 'এ ছেলেকে নিয়ে আর পারি

না— পরের বাড়িতে এক মিনিটও থাকতে পারে না।'

'দিদি ভেতরে চলে গেলো, আমি আর ব'সে ব'সে কী করবো? তাই চলে এলাম।'

'কেন, মারমপা ওখানে ছিলো না?'

'ছিলো। জোয়ারের বস্তার ওপর বসেছিলো। আমার সঙ্গে কোনো কথাই বললো না।' অনন্ত মুদ্রা সহযোগে হাত-মুখের ভঙ্গি করে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলো। তারপর মন্তব্য করলো, 'ব্যাটা বেজায় হারামী!'

অনন্তর গলা শুনে রত্নাও বেরিয়ে এসেছিলো ছুটে। জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁ রে, বরণ করতে কে এসেছিলো?'

'চিমমা মামী।' ব'লেই অনন্ত বাছুর ধরার জন্যে দৌড় দিলো। মল্ল তখন সবে বাছুর ছেড়ে দিয়েছে।

ওই দিনই, বিকেলে সুন্দরা চলে যাচ্ছে ব'লে মল্ল গিয়েছিলো তারকাকে ডাকতে। শাশুড়িকে ব'লে তারকা বেরিয়ে এসেছিলো। সে না আসা অবধি সুন্দরার গাড়ি দাঁড়ানোই ছিলো। অনন্ত, যথারীতি, মহা উৎসাহে গাড়ির মধ্যেই বসেছিলো। সুন্দরা তখনও ঘরের ভেতর। অনন্তকে ঘরের মধ্যে আসার জন্যে ব'লে তারকাও ভেতরে ঢুকে গেলো।

তারকা আসতেই সুন্দরা ওকে ডেকে নিয়ে গেলো, বললো, 'একটু খেয়ে যা।' গাঁয়ে ফেরার জন্যে দিশি ঘি দিয়ে যে লাড্ডু বানানো হয়েছিলো, তারই একটা খেতে দিলো ওকে। খাবার আগে, অনন্তকে, আর একবার মনে পড়লো ওর। সুন্দরা বললো, 'ওর কথা ভাবিস নি —ও তো যখন তখন খেয়ে যাচ্ছে। নে নে— তুই খেয়ে নে।'

ওদিকে মল্ল হইচই শুরু করে দিয়েছিলো, 'নাও, নাও,— সব চটপট করো, নইলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে, রাত হয়ে যাবে।' মল্লর তাড়া দেখে সুন্দরা ও আরো পাঁচ-ছজন চটপট গাড়ির মধ্যে উঠে বসলো। গাড়ি ছাড়বো-ছাড়বো করছে, তারকা অনন্তকে জিজ্ঞেস করলো, 'সকালে না খেয়ে পালিয়ে এলি কেন রে?'

সুন্দরা আরাম করে ব'সে রত্নার মুখটা এক ঝলক দেখে নিয়ে জবাব

দিলো, 'বাব্বা ! তোর শাশুড়ির সামনে কেউ খেতে পারে ?' সুন্দরার মুখে এক চিলতে চাপা হাসির ঝিলিক মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেলো, যেন তারকা রহস্যটা না বুঝে ফেলে ।

তারপরই মোলায়েমভাবে বললো, 'হাজার হোক— ওটা তোর শ্বশুর-বাড়ি— তুই বউ মানুষ— অনন্ত বেচারা কী ক'রে তোর শাশুড়িকে সোজাসুজি খাওয়ার কথাটা বলে ? চিমমারই উচিত ছিলো ওকে ডেকে খাওয়ানো— মাথার চুল পেকে গেলো চিমমার, অথচ আক্কেল হোলো না এখনো !' সংযতভাবে কথা বললেও, তিক্ততা কিন্তু ঢাকা গেলো না ।

কথাগুলো শুনে তারকার মন আরো খারাপ হয়ে গেল । মনের মধ্যে যন্ত্রণার এক তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রবল হোলো । কিসের, কেন এই যন্ত্রণা সে যেন ঠিক বুঝতে পারলো না । নানা কথা ভেবে নিজের মন অন্য দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করলো পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করলো, তবুও পারলো না— সূচিবিদ্ধ সেই যন্ত্রণায় আহত হতে-হতে সে এক সময় শ্বশুরবাড়ি ফিরে এলো ।

5

ঘরে বউ এসেছে— এই আনন্দে, খুশিতে ভরপুর হয়ে চিমমা গাঁয়ের প্রত্যেক বাড়িতে কলা বিলি করলো পরের দিন, তারার বাড়ি থেকে পাঠানো কলা কম পড়ে যাওয়ার জন্যে বাজার থেকে নিজেই আরো কিছু কলা কিনিয়ে আনলো । একমাত্র ছেলে যখন, তার ব্যাপারে কার্পণ্য করার কোনো মানে হয় না । একজনকে বাদ দিয়ে আর এক-জনকে কলা দিয়ে কি দরকার— সবাইকে দিলেই হয় । পাঁচ-সাতটা বউ তো আর আসবে না ! আককাতায়িও বেশ খুশি হয়েছিলো, এতদিনে একটা বউদি পাওয়া গেছে খেলার সাথী হিসেবে । তারা যেদিন এ বাড়িতে পা দেয়, সেদিন আককাতায়িকে চিমমা কলা দিয়েছিল— কলা নিয়ে মা'কে আককা জিজ্ঞেস করেছিলো, 'তারকাকে কলা দিলে না ?'

'কী বললি হতচ্ছাড়ি ! তারকা !' রেগে গিয়ে চিমমা প্রায় এই মারতে যায় মেয়েকে, 'তারকার নাড়ি কেটেছিস তুই ? বউদি বলতে কী হয়েছে ? বউদি বলতে যদি লজ্জা করে— তাহলে দিদি বল। ফের যদি শুনি তুই ওর নাম ধরে ডাকছিস— তাহলে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো !'

বকুনি খেয়ে আককাতায়ি চুপ। তারাকে ডেকে চিমমা কলা দিলো। কলা নিয়ে তারা চলে এলো বারান্দায়, ওর সঙ্গে সঙ্গে আককা-ও এলো। বারান্দায় দু জনে মিলে ভাগাভাগি করে কলা খেলো। একটু পরে আককা তারকাকে নিজের খেলনাপাতি দেখালো। খেলনা দেখে তারার ভীষণ খেলতে ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু অতি কষ্টে বেচারা নিজের ইচ্ছেটা চাপা রেখে দিলো। শ্বশুরবাড়ি— এখানে খেলাধুলো চলবে না। মা আর মামীর উপদেশ শুনে-শুনে তারকার মানসিকতা যেন প্রৌঢ়ত্বে পোঁছে গেছে। সমস্ত খেলনা এক-এক করে দেখাবার পর আককা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো, 'কাল আমার সঙ্গে খেলবে তো ?'

তারকা নিরুত্তর থাকলেও প্রশ্নটা চিমমার কানে গিয়েছিলো। চিমমা বাইরে এসেছিলো কাঠ আনার জন্যে। চিমমা বলে উঠলো, 'বেশ— বেশ —শোনো মেয়ের কথা ! ও কি তোর সঙ্গে এখানে খেলা করতে এসেছে ? রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজ নেই ওর ? দাঁড়া, তোর বিয়ে হোক —মজা বুঝবি—।' চিমমার কথা শেষ হবার আগেই তারা রান্নাঘরে চলে গিয়েছিলো। বিনম্রভাবে শাশুড়িকে প্রশ্ন করেছিলো, 'মা, সন্ধ্যে-বেলার জন্যে কী রান্না হবে !'

'ভাতের জন্যে জল চাপিয়েছি— তুই বরং তিন কুনকে চাল বেছে ফেল চট ক'রে। উনুনে হাত-পা ধোয়ার জল গরম করবি। তোর শ্বশুর এসে পড়লো ব'লে— চটপট রান্না সেরে ফেল।' চিমমা হুকুম জারি করে চলে গেলো।

তারকা মন দিয়ে সব কথা শুনলো। তাড়াতাড়ি করে ডাল-ভাত ক'রে ফেললো। হাত-পা ধোয়ার জলও গরম করে তৈরি রেখে দিলো। ততক্ষণে হুবনাও খাবার জন্যে এসে গেছে। তারা হাত-পা ধোয়ার জল এগিয়ে দিলো। থালা রেখে, পিঁড়ি দিয়ে, ঠাঁই করে, সে বারান্দায়

বসা চিমমাকে ডাক দিলো : মা!

চিমমা জবাব দিলো : 'কী হয়েছে ? খেতে দিয়েছিস ?'

হুবনা উত্তর দিলো, 'তুমি এদিকে এসো— ওদিকে বসে বসে কী করছো ? বউয়ের হাত তাক অবধি পৌঁছচ্ছে না।'

'রুটির চুবড়ি তাকের ওপর আছে না কী ?' বলতে বলতে চিমমা উঠে এলো, 'কাল পুজো আছে, সব গোছগাছ করে রাখতে হবে না ? আমি কি শুধু শুধু বসে হাত-পা ছড়াচ্ছি না কী ?' একটু ঝংকার দিয়ে ব'লে উঠলো সে, তারপর রুটির চুবড়ি নামিয়ে হুবনার পাতে রুটি দিলো।

এরই মধ্যে তারকা শাশুড়ির অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করে, শ্বশুরের হারিকেনটা পরিষ্কার করে দিলো।

পরের দিন দুপুরে পুজো-টুজো দিয়ে শাশুড়ি আর বউ ঘরে ফিরে আসছে, এমন সময় পেছন থেকে চাঙ্গলাবুড়ি ডাক দিলো। চিমমা পেছন ফিরে তাকালো। হাতে ছোট্ট একটা পুজোর থালা, সোনার প্রদীপ, চাঙ্গলা জিজ্ঞেস করলো, 'চরণামৃত নিলে না যে বড়ো ?'

'কে বললো নিই নি ? পুজো করতে এসে 'চরণামিত্তি' না নিয়ে কেউ যায় ? সবার আগে গিয়েছিলুম, চরণামিত্তি নিয়ে তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। ঘরে একগাদা কাজ,' এইটুকু বলে তারার উদ্দেশে, 'তুই আগে আগে চলে যা, উনি এলে খেতে দিস, আমি এর সঙ্গে একটু কথা বলে যাবো।'

'বড়ো কাজের মেয়ে,' চিমমার উদ্দেশে চাঙ্গলা জানালো, 'এখনো ডাগর হয় নি, খেলাধুলোর বয়েস— তবুও বড়ো বুঝদার মেয়ে তারা!' —তারপর বিষয় বদলে, 'আজ তো পুজো দিলে— না ?'

'হ্যাঁ', পুজোর দিন হিসেবে এত ভালো দিন আর আছে ? এই দিন শ্রীহংসরাজা আদিনাথকে রস খাইয়েছিলো, এইজন্যে আমিও মামাকে বলেছিলুম এখানে কোনোক্রমে এক কলসী তাজা রস পাঠাতে।'

চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখে নিয়ে চাঙ্গলাবুড়ি আবার বললো, 'এই বোকা-গাধাগুলো কি আর এইসব খবর রাখে ? মামা তো কোনো জবাবই দেয় নি।' তারপর গালে আঙুল রেখে, 'শেষে কী করি ভেবে

না পেয়ে— তোমার ভাইকে পাঠালুম মিরজিতে গোটা পাঁচ-ছয় আম কেনাবার জন্যে— যাতে আনারস পুজোটা অন্তত করতে পারি— ভগবানকে পুজো না দিয়ে আমি আনারস মুখে অবধি দিতে পারি না—' এতটা ব'লে আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে, 'কিন্তু ভগবানের চোখ ফাঁকি দেওয়া শক্ত, আজ সকালেই দেখি মামা তাজা রস পাঠিয়ে দিয়েছে। ভগবানে ভক্তি থাকলে সব-কিছু ঠিক পাওয়া যায়।'

চিমমা জানতে চাইলো, 'তোমাকে কে পাঠিয়েছিলো?'

'ভগবানের নামে পাঠানো ফল, কার নাম বলি বলো তো? এক ঘটি রস পাওয়া গিয়েছিলো, আমি সব দিয়ে দিয়েছিলুম দেখে আবার গৌড় সাহেবও রস পাঠিয়েছিলো।'

কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে এলো। বাড়ির পথ ধরে চিমমা বললো, 'যাই তাহলে আজ— চড়া রোদ, তোমাকে গিয়ে আবার এখন রান্না করতে হবে। গরমও পড়েছে তেমনি— খালি জল তেষ্টা পায়।'

'গতকাল আমার আবার উপোস গেছে।' চাঙ্গলা উপোসের কথা তুলে বুঝিয়ে দিতে চাইলো, 'আমার মতো উপোস করলে তোমাদের কী অবস্থা হোতো।'

চিমমা জিজ্ঞেস করলো, 'ব্বাবা! কত উপোস করো তুমি। হপ্তায় তিন-চারবার তো উপোস হয়ে যায় তোমার!'

'খেয়ে দেয়ে এই শরীর নিয়ে আর কী করবো বলো— মেয়েমানুষের শরীর, একদিন-না-একদিন ভেঙে পড়বেই— মাটির সঙ্গে মিশে যাবে— খাওয়াদাওয়া ক'রে কি আর শরীর বাঁচানো যায় ভাই, আর বাঁচিয়ে হবেই বা কী?' শুকনো গলা, ঠোঁট, বুড়ি একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো, 'অষ্টমি চতুর্দশীতে তারা উপোস দেয় তো?'

'দেয় বলেই তো জানি, কিন্তু চৈত্র মাসে করবে কী ক'রে? ক্ষেতে যাওয়ার ব্যাপার আছে, বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হবে, ওই ব্রতে আবার জল ছেঁকে খেতে হয়, ধোয়া কাপড় পরে— ক্ষেতে বসে মাটির ঘড়ায় জল, ঠাণ্ডা-গরম— যেমন পাওয়া যায় তেমন খাওয়াদাওয়া করতে হয়— অত ঝঞ্ঝাট বাপু আমার বাড়িতে চলবে না।' অর্থাৎ, তারা'র

মায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি চিমমার যে একেবারেই ভালো লাগে না, এইটাই বুঝিয়ে দিলো।

মনোভাব বুঝতে পেরে চাঙ্গলা বললো, 'যাই বলো চিমমা, তুমি কিন্তু জিতে গেছো। আট দিনের মধ্যে বিয়ে দিয়ে বউকে একেবারে ঘরে নিয়ে এলে। তোমার আর অষ্টমি-চতুর্দশী ক'রে কী হবে?' অষ্টমি-চতুর্দশীর ব্রতকে ছোটো করে দেখাতে চাঙ্গলার অনীহা থাকলেও, চিমমার জন্যে কথাটা বলতে হোলো।

চিমমা ঈষৎ গর্বিতভাবে উত্তর দিলো, 'এতে জেতার কী আছে? মেয়ে তো সব সময় আমার-ই হয়েছিলো— আমার ভাই— পর তো নয়।'

'তা তো ঠিকই— তা তো ঠিকই। তবে দেখো, মেয়েটার যেন কষ্ট না হয়।'

'কী যে বলো বাপু!' এগোতে এগোতে চিমমা জবাব দিলো, 'আমি কি রত্নার মতো কচি খুকি? রত্নার জন্যে আমি আমার ভায়ের মেয়েকে কষ্ট দেবো? ওকে এমনভাবে রেখে দেবো যে দেখে রত্নারও তাক লেগে যাবে। ছেলের বউকে কোনো দুঃখু দেবো না— হাঁ!··· ঈস, দেরি হয়ে গেলো, আজ আসি।'

চিমমা রত্নার মনের কথা জানতো। জানতো, বিয়ের অনেক আগেই রত্না— চিমমার বউদি— এ বিয়েতে মত দেয় নি। একমাত্র মেয়ে, নিজেদের আত্মীয়স্বজনের ঘরে কষ্ট পাবে, রত্না এক সময়ে কথাটা ব্যক্ত করেছিলো। আর চিমমা ধরে নিয়েছিলো মেয়েকে যদি কোনোমতে বের করে আনতে পারে— তাহলে মায়ের সঙ্গে তাকে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে দেবে না। এ ছাড়া চিমমার আর-একটি গোপন অভীপ্সা ছিলো: মন্নর কোনো ছেলে নেই। এই একটিই মেয়ে। জায়গা জমি সব এই মেয়েই পাবে এক সময়। তারকাকে বউ করার জন্যে নিজের ছেলের হাতেই আসবে এসব— নইলে, সব বেহাত হয়ে যেতো। যার জন্যে, ছেলের চেয়ে বউকে একটু বেশি ডাগর দেখালেও, চিমমা তারকাকে ছেলের বউ করেছে।

এক মাস পর রত্না গেল চিমমার কাছে, মেয়েকে কিছুদিন নিজের

কাছে রাখার জন্তে। একথা-সেকথার পর চিমমা জবাব দিলো, 'মেয়ে তোমার কাছেই থাক্, আমার কাছেই থাক্— ব্যাপারটা একই। চারদিন ওখানে, চারদিন এখানে থাকুক-না,' তারপর গলার আওয়াজ বদলে, 'গাঁয়ের মেয়েরা তো ওকে এখানে এসেও ডেকে নিয়ে যেতে পারে— আসেও— এখন আবার তুমি নিজেই এসেছো— যদি অন্য গাঁয়ে বিয়ে দিতে— তাহলে পারতে এমনি ক'রে যখন-তখন নিয়ে যেতে? কিংবা, তোমার ভালো-মন্দ দেখতে মেয়েও আসতে পারতো কী? ব্যাপারটা কি রকম হয়েছে জানো? ঘি-ও ঢাললুম, খিচুড়িতেও পড়লো বালি!'

রত্না চিমমার কথা শুনে হাসলো। ম্লান হাসি। মুখে অন্তর্জ্বালার ছাপ স্পষ্ট হোলো, ভাবলো, মেয়ের যদি কষ্ট হয় এইসব জটিলতায় প'ড়ে। অস্পষ্ট ভয়ে সে কেঁপে উঠলো এই ভেবে, জমি জিরেত সবই মেয়ে পাবে একদিন, ঠিকই— কিন্তু এখনো বুড়ি হয় নি সে— শেষ অবধি জোর জবরদস্তি করে এরা দানপত্র লিখিয়ে নেবে না তো?

'কী যে বলো ভাই— আমি কি বাইরে আমার মেয়ের বর খোঁজা-খুঁজি করেছি? তারা জন্মেছে যেদিন সেদিন থেকেই আমি ভারমার কথা ভেবে রেখেছিলুম, তবে একটু পেছিয়ে গিয়েছিলাম এই ভেবে—' গালে হাত রেখে রত্না জবাব দিলো, 'আমরা গরিব, তোমরা বড়োলোক। আমার সম্বল তো ওই এক টুকরো জমি— ওই জমিটা দিয়ে দিলে বুড়ো বয়েসে আমরা কী করবো— কার দরোজায় গিয়ে দাঁড়াবো— তখন তো একটু জলের জন্যে হা পিত্যেস হয়ে বসে থাকতে হবে—'

রত্নার কথায় চিমমা একটু নরম হোলো, হয়তো লজ্জিত, তবুও মুখে বললো, 'ত্যাৎ! এসব কী চিন্তা করছো? তোমার বুড়ি হতে এখন অনেক দেরি— এত ভাববার কী আছে এখন থেকে? মেয়ে গাঁয়ের মধ্যে আছে, বাঘের মতো জামাই— আর কী চাই? তার ওপর শাশুড়ি আবার পিসি— মায়ের পেটের ভাই—'

'চিন্তা আসে ভাই। মার ভাই নিজের হয় কিন্তু বউদি তো নয়! হাতে পয়সা থাকলে সবাই আপনার, না থাকলে কেউ কারুর নয়—'

কথা এখানে শেষ হলেও জের মিটলো না। সন্ধ্যেবেলায় হুবনা বাড়ি ফিরে তামাক নিয়ে বারান্দায় বসেছে, এমন সময় চিমমা কথাটা পাড়লো।

'মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্যে রত্না এসেছিলো।'

'তাই না কি? সন্ধ্যেবেলায় ক্ষেত থেকে ফেরার সময় আমার সঙ্গে অবিশ্যি মল্লর দেখা হয়েছিলো। চোরের উপদ্রব হচ্ছে— ক্ষেতে রাতের দিকে, দেখাশোনা করার জন্যে একটা লোক রাখার কথা বলছিলো ও—' ছিলিম সাজতে সাজতে হুবনা জবাব দিলো।

'আমিও রত্নাকে এই কথাই বলছিলুম, কিন্তু রত্নার ভালো লাগে নি।'

ছিলিমে তামাক ভরতে ভরতে হুবনা বললো, 'কী রকম? আমাদের কথা তুমি কেমন ক'রে বললে?'

'শোনো আমার কথাটা আগে। রত্নাকে বলছিলুম, গাঁয়ের মধ্যেই মেয়ে, যখন খুশি মেয়েকে ডাকতে পারো। সুখ-দুঃখে অবিশ্যি দু জনে দুজনকে দেখবে। বুড়ো হ'লে এই মেয়েই তোমাকে খাওয়াবে—'

ছিলিমে আগুন দিতে দিতে হুবনা জিজ্ঞেস করলো, 'হঠাৎ এসব কথা উঠলো কেন?'

'কথা হচ্ছিলো, তাই। ওদের তো কোনো ছেলে নেই, সব মেয়েই পাবে।'

হুবনা বাধা দিলো, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কী? ওদের এখনও ভরপুর যৌবন পড়ে আছে— আর বাচ্চাকাচ্চা হবে না, না কী? জমি জিরেৎ আছে— ওদের জমিজমা নিয়ে ওরা যা খুশি করবে— তোমার ওদিকে নজর কেন?' হুবনা স্ত্রীকে ভৎ'সনা করলো।

সেইদিন রত্না ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে ছিলো পথের দিকে, মল্ল কখন ফিরবে, ওকে সব কিছু খুলে বলতে হবে। মেয়েকে ডাকতে গিয়ে রত্না যে ধারণা নিয়ে ফিরেছে— তা কী ক'রে মল্লকে বুঝিয়ে বলবে— চিন্তা করতে লাগলো। মল্লও সেদিন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছিলো ক্ষেত থেকে। ঘরে ঢুকেই মল্ল বেশ রেগে গিয়ে রত্নাকে বললো, 'কদিন ধরে ক্ষেত থেকে চারা চুরি যাচ্ছে। আজ একেবারে হাতেনাতে ধরেছি— ব্যাটা

ভীমপপার কাজ— ব্যাটা বুড়ো হয়ে গেলো এখনও চুরি চামারি করতে লজ্জা করে না?'

হাতমুখ ধোয়ার জল এগিয়ে দিয়ে রত্না একটু অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ বুড়োর কথা বলছো?'

'আরে, আর বোলো না। আমার বোনাই হুবনার খাতিরে ভীমপপাকে ছেড়ে দিলুম। অন্য কেউ হলে তাকে ঠিক পঞ্চায়েতে হাজির করতুম।'

'পঞ্চায়েতে কেন?'

'কেন আনবো না? আমি কারুর কোনো জিনিসে হাত দিই না— কারুর কাছে কিছু চাই না, আর ও কিনা আমার—? আমি কাউকে ভয় করি না। কী করবো, এই গাঁয়েই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। ও-ও দূরের লোক নয়। সম্বন্ধী।' এই সব বলতে বলতে মল্ল দাওয়ার ওপর বসে পড়লো।

'এখন আবার বসছো কেন? অন্ধকার হয়ে গেছে— খেয়ে নাও বরং।' মল্ল কাপড় ছেড়ে খেতে বসবে, এমন সময় তারাকে দেখতে পেলো, 'আরে, তুই কখন এলি? আমি যেতে পারি নি, সন্ধ্যেবেলায় ক্ষেতে কাজ ছিলো।'

তারা কিছু বলার আগে রত্না, সকালে চিমমার সঙ্গে দেখা করা থেকে আরম্ভ করে, যা যা কথাবার্তা হয়েছিলো— সবই আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলো। মল্ল সব শুনে বললো, 'তোমরা এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? এই সব মেয়েলি কথাবার্তা— কাল তো দেখছি তোমরা আমাদের মুখে চুন-কালি লেপে দেবে! একবার যদি মন ভেঙে যায় তো— ব্যাস।'

রত্না এবার রেগে গেলো। ঘাড় ঘুরিয়ে হাতের বটিটা সশব্দে চুবড়ির মধ্যে ফেলে দিয়ে জবাব দিলো, 'বেশ তো— কালই সব ওর নামে লিখে দাও, আমার কি।'

'কেন লিখতে যাবো? ওরা কি আমার জমি-জায়গার জন্যে বসে আছে? ওদের তো অনেক আছে। এত খরচা করে মেয়ের বিয়ে দিলুম— এরপর নিজের জমি জিরেৎ দিয়ে জামাইকে জমিদার করতে

যাবো না কী ?'

রত্না চুপ করে গেলো। মুখে ঈষৎ রাগের ভাব। মল্ল নিজের মনেই বললো, 'মেয়ে সুখে আছে ব'লে জমি লিখে দিতে হবে ? বেশ কথা। এরপর যদি দেখি ওদের চার-পাঁচটা বাচ্চা হয়েছে হয়তো একটাকে এখানে এনে রাখতে পারি— কিন্তু এসব কথা কেন তোমরা মিছিমিছি তুলছো ?'

তবুও ওদের মন কিন্তু প্রবোধ মানলো না। বিশেষ করে রত্না মনে মনে আরও অস্বস্তি বোধ করলো এই ভেবে, হাজার হোক ওরা ভাই-বোন, আমি পরের বাড়ির মেয়ে। আমার কথা ওদের কাছে অপ্রিয় লাগবে। কী দরকার, মাঝখান থেকে খারাপ সেজে। ওরা যা পারে, তাই করুক। আমি যদি শেষ বয়েসে ভুগি, তাতে ওর কী ? রত্না হয়তো সাত-পাঁচ ভাবতো, কিন্তু তারকা 'বাবার সঙ্গে আমিও খেয়ে নিই' বলতে, আর কিছু ভাবা হোলো না।

রত্নার খুব আশা ছিলো ওদের একটা ছেলে হবে। ভাবতো, মল্লও নিশ্চয়ই মনে করছে আজ নয়তো কাল ওদের সাংসারিক নন্দন বনে একটি পুত্রসন্তান কুণালের মতো দেখা দেবে, কিন্তু এই মুহূর্তে মল্লর কথা শুনে মনে হচ্ছে, তা আর হবার নয়। জোয়ার-ভাঁটার মধ্যে আটকে পড়া নৌকোর মতো রত্নার মন আছাড়ি-পাছাড়ি খেতে লাগলো।

তবে, মল্ল মনে মনে তেমন উদ্বিগ্ন হোলো না। এমনিতেই ও শাদাসিধে মানুষ। জীবনের সব ধ্যানজ্ঞান তার চাষ-আবাদ নিয়ে। খুবই নির্মোহ প্রকৃতির লোক মল্ল ধরে নিয়েছিলো, ভগবানের কৃপায় মেয়েকে ভালো ঘরে দিয়েছি। আমার কপালে ভগবান যখন ছেলে দিলেন না, তখন তারা নিশ্চয়ই চট করে বড়ো হয়ে গিয়ে ছেলের মা হয়ে যাবে। নাতিকে আমি ছেলের মতো রেখে মানুষ করবো। ফলে, মেয়ে ক্রমশ যৌবনবতী হচ্ছে দেখে সে মনে মনে খুব প্রসন্নতা অনুভব করতো, মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতো, হে ভগবান, চটপট ওকে ছেলের মা বানিয়ে দাও ! ফলে, তারা যদি বাবার কাছে এসে লজ্জায় রাঙা হয়ে মাথা হেঁট করতো কোনো কারণে, মল্লর মনে হোতো সেই শুভদিন বোধ

হয় এসে গেছে।

রাস্তায় বোন চিমমার সঙ্গে দেখা হলেই হেসে হেসে বলতো, 'তারা মাথায় ঢ্যাঙা হয়ে যাচ্ছে, ছেলেরও এখন একটু তাগড়া হওয়া দরকার, রোজ দু বার করে দুধ খাওয়া— নাহলে ছেলের চেয়ে মেয়ে বেশি তাগড়া হয়ে যাবে।'

এইভাবে পাঁচ-ছ মাস কেটে গেলো। একদিন চিমমা দুবনাকে বললো, 'তারাকে নিয়ে এসো, আর কাঁহাতক আমি একা একা খাটবো। ভেবেছিলুম বউ এলে আমার খাটুনি কমবে— তা চৈত্রমাস শেষ হয়ে এলো, তুমি তো ওকে এখনো নিয়ে এলে না।' দুবনারও মনে হোলো, বউয়ের এখন এখানেই থাকা উচিত। বেলা পড়তে, সে গেলো মল্লদের বাড়ি, এই কথা বলতে, দু-তিন দিনের মধ্যে একটা ভালো দিনক্ষণ দেখে মেয়েকে এবার পাঠিয়ে দাও। কিন্তু, ওখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটলো। তারাকে ঘরের এক কোণে মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখে দুবনা জিজ্ঞেস করলো, 'ঘরে কেউ নেই ?'

তারকা শ্বশুরকে দেখে উঠে এসে, যতটা তাড়াতাড়ি আসন পেতে বসতে বলা উচিত ছিলো, তার কিছুই করলো না, একই অবস্থায় বসে থেকে জবাব দিলো, 'সবাই ক্ষেতে গেছে। কী দরকার···?' কথা বলার সময় ওর মুখ হেঁট হয়ে রইলো লজ্জায়। দুবনা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ধরে ফেললো। তারকা ঋতুমতী হয়েছে।

দুবনা আর-কিছু না ব'লে বাড়ি ফিরে এসে চিমমাকে বললো কথাটা।

'সে কী ? কবে থেকে ? আমি তো কিছুই জানি না। জানলে, ওকে ডেকে পাঠাতাম না।'

দুবনা আরো বললো, 'রত্নারা ক্ষেতে যাবার পরই এটা হয়েছে ব'লে মনে হোলো আমার। ঘরে কেউ ছিলো না। ও একা এক কোণে চুপ-চাপ বসেছিলো, ওর গলার আওয়াজ শুনে...'

'তুমি তো সব সময়েই একটা কিছু ভেবে ফেলো ! এখন ওর মাসিক কী ক'রে হবে ?'

'আরে বাবা হয়েছে।'

চিমমা একটু চুপ করে থেকে নিজের মনে বললো, 'যাক, ভালোই হয়েছে। এখানে এসে যদি 'হোতো'—তাহলে সব ঝক্কি আমার ঘাড়ে পড়তো।'

হুবনা বললো, 'বিয়ের তিন বছরও এখনো পুরো হয়নি…'

চিমমা আরো কিছু বলছিলেন রত্না-তারকার বিরুদ্ধে, হুবনার সেদিকে কান গেলো না, সে শুধু ভাবলো, মেয়ে জাতটার আক্কেল ব'লে কিছু নেই।

সন্ধ্যের দিকে রত্না ফিরে এলো ক্ষেত থেকে। সদ্য রজস্বলা তারকা তখনো বাইরে বসে। রত্না ফিরে এসে মাথার ওপর থেকে খাবারের চুবড়ি নামিয়ে, স্নান সেরে, উনুন জ্বালতে বসে গেলো। এদিকে, খবর পেয়ে পাড়ার মেয়েরাও হাজির ততক্ষণে। তারা, তারকাকে চান করাবার জন্যে চটপট ডেকে নিয়ে গেলো। ভেতরে, হলুদের টুকরো পিষে, একটা শিশি নাড়িয়ে তেল বের করে—তেল হলুদ মিশিয়ে একটা পাত্রে রাখা হোলো। পাড়ার অন্য মেয়ে-বউরাও এক এক করে এসে জড়ো হোলো। পাঁচজন মেয়ে তারাকে তেল-হলুদ মাখিয়ে নাইয়ে নিয়ে, একটা তক্তার ওপর বসে' বসে' গান গাইতে লাগলো। সাধারণত এই দিনে খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম নেই। এইজন্যে চাঙ্গলা বুড়ি ক্ষীর আর চালের পায়েস তৈরি করে ভাইপোর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। আরো পাঁচ-ছ ঘর থেকে থালা-ভর্তি খাবারদাবার পাঠানো হয়েছিলো, এই সব করতে করতে রাত তিনটে বেজে যেতে, 'ও তো ক্ষেতে, কাকে দিয়ে খবরটা পাঠাই? রাত-ও হয়ে গেছে, সকালে 'ও' এলে নাহয় চিমমাদের বাড়িতে মিষ্টি পাঠাবো।'

তারা আস্তে আস্তে জানালো, সকালে হুবনা এসেছিলো।

তাহলে তো জেনেই গেছে ওরা, এই ভেবে রত্না বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো। অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। ভাবতে লাগলো: তারার মাসিক শুরু হয়ে গেলো, এর পর যদি ওকে শ্বশুরবাড়িতে না পাঠাই, লোকে কি বলবে। একমাত্র মেয়ে। বিয়েতে সব টাকাকড়ি খরচ করে হাত এখন ফাঁকা। ওরা কি মেয়ের এই খবরে সুখী হবে? চিমমির গর্ব তো আকাশ-ছোঁয়া। অহংকারে মাটিতে পা ফেলে না। অনেক ভেবেও রত্না যখন

জট খুলতে পারলো না, তখন ভাবলো, এটা ওদের ভাইবোনের ব্যাপার। সব আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে।

ওদিকে চিমমা— কেউ-না-কেউ খবর দিতে আসবে, এই ভেবে অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলো। কেউ এলো না দেখে, সে-ও শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম হোলো না। ভোরবেলাতেই সে মল্লদের বাড়িতে এসে হাজির, 'কাল দুপুরে মেয়ের মাসিক হয়েছে— আমাকে খবর পাঠাতে কী অসুবিধে হয়েছিলো?'

রত্না জবাব দিলো, 'কী করি বল, চৈতের দিন— দুপুরে ক্ষেতের কাজে গেছি, তখন এইসব হয়েছে। তারার শ্বশুর আমাকে খবরটা দিয়েছিলো —ক্ষেতে থাকলে এ সব খবর দিতে নেই—'

চিমমা গম্ভীরভাবে জবাব দিলো, 'হুঁ, সবাই দেখছি নিজের দিকে ঝোল টানতে ব্যস্ত।'

চিমমা যাতে কথা না বাড়ায়, সেই উদ্দেশ্যে রত্না বললো, 'ও-ও কাল থেকে ওখানেই আছে। আসতে পারে নি। পুরুত ঠাকুর ডেকে মিষ্টি পাঠাবো সবাইকে…'

'মিষ্টি পাঠাবে কেন? গাঁয়ের সবাই খবর পায় নি না কী?'

একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে তারাকে ভালো করে দেখে, 'একে এমনি ক'রে বসিয়ে রেখেছো কেন? জন চারেক লোক ডেকে গায়ে হলুদ দিয়ে চান করিয়ে দিতে পারো নি?'

'কাল রাতে চান করিয়ে দিয়েছি। ও-সব কি আর আমি জানি না? মেয়ের এই প্রথম মাসিক— আমাকে কি বলে দিতে হবে কী করতে হবে! আমার তো আর দশ-বারোটা মেয়ে নেই যে— এমনি ফেলে রাখবো একটার বেলায়।' ঈষৎ রাগের সুরে রত্না জবাব দিলো।

'তাই বলো! তা আমার কাছে কথাটা লুকিয়েছিলে কেন?' চিমমা ভৎ'সনা করে কথা বললো।

'এতে লুকোবার কী আছে? গাঁয়ের মধ্যে থেকে কেউ এসব লুকোতে পারে? আজ লুকোলে, কাল ঠিক ফাঁস হয়ে যাবে।'

'তা বেশ। তা বাজনাঅলাদের ডেকেছিলে?'

'ও-সব ও এলে হবে।'

'কেন? আরে বাবা— যা করার তা তো করতেই হবে। আমার বাড়ি হলে দেখতে এতক্ষণ কী ধূমধাম হোতো!' চিমমা মনে মনে যাই ভাবুক, মুখে কিন্তু অন্য কথা বললো।

রত্না, চিমমার মুখের কথা কেড়ে নিলো, 'যেখানেই হোক-না কেন, তাতে কী হয়েছে? তোমাদের ঘরও যা, আমাদের ঘর-ও তাই— তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠান করো না— তাতে তো ভালোই হবে—'

চিমমা রেগে গেলো. 'তোমরা যদি অনুষ্ঠান না করতে পারো ছেড়ে দাও— আমরাই করবো। জামাইকে কী দেবে?'

'আমি আর কী দেবো?' তোমাদের ভাই-বোনের ব্যাপার— ও এলে জিজ্ঞেস কোরো, জামাইকে কী দেবে।'

'তুমি কিছু দিতে পারবে না তো— কোন্ মুখ নেড়ে এত কথা বলছো?' চিমমা এবার বেজায় রেগে গিয়ে উঠে পড়ে, হাঁটা দিলো।

'আহা— এত রাগের কী আছে? আমার ওপর রেগে গিয়ে কী হবে, লোকটাকে আগে আসতে দাও— আমি তো মেয়েমানুষ—'

কথাগুলো বলতে বলতে রত্না দরজা অবধি এলো, কিন্তু চিমমা তখন রাগের চোটে হন হন করে হাঁটছে— একবারের জন্যও সে ফিরে তাকালো না।

6

'বেদী বানাবার সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ চুকে গেলো না কী?' —বলতে বলতে সুন্দরা ঢুকলো। মাথার চুবড়িটা নামাতে যাবে, এমন সময় রত্না চটপট এসে চুবড়িটা ধরলো।

'সুন্দরা! একা কেন? রামাপ্পা কই? ছেলে কোথায়?' রত্না এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নগুলো করে গেলো। একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'জল খাবে? আনবো?'

'না, এখন নয়। তেষ্টা পায় নি। ছেলের আজ পরীক্ষার খবর বেরোবে, তাই আসে নি।'

রত্না কথার মাঝখানেই কথা বললো, 'কাল পুজো হয়ে গেছে— তাই ফল পাঠিয়েছিলুম। তোমার বর বিয়েতেও এলো না, এবারও এলো না—' অভিমানে রত্নার ছলছলে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে, সে শাড়িতে চোখ মুছে নিলো, 'গরিবের বাড়িতে সে আসবে কেন, বোন!'

'না, না— কাল সকালেই ও আসবে। সাইকেলে ছেলেকে বসিয়ে কালই এখানে চলে আসবে। আজ এলে ঘর আর দোকান সামলাতো কে? সুন্দরা আশ্বস্ত করলো।

রত্না তবুও ঠিক আশ্বস্ত হোলো না, 'আজ গাড়ি পেয়েও এলো না, আর কাল সাইকেলে আসবে? ঘর আর দোকান—এ ছাড়া ভাই আমার বর আর কিছু ভাবে না। আমি মরি-বাঁচি— তাতে কিছু যায় আসে না!'

রামাপ্পা সম্পর্কে, রত্নার দাদা। লেখাপড়াও করেছিলো কিছুটা। এনাপুরে ছোট্ট একটা মুদির দোকান চালাতো। বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া কিছু জমি জিরেত-ও ছিলো। চাষবাস আর দোকানের রোজগারে অবস্থা বেশ সচ্ছল। একমাত্র বোন রত্না। বোনঝির বিয়ের সময় রামাপ্পা আসতে পারে নি, ছেলে-বউকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এবার কীভাবে আসা যেতে পারে, সে ভাবছিলো। মল্ল গাড়ি পাঠিয়েছিলো ওদের নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু, গাড়িতে এবার সে পাঠিয়ে দিয়েছিলো সুন্দরাকে। সুন্দরা যখন রত্নাকে বলছিলো কাল সকালেই রামাপ্পা পৌঁছে যাবে— তখন তারকা ভেতর থেকে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'অনন্ত আসে নি?'

সুন্দরা ভালোভাবে এবার তাকালো তারকার দিকে। আড়াই-বছর-আগে-বিয়ের-সময়-দেখা বাচ্চা তারা আর আজকের তারার মধ্যে কোনো মিল নেই। ওর সারা শরীরে যৌবন টলটল করছে। সেদিনের ধূসর শারীরিক রঙে আজ হলুদ লাগানো গোধূলির রং।

সুন্দরা যেন চোখ ফেরাতে পারলো না। বলে উঠলো, 'হ্যাঁ রে- হলুদ দিয়ে যে শরীরটা একেবারে হলদে করে ফেলেছিস! একটু কম করে হলুদ দিস আশপাশে যাতায়াত করার জন্যে।' তারপর একটু থেমে, লঘু পরিহাসের সুরে, 'তোরা কত্তা গিন্নিতে মিলে রত্নাকে যেন লুট ক'রে নিস নি।'

রত্না জবার দিলো, 'লুটপাটের কথা বললে তোমার সঙ্গে আবার ঝগড়া না হয়ে যায়, এই কথা বলতে গিয়ে আমার বদনাম হয়ে গেছে এক জায়গায়।'

'কী রকম?' সুন্দরা কৌতূহলী হোলো।

'তেমন কিছু নয়, বলেছিলুম বিয়েটা তো আমার এখানে হয়েছে, এখন তোমাদের ঘরে ওর 'এই কাজটা' করো— জামাইয়ের সঙ্গেও লেন-দেনের ব্যাপার আছে, ওটা না-হয় আমিই করবো— আমাকে আর বেশি ঝঞ্ঝাটে ফেলো না, ব্যস—'

সুন্দরা এবার হাত ঘুরিয়ে জবাব দিলো, তোমাদের মিঞা বিবির ব্যাপার স্যাপার বোঝা বড়ো শক্ত— মেয়ের মাসিক কবে হয়ে গেছে, এখনো 'বিদায়' দিলে না!'

'বিদায় কী করতে চাই নি? আমি চুপচাপ টাকাকড়ি জমিয়ে গেছি —কিন্তু ও তো নিজের জেদ ছাড়ে না।'

'এতে জেদের কী আছে?' একটু থেমে 'যখনই বিদায় দাও, মেয়ে-জামাইয়ের দেনা-পাওনা এক সময় মিটিয়ে দিলেই হয়। বিয়ের সময় আফকা গাঁয়ের লোককে খাইয়েছিলে—' রত্না কি ভাবতে পারে, বুঝে, তাছাড়া, শেষে তো সবই মেয়ে-জামাই পাবে।'

রত্না দীর্ঘশ্বাস ফেললো, এই কথাটাই বোধ হয় তোমার মুখ থেকে শোনা বাকি ছিলো।'

'আমি খারাপ কথাটা কী বললুম -' তারপর তারাকে দেখে, 'কী রে--তারা?'

রত্না নিজের মনে বলতে লাগলো, 'সবার মুখেই এক কথা— চৈত্র মাস প্রায় শেষ, কিছু দেনা শোধ হয়েছে। হাতে কিছু টাকাপয়সা এলে

রত্না অসংলগ্নভাবে কিছু কথা, শুধু কথা বলার জন্যেই বলে গেলো। কথাবার্তার এতটুকু ইচ্ছে ওর ছিলো না। তবে একটা কথা না বলে পারলো না শেষ অবধি, 'নেওয়ার জন্যে সবাই হাত বাড়িয়ে আছে, একটা শাড়ি দিলে ছটো চায়, কিন্তু আমাকে কে কী দিয়েছে ?'

কথাটা শুনে সুন্দরার মুখ কালচে হয়ে গেলো। জবাব দিলো, 'যার ভাগ্যে যা আছে, সে তাই পায়— তোমার ভাগ্যে কিছু নেই, তাই কিছু পাচ্ছো না।' তারপর প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে, 'সেই সাত সকালে এতে খাবারদাবার বেঁধেছি— এটা খুলে ফেলো এই বলা—'

এটা এখন খুলে কী হবে ? ঘরে তো বেজায় হট্টচট্ট চলছে— এটা বরং যে রান্না করছে তাকে দাও—'

'তাই দাও।' বলে ওখানেই একটা কম্বল বিছিয়ে সুন্দরা 'বাপ রে' ব'লে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

'বাপ রে কেন ?' রত্না এবার সুন্দরাকে ভালো ক'রে লক্ষ করার পর জিজ্ঞেস করলো, 'কতদিম হোলো আটকেছে ?'

সুন্দরা ঈষৎ লজ্জিতভাবে উত্তর দিলো, 'মাঝে মাঝে এই রকম আটকে যায়, কখনো কখনো ছু মাস—'

'এবার কিন্তু আটকেই যাবে। পাঁচ বছর হয়ে গেলো না মেয়েটা মারা গেছে ?' ব'লে রত্না ভেতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এলো, 'ছুপুরে তো তোমার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে, আজ নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নি—' এইটুকু ব'লে ভেতরে বসা একজন আত্মীয়ের মেয়ের উদ্দেশ্যে রত্না অনুরোধ জানালো, 'ওরে— একটু চা করে দিবি ?'

'রাস্তায় এক কাপ চা খেয়েছিপুম হোটেল থেকে —' মনে মনে সুন্দরা অবিশ্যি আর-এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে ছটফট করছিলো, তাই বললো, 'হোটেলের চা একেবারে যাচ্ছেতাই— স্রেফ গরম জল।'

এমন সময় এক কৌটো ভর্তি হলুদ নিয়ে একটা মেয়ে ঢুকে, খাটের ওপর বসা তারকার হাতে হলুদ দিতে দিতে বললো, 'তোর মামীর কাছ থেকেও একটু হলুদ মেখে নে।'

ভেতর থেকে রত্নার গলা শোনা গেলো ; আরে, এত রুটি এনেছো

কেন ? এমনিই চলে এলে পারতে। এক কাঁড়ি রুটি করার কী দরকার ছিলো ? আর, চালও গুঁড়িয়ে এনেছো আলাদা ক'রে ?

'একেবারে পিষিয়ে নিয়ে এসেছি ওখান থেকে— এখানেও তো ওগুলো পিষিয়ে নেওয়া হোতো, আর আমার ওখানে পেষাবার কোনো ঝামেলা নেই –' সুন্দরা চাল পিষিয়ে আনার কারণ ব্যক্ত করলো।

সন্ধেবেলাতে একবার জমজমাট ব্যাপার। লোক খালি যাচ্ছে আর আসছে। কে কখন খেলো বা খেলো না— ঠিক বুঝে ওঠা মুশকিল। নানা ফলে তারকার কোঁচড় ভর্তি হয়ে যেতে লাগলো। গাঁয়ের যে-সব বাড়ি থেকে তারার জন্যে খাবার পাঠায় নি তারাও এক-এক ক'রে খাবার পাঠাতে লাগলো। এমনিতে মল্ল গাঁয়ের সবার কাছে প্রিয়। কারুর বাড়িতে বিয়ে-থা হলে মল্ল নিজের সাধ্যমতো প্রচুর উপহার না পাঠিয়ে থাকতে পারতো না। যার জন্যে, লোকে পাঁচ-ছ দিন ধ'রে এক নাগাড়ে আটা, সবজি অথবা নানা সুখাদ্য উপহার হিসেবে পাঠাতে লাগলো ওর ঘরে। আদ্যঋতুর এই অনুষ্ঠানে, গাঁয়ের সবাই ফল, কাপড়চোপড় ইত্যাদি না দিয়ে থাকতে পারলো না। যার জন্যে, পরের দিন সারা গাঁয়ের লোককে খাওয়ানোটা মল্ল খুবই দরকারি ব'লে মনে করলো। এই সব খরচ-খরচার কথা ভেবেই মল্ল নিজের বাড়িতে অনুষ্ঠানটা করতে চায় নি। সব দায়িত্বটাই কিন্তু মল্লকে নিতে হোলো শেষ অবধি। অতিথি আপ্যায়ন থেকে আত্মীয়াদের শাড়ি বিতরণ, সবই করতে হোলো তাকে।

ধূসর সন্ধ্যা নেমে এলো আস্তে আস্তে। রত্না তখনো গলির মুখে যাচ্ছে আর আসছে, যারা এখনো খেতে আসে নি তাদের ডাকাডাকি করার জন্যে। বাজনাঅলাদের খাবার পাঠানোর ভারও ওর ওপর। এই সময় পাঁচ-ছ জন মেয়ে-বউ ঢুকলো গান গাইতে গাইতে। রত্না তাদেরও খেতে বসালো- আবার বাইরে কাজে ব্যস্ত—বাসপ্পার গান শোনার জন্যে তাকেও ডেকে পাঠালো। এই সবের জন্যে পুরুত তবনাপ্পা নিজের কাজ চটপট সেরে ফেলার তোড়জোড় করে ফেলতে লাগলো। ভোজন পর্ব যাতে তাতাতাড়ি সমাধা হয়, সেইজন্যে চেষ্টার

ত্রুটি রইলো না। কিছু তরুণী মেয়ে তারকাকে সাজিয়ে, গুছিয়ে, বেণী বেঁধে— আলপনা আঁকা তক্তার উপর বসিয়ে দিতে ব্যস্ত হোলো। কেউ কেউ প্রদীপ জ্বালাতে লাগলো, আর তারকা ভাবলো এইবার হাস্য-পরিহাস-রসিকতার শরাঘাত হবে তাকে কেন্দ্র ক'রে। এই বিয়েতে কে কী বললো, গাইলো, কারা শুনলো— তারকার কোনো দিকে মন ছিলো না। সে নিজস্ব চিন্তাতেই বিভোর হয়ে রইলো।

গান শেষ হতে চিমমা জিজ্ঞেস করলো, 'সুন্দরা, কখন এলে ?'

'আজই। খুব দারুণ জমেছে কিন্তু বিয়ে বাড়ি। কী ধূমধাম!'

'এসব কি আর বার বার হয় ? সারা জীবনে এ কাজ এক-আধবার হয় — ছেলেমেয়ের সুখ আমরা চোখে না দেখলে আর কে দেখবে ?'

'সে তো ঠিকই। তা বউয়ের জন্যে কী শাড়ি আনলে ?' স্বাভাবিক-ভাবেই সুন্দরা জানতে চাইলো।

'বউয়ের শাড়ির কথা কী জিজ্ঞেস করছো ? জামাইকে তোমরা কী দিচ্ছ— বলো। কী, চুপ করে গেলে যে ?' একজন বউ গায়ে-পড়া-হয়ে কথাটা বলে উঠলো।

'তা তো জানি না। জামাইয়ের জন্যে কী কেনা হয়েছে আমি ঠিক জানি না, আজই এসেছি আমি।' মৃদু গলায় সুন্দরা জবাব দিলো।

'আরে— এমনি জিজ্ঞেস করলুম।' গায়ে-পড়া-বউটি এবার গাম্ভীর্যের সঙ্গে মুদ্রা প্রদর্শন করে আবার মন্তব্য করলো, 'শাশুড়ি যে শাড়িই দিক তাতে কী যায় আসে— সেই তো যেতে হবে শাশুড়ির ঘরেই— ফালতু শাড়ি এনে কী দরকার ?'

'রেওয়াজমাফিক দেওয়া-নেওয়াটা হয় সমান ওজনে—' চিমমা এবার গলা মেলালো।

সুন্দরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে জবাব দেবার চেষ্টা করলো, 'স্রেফ দেওয়া-নেওয়ার ওজনে সব হয় না কী ? দুটো ঘটি একসঙ্গে রাখলে ঠোকাঠুকি হবেই— সেইজন্যে মিল মিশেল করে চলতে হয়।' তারপর, তারাকে দেখিয়ে 'অমন সোনার পিতিম বউ— এর চেয়ে বেশি সোনা তুমি কোথায় পাবে ?'

'তা তো বুঝলুম— কিন্তু পাঁচ জনের সামনে খাড়া করবে যে জামাইকে তাকে বুঝি কিছু দেবার নেই?' ঝাঁজালো ভাবে কথাটা বলে, রাত হয়েছে শুনিয়ে চিমমা উঠে পড়লো। ওর সঙ্গে সঙ্গে, গান-গাইতে-গাইতে ঢোকা সেই পাঁচ-ছ জনও উঠে পড়লো।

বাইরে বেশ অন্ধকার। লোকজনের হই-হট্টগোল কমে এসেছে। বাইরে মল্ল কাল কে কী কাজ করবে, বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত। গান-গাওয়া মেয়েরা পান-সুপুরি নিয়ে চলে যাবার জন্যে তৈরি— রত্না এক-জনকে, 'কাল একটু তাড়াতাড়ি এলে সব ঠিক হয়ে যাবে' ব'লে নিজের কাজটুকু শেষ করে ফেললো।

সুন্দরা গাইয়ে মেয়েদের উদ্দেশে, 'কাল চারটে নতুন গান গাইবে কিন্তু, পুরোনো চলবে না', ব'লে তারকার দিকে তাকালো, 'তুই-ও শুয়ে পড় এখন, কাল রাতে তোকে তো অনেকক্ষণ ব'সে থাকতে হবে তোর কত্তাকে দেখার জন্যে!'

তারকা তক্তপোষ থেকে নামতে-নামতে বললো, 'অনন্ত নেই ব'লে ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।'

পরের দিন সকালে রামাপ্পা অনন্তকে নিয়ে হাজির হোলো। ভাইকে দেখে রত্নার চিন্তা যেন অনেকখানি লাঘব হয়ে গেলো এই ভেবে যে ভাই এবার সব সামলে নেবে। হাতমুখ ধোয়ার জল এবং কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে -- এক পেয়ালা চা-ও তৈরি করে ফেললো সে। একটু পরে, মাঝের কামরাটার মধ্যে ভাইবোনে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হোলো। রত্না ভেতর থেকে কাপড়ের একটা গাঁটরি এনে, খুলে ফেলে, 'তুমি তো বাজার-হাট যাও, দেখো তো এগুলোর দাম কত হতে পারে', জিজ্ঞেস করলো।

কাপড় হাতে নিয়ে পরখ ক'রে রামাপ্পা জবাব দিলো, 'তা সত্তর-পঁচাত্তরের মধ্যে হবে।'

রামাপ্পা দামটা ঠিকই বলেছিলো। রত্না তাই এবার একটা ওড়না দেখিয়ে বললো, 'এটার দাম পনেরো টাকা।' তারপর চারটে আংটি বের করে দেখালো দাদাকে। রামাপ্পা আংটি চারটে হাতে করে

নিয়ে জানতে চাইলো, 'চারটে কেন?'

'দুটো বানিয়েছিলাম, দেখি একটু বড়ো হয়ে গেছে। ছেলের আঙুল এখনো তত মোটা হয় নি। তাই, আর-একটা গড়ালাম— তিনটে দিতে নেই ব'লে চারটে গড়িয়েছি—' চারটে আংটি গড়াবার কারণ দেখালো রত্না।

'প্রথমে তিনটে দাও', রামাপ্পা বললো, 'যদি দেখো ওতে ব্যাটা খুশি হচ্ছে না, তাহলে চারটে দিয়ো।'

'আমার আর কোনো ভাবনা নেই— তুমি এসে গেছো, এই জিনিস দেবো জামাইকে খুশি করার জন্যে।'

'খুশি? এত জিনিস পেয়েও যদি তোমার জামাই খুশি না হয়— তাহলে বলার কিছু নেই।'

রত্না জবাব দিলো, 'চিমমা বোধ হয় আরও বেশি কিছু পাবে ব'লে আশা করছে।' এরপর, রত্না সুন্দরাকে ডেকে দাদার আহারের ব্যবস্থা আলাদাভাবে করতে অনুরোধ জানালো।

ঈষৎ গর্বিত হয়ে রামাপ্পা জানতে চাইলো, 'আমার জন্যে আলাদা কেন? কাজের বাড়ি, সারা গাঁয়ের লোকের খাওয়া, এর মধ্যে আবার আমারটা আলাদা করছো কেন?'

'আলাদা আর কী করছি? আরো আট-দশ জনের খাওয়া এমনিই আলাদা হবে।'

এই সময় ভুবনা চৌগলে-ও তার ভাই, সম্বন্ধী এবং বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলো। এদের মধ্যে অনন্তও ছিলো। অনন্তর খুব ইচ্ছে ছিলো তারকার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করার, কিন্তু বেচারাকে হতাশ হতে হয়েছে। তারা আর একেবারে আগের মতো নয়। সব সময় গম্ভীর। অনন্তর সঙ্গে যে সে একেবারেই কথা বলে নি, তা নয়। বরং কথাবার্তার মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও মমতা দুই-ই ছিলো, তবুও পুরোনো দিনের মতো মন খুলে গল্প করার কোনো সুযোগ সে পায় নি, ইচ্ছে থাকলেও। মা-বাপের চোখে বড়ো-হওয়া-মেয়ের বেশি কথা বলা নিষিদ্ধ হলেও, পুরোনো জামায় সযত্নে বোতাম বসিয়ে, নতুন জামা

বের করে দিয়ে, মনের মতো খাওয়া খাইয়ে— অনন্তর প্রতি নিজের গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছিলো সে।

দুপুরে সবাই খেতে এলেও ভীমাপপা আসে নি। ব্যাপারটা রত্নার চোখ এড়ালো না। ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়ে সে হুবনাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভীমাপপাকে দেখতে পাচ্ছি না যে!'

'ক্ষেতে আছে', হুবনা জবাব দিলো, 'পরে আসবে।'

'আপনি তাহলে গিয়েই ওকে পাঠিয়ে দেবেন। ভুলবেন না।' রত্না সবদিকে নজর রাখে দেখে হুবনার খুব ভালো লাগলো।

বাড়িতে ভরমাপপা একাই বসে ছিলো। খাওয়ার জন্যে যেতে পারছিলো না, জামাই মানুষ— হাজার হোক। এমন সময় কাশতে কাশতে ভীমপপা ঢুকলো। ভরমা জিজ্ঞেস করলো, 'কী কাকা, তুমি খেতে যাও নি?'

'আমার ক্ষেত থেকে আসতে দেরি হয়ে গেছে— এতক্ষণে বোধ হয় সবার খাওয়াদাওয়া চুকে গেছে। যেতে দাও—' নির্বিকার ভঙ্গিতে অজুহাত দেখালো সে।

ভরমা অত-শত না বুঝে উত্তর দিলো, 'না-না, খাওয়াদাওয়া এখনো শেষ হয় নি— তুমি যাও।'

'যেতে দাও— যখন দেরি হয়ে গেছে আর কি করা যাবে।' একটা কম্বলের উপর ব'সে আত্মীয়তার সুরে ভীমাপ্পা আবার বললো, 'কী কী পাবে তুমি ও-বাড়ি থেকে?'

ভরমা জানতে চাইলো, 'এ নিয়ে কী কোনো কথাবার্তা হয় নি?'

কথাবর্তা না বললে কোত্থেকে হবে? পাঁচ-ছ তোলা সোনা, চার তোলার বালা, এক-আধ তোলার আংটি— এগুলো তো দেওয়া উচিত।' স্রেফ আংটি ছাড়া যে আর কিছু গড়ানো হয় নি, এ খবর অবশ্য ভীমাপ্পার জানা।

'দিয়েছে হয়তো।'

'পাগল! আমি তো শুনেছি শুধু একটা আংটি গড়িয়েছে ওরা, শোন—' একটু গলা চড়িয়ে, শুধ্‌ধু আংটি পেলে বেদীতে উঠিস নি',

তারপর অল্প হেসে, 'এই রকম জামাই, এই রকম ঘর, সাত-আট তোলা সোনা এমন কী বেশি আর ? অন্য গাঁয়ের পাত্র হলে দশ তোলা সোনা দিয়েও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হোতো – হুঁ !' এই জাতীয় নানা কথায় ভরমার কান ভরে দেবার চেষ্টা করলো ভীমাপ্পা।

ভীমাপ্পার চেষ্টা ব্যর্থ হোলো না। ভরমার ধারণা ছিলো ওরা এমনিতে সচ্ছল বাড়ি, কিন্তু এখন ধারণা হোলো শুধু সচ্ছলতা নয়, আভিজাত্যও আছে ওদের বাড়িতে। গ্রামের পাঁচজনের চোখে খুবই সম্মানীয়, অতএব তারার বাবারও উচিত এই সম্মান দক্ষিণা উপযুক্তভাবে দেওয়া। এই সমস্ত চিন্তার প্রতিক্রিয়া ভরমের চোখে-মুখে ফুটে ওঠায়— ধূর্ত ভীমাপ্পার তা নজর এড়ালো না। ভীমাপ্পা বললো, 'দান নেওয়ার সময়, আমি যা যা বললাম তাই করবি, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এই সময় হুবনা ও বাড়ির অন্যান্য লোকজন ফিরে এলো। হুবনা জিজ্ঞেস করলো, 'ভীম, তুই খেতে যাস নি ? তোর বাড়িতে দুবার ওরা লোক পাঠিয়েছে, তুই ছিলি না। রত্না তোর জন্যে বসে আছে এখনো। যা খেয়ে আয়।'

'কী দরকার ছিলো হেঁ হেঁ— ভরমের সঙ্গে গল্প করতে বসে গিয়েছিলুম। যাচ্ছি এখনি।'

'কী দরকার আর এখন গিয়ে ?' চিমমা মাঝখান থেকে বললো, 'ভরমের জন্যে ওরা থালা ভর্তি খাবার পাঠিয়েছে, ও-তো আর অত খেতে পারবে না – তুমি বরং ওখানেই খেয়ে নিও।'

খাওয়াদাওয়া করতে করতে যে লগ্নের ক্ষণ এগিয়ে আসছে, একমাত্র পুরুত ছাড়া, আর কেউ ঠিক সতর্ক ছিলো না। পুরুত মশাই যে-ই বললেন, 'সব চটপট কাজ সেরে ফেলো'— হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। চাকরবাকরদের খাওয়াদাওয়া হতে হতে, বাজনাঅলাদের খাইয়ে, জামাইকে ডাকিয়ে আনবার বন্দোবস্ত হোলো। মল্ল এক চাকরের হাতে ঘোড়ার লাগাম দিয়ে দিলো। পুরুতমশাই আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে জামাইকে আনার জন্যে গেলেন।

মেয়েকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেবার পর, আসরে হাজির করার জন্যে রত্না সুন্দরাকে বললো। গায়কীদের ডাকার জন্যেও লোক ছুটলো। এর মধ্যে দু-একজন নিজেদের বসার জায়গা করতে ব্যস্ত হোলো। ভেতর থেকে জামাইকে তত্ত্ব দেবার জিনিসপত্র বের করে, তক্তপোষের ওপর সাজিয়ে রাখবার জন্যে তাড়া দিলেন আর-একজন পুরুতমশাই। প্রদীপে তেল দেবার কথাও তিনি বললেন। এরই ফাঁকে, কবরীতে ফুল, সজ্জিত তারকা এসে বসলো চৌকির ওপর। গায়কীরাও পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। একটু বেশি বয়সের দুটি মেয়ে এসে তারকার কানে-কানে বলে দিলো কোন্ দিকে মুখ করে, কেমন-ভাবে বসতে হবে। মাথায় জরির পাগড়ি, গায়ে কোট রামাপ্পা একবার সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে বারান্দায় পায়চারি করতে শুরু করলো। কি কি হচ্ছে দেখতে গিয়ে অনন্ত তারকার কাছাকাছি তক্তপোষের এক কোণে গিয়ে বসে পড়লো দেখে, সুন্দরা ডাক দিলো : তুই এদিকে আয়— ওখানে বসছিস কেন ? ওর বর আসবে এখন।

তবুও অনন্ত সরে এলো না দেখে সুন্দরা এবার চটুল রসিকতা করে আবার বললো : কী রে ও তোর বউ না কী— এত কাছ ঘেঁষে বসছিস ?

'বসেছি তো, কী হয়েছে ?' অনন্ত একটু রেগে গেলো।

ভূ'ত কোথাকার! ডাকছি— তবুও আসার গা হচ্ছে না!' ব'লে সুন্দরা চুপ করে গেলো।

এই সময় যথারীতি গীতবাদ্যসহ জামাই-ও এসে পড়লো। ছোটেরা চটপট আসরে, যে যার জায়গা দখল করে বসে পড়লো। বড়োরা বসলেন শ্রেণীবদ্ধ ঔচিত্য চিহ্নিত জায়গায়। ভরম তারকার ডান দিকে বসে তত্ত্বের থালাটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। কাছাকাছি দাঁড়ানো এক মহিলা তারকার শাড়ি ও উপহার হিসেবে পাওয়া জিনিসপত্রগুলো তক্তপোষের ওপর গুছিয়ে রাখলেন। পুরুতমশাই নির্দেশ দিলেন, 'ভেতরে নিয়ে গিয়ে মেয়ের শাড়ি বদলে নিয়ে এসো।'

সুন্দরা শাড়িটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে নিলো একবার। শাড়ির আঁচলটা আর-একবার দেখে নিলো। তারকা আস্তে আস্তে

উঠে গেলো ভেতরে। ভরমা এবার ওর পাওয়া ধুতিটা দেখতে দেখতে পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে মুখ তুলে তাকালো। পণ্ডিতমশাই ভরমার মনের ভাব আঁচ ক'রে বলে উঠলেন, 'আরো জিনিস আছে হে— ঘাবড়ে যেয়ো না।'

বারান্দায় পায়চারি করা থামিয়ে রামাপ্পা এবার ভেতরে ঢুকে পণ্ডিতের হাতে তিনটি আংটি দিলো। পণ্ডিত বললেন ভরমাকে, 'দেখছো আংটিও এসে গেছে— একটা নয়, তিনটে!' পণ্ডিতমশাই আংটি পরাতে গেলেন, কিন্তু ভরমা আঙুল এগিয়ে দিলো না। ভীমাপ্পার দিকে তাকালো সে। পণ্ডিত এবার রগড় করে বললেন :

'তাই তো, এখন কেন? বউ এলে পরাবো— কী বলো?' তার পর গায়কীদের, 'তোমরা চুপ করে বসে কেন? ধরো একটা গান!'

সেই মুহূর্তে গায়কীরা গান গেয়ে উঠলো এক সুরে। গান শেষ-ও হোলো একটু পরে। গানে বিভোর ভরমা টেরও পেলো না তারকা কখন তার পাশে এসে বসে গেছে। দ্বিতীয়বার গান শুরু হবে, লোকে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে, পণ্ডিতমশাই বলে উঠলেন, 'লগ্নের সময় উপস্থিত হচ্ছে— দানসামগ্রী নেওয়ার পরে গান শুরু হোক - ভোর অবধি আপনারা গান শুনুন তারপর, কোনো অসুবিধে হবে না।'

চিমমা রূঢ়ভাবে মন্তব্য করলো, 'দানসামগ্রী তো আছেই - কিন্তু তার আগে জামাইকে কী দেওয়া হচ্ছে শুনি।'

রামাপ্পা জামাইয়ের কাছে এসে, একটু বুঝিয়ে কথা ব'লে চতুর্থ আংটিটা দিলো—তবুও ভরমা শান্ত হোলো না। রত্না এগিয়ে এসে অনুনয়ের সুরে বললো, 'এখানেই তো আর দেওয়া-নেওয়া শেষ হচ্ছে না। তোমরা এখনো ছোটো— বড়ে হলে আরো অনেক কিছু পাবে আমার কাছ থেকে —।' জামাইকে ভবিষ্যতের আশা দেখালো সে।

পাছে ছেলে শাশুড়ির কথায় রাজি হয়ে যায়, এই ভেবে চিমমা জবাব দিলো, তখনকার কথা তখন— এখন কি দিচ্ছ তাই বলো।

মল্ল এগিয়ে এসে জবাব দিলো, 'এখন সবই ওদের।'

এত কথার পরেও জামাইয়ের রাগ গেলো না। জনৈক বৃদ্ধ উঠে

এসে বললেন, 'ব্যাস— আর কথা নয়। এতে রাগারাগির কী আছে? পণ্ডিতমশাই, আপনি কাজ শুরু করে দিন।' পণ্ডিতমশাই ভরমাকে যখন তৈরি হতে বললেন, তখনো সে কোনো সাড়াশব্দ দিলো না। বৃদ্ধ বোঝালেন, 'ভাই— এত গোঁ ধরে বসে থাকতে নেই, অন্য ব্যাপারগুলোও তলিয়ে দেখতে হয়।'

তবুও কিন্তু কোনো লাভ হোলো না। শেষে, হুবনার সম্মতিক্রমে তারকার হাতে দানসামগ্রী সমর্পণ ক'রে পণ্ডিত তাঁর আনুষ্ঠানিক উপচার করলো— উপযুক্ত কোনো দান দেওয়া হয়নি এই ধারণায়। যে ধুতিটা দেওয়া হয়েছে, তাতে বড়ো জোর পুজো হতে পারে!

7

শ্বশুরবাড়িতে আসার পর ছ মাস কেটে গেলো। প্রথম শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় শাশুড়ি যে স্নেহ দেখিয়েছিলো তারাকে, এবারে তার লেশমাত্রও নেই। এই সব দেখে হুবনার খুব মন খারাপ হয়ে গেলো। ভেবেছিলো, দু-চার দিন পরে চিমমা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যতো দিন যেতে লাগলো, হুবনা ততোই নিরাশ হয়ে পড়লো। আর চুপ করে থাকাটা ঠিক হবে না ভেবে, সে একদিন চিমমাকে বললো, 'তারা এখন বেশ ডাগর হয়ে গেছে— বিয়ের সময়েও বেশ ছোটো ছিলো, কিন্তু এখন বেশ বড়ো— ছেলেও জোয়ান হয়ে উঠেছে-- '

চিমমা হুবনাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কর্কশ স্বরে জবাব দিলো :

'বউকে তো মাথায় করে রেখেছো! চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাচ্ছো না ব্যাটার সঙ্গে খাইয়ে-পরিয়ে বউকে এমন বড়ো ক'রে দিয়েছো— যে, ছেলে পাশে দাঁড়ালে তাকে এইটুকু দেখায়।'

'এখন এ-কথা বললে কি হবে? এই বিয়ের কথা প্রথমে কে

বলেছিলো ?' তখন তোমার চোখে পড়ে নি, ছেলের চেয়ে বউকে ডাগর দেখায় ?' হুবনা পুরোনো দিনের দিকে ফিরে যেতে চাইলো।

'আমিই যখন সব করেছি, তাহলে ওরা যাতে সমান-সমান হয়, আমিই দেখবো। তুমি বউয়ের হয়ে ওকালতি করছো কেন ?'

একটু চুপ করে থেকে হুবনা জবাব দিলো, 'তোমরা সবাই শলা পরামর্শ করছো বেচারাকে জব্দ করার জন্যে এরকম করলে ও থাকবে কেমন ক'রে ?'

চিমমা কোনো উত্তর দিলো না। সেদিন মেয়েকে একা পেয়ে বললো, 'তুই আজ বউয়ের সঙ্গে খেতে বসিস নি।'

ছোটো মেয়ে, মা'র কথা শুনে ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ?'

'ওর সঙ্গে খেতে বসলে তোর নজর লাগে। আমার পেট ব্যথা শুরু হয়ে যায়।'

মেয়ের কাছে তখনো বিষয়টা দুর্বোধ্য। কৌতূহলী হয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'কে বলেছে এ কথা ?'

সঙ্গে সঙ্গে চিমমা গলার আওয়াজ এমনভাবে বিকৃত করে ফেললো যে মেয়ে বেশ ঘাবড়ে গেলো। মা-কে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে আককাতায়ি ভরসা পেলো না। হাজার হোক আককা এখনো ছোটো মেয়ে। সন্ধ্যে হতে তখনো অল্প দেরি। মেয়েকে খাওয়াবার পর, বাকি সবাইকে খাইয়ে দিলো চিমমা, শুধু শুকনো গোটাকয়েক রুটি একটা থালার ওপর রেখে দিলো তারার জন্যে— তরিতরকারি সব আলাদা করে সরিয়ে রাখলো। তারা কাজ করে ফিরে আসতে বললো, 'ভেতরে গিয়ে খেয়ে নে।' কথাটা বলে বারান্দায় চলে গেলো।

তারকা রোজকারের মতো 'আককা— আসবি না ?' বলে 'ভেতরে 'গেলো, কিন্তু আককা কোনো জবাব দেবার আগেই চিমমা কর্কশভাবে জবাব দিলো, 'আককার খাওয়া হয়ে গেছে। তুই খেয়ে থালা পরিষ্কার করে রাখিস।' তারকা নিশ্চুপ হয়ে থালায় যা ছিলো তা কোনো ক্রমে দলা পাকিয়ে গলায় ঢুকিয়ে দিলো। শাশুড়ির এই ব্যবহার বড়ো

অদ্ভুত লাগলো তার কাছে। এইভাবে. একা-একা খাওয়া আজ এই প্রথম। ওইদিন থেকে, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ-ও খুব বেশি বেড়ে গেলো ওর জন্যে। রোজ সকালে উঠে জোয়ার পিষতে হোতো, তারপর ঘর-দোর ঝাঁট দেওয়া, তারপর রান্নাবান্না করা। সবার খাওয়ার পরে, অবশিষ্ট যা পড়ে থাকতো তাই খেয়ে শ্বশুরের খাবার নিয়ে যেতে হোতো ক্ষেতে, সেখানে আবার শ্বশুর যে কাজগুলি করতে বলতো, সেই কাজগুলিও করে ফেলতে হোতো। দিনের শেষে, শ্বশুরের বানানো ফসলের আঁটি মাথায় করে বয়ে আনতে হোতো বাড়িতে। ঘরে ঢুকলেই, 'বিবির তাহলে এতক্ষণে ফেরার সময় হোলো' শাশুড়ির মুখে শুনে — বাড়ি শুদ্ধ্ সবার জন্যে জল তুলতে হোতো, জল তোলার পর রান্না, তারপর আবার সব কিছু পরের দিনের জন্যে ধোয়া-মোছা ক'রে রাখতে হোতো।

এর মধ্যে আবার শ্বশুরের ক্ষেত থেকে ফিরে এসে গোয়ালঘর পরিষ্কার করতে হোতো। 'তারপর সন্ধ্যেবেলায় শাশুড়ির দেওয়া কয়েক গ্রাস গিলে এক কোণে শুয়ে থাকতো। এই ছিলো ওর প্রাত্যহিক জীবন।

কোনো রকম বাদ-প্রতিবাদ, উচ্চ-বাচ্য না ক'রে তারা সমস্ত কাজই করতো মুখ বুজে। নিজের দুঃখকষ্ট নিজের মনেই চেপে রাখতো। কাউকে কিছু বলতো না। আর, বলবেই বা কাকে? একবার ভেবেছিলো মা'কে বলবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরার উপদেশ মনে পড়তে, আর বলতে পারে নি। একই গাঁয়ে শ্বশুরবাড়ি. শ্বশুরবাড়ির কথা বাপের বাড়িতে এসে বলা ঠিক নয়। এইভাবে আরো কিছুদিন কেটে গেলো। নিভৃতে কেঁদে দুঃখ হালকা করা ছাড়া আর কোনো উপায় সে খুঁজে পেলো না।

একদিন গোয়ালঘর ঝাঁট দিতে-দিতে সহসা নিজের হাতটা ওর চোখে পড়লো। কিছুক্ষণ ঝাড়ু দিয়ে, ঝাঁটাটা ফেলে দিয়ে, ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে। চোখের জল গড়িয়ে পড়লো পড়ে-থাকা-ঝাঁটার ওপর। এই সময় আনারসের চারা নিয়ে ঢুকলো ভরমা।

বিপন্ন বিস্ময়ে তারা চটপট ঝাড়ুটা কুড়িয়ে নিলো। কপাল-ভরা ঘাম নিয়ে আবার ঝাড়ু দেবার চেষ্টা করলো। ভরমাও একটু আশ্চর্য হয়ে, ঈষৎ সংকোচ বোধ করে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে ?'

ঝাড়ু থামিয়ে মাথাটা একটু তুলে তারা জবাব দিলো, 'কিছু না।'

'চোখে জল কেন ?'

তারকা অস্ফুটভাবে জবাব দিলো, 'ঝাঁটার কাঠি ফুটে গিয়েছিলো হাতে, গোবর দিয়েছি ব'লে জ্বালা করছে।'

সহসা ভরমা কাছে এলো। বললো, 'দেখি :'

তারকা দেখাতে পারলো না।

ভরমা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে ?'

'ক্ষেতে জোয়ার-চারা কাটার সময় . . .'

তারার চোখ এবার কান্নায় টইটম্বুর।

'বাবা ছিলো না তখন ?' ভরমার ধারণা ছিলো বাবা বোধ হয় তারাকে কোনো কষ্ট দেয় না। মা যে তারাকে কষ্ট দেয়, অকথ্য গালি-গালাজ করে— এইটুকুই সে শুধু জানতো। এবং মার কথার ওপর কথা বলার কোন সাধ্য তার ছিলো না।

ঠিক এই সময় বারান্দা থেকে মা'র গলা পাওয়া গেলো : ভরমু ! ওখানে তুই এতোক্ষণ ধ'রে কী করছিস ?

চিমমার গলা পেয়ে দুজনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো। ভরমা জবাব দিলো, 'আনারসের চারা ঠিক করছি।' ব'লে সে বেরিয়ে এলো।

ভুবনা সেদিন বাড়ি ফিরতেই গোলমাল, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেলো। আসলে, গোয়ালঘরে ভরমা আর তারার কথাবার্তা সে আড়ি পেতে শুনে নিয়েছিলো। ছেলে তার বউয়ের সঙ্গে কথা বলছে— এটা চিমমার চোখে মহা অপরাধ। ভরমাকে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে, তারাকে আরো চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করে ছেড়েছিলো। তখনো অবধি তারার পেটে কিছু পড়ে নি, এবং চিমমাও তাকে খাওয়ার কথা বললো না। মা নেই দেখে, আককা ফিসফিস করে বলেছিলো, 'দিদি— তুমি খাবে না ?'

'খিদে নেই।' এক চোখ জল নিয়ে তারা আককার কথার জবাব দিয়ে চুপ হয়ে গেলো, মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরোলো না।

শাশুড়ি-বউয়ের এই ঝগড়া পাড়াপড়শিরা শোনার ফলে, রত্নার কানেও উঠেছিলো। সে স্বামীকে পাঠিয়েছিলো মেয়েকে দিন-চারেকের জন্যে নিয়ে আসতো! কিন্তু, ও তরফ থেকে পাঠানো হয় নি বাড়িতে কাজ আছে ব'লে।

দু-তিন দিন পর, ক্ষেতে যাবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে রত্না মেয়ের কাছ থেকে সবই জেনে নিলো। আশপাশে কেউ নেই, মা-র কাছে নিজের ওপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী সে খুবই সংক্ষেপে ব'লে, কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লো। মেয়ের কান্না দেখে মাও ঠিক থাকতে পারলো না, চোখে জল এলো উপছে। সেদিন সন্ধ্যাটা রত্নার কাছে যেন আর কাটতে চাইলো না। নিজেদের আত্মীয়র বাড়িতে, এত খরচ ক'রে বিয়ে দিয়ে এই হাল হবে, সে কোনোদিন ভাবতে পারে নি। ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো রত্না।

রাতে, রত্না সব কথা মল্লকে খুলে বললো। শুনে, মল্লরও খুব মন খারাপ হয়ে গেলো। একবার ভাবলো বোনকে গিয়ে বলে আসে মেয়েকে যেন কষ্ট না দেয়, তারপর ভাবলো, না, বলে কাজ নেই। বললে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। আবার, এও হতে পারে যে কিছুদিন পর চিমমার মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। তবুও কিন্তু বোনের ওপর তার খুব রাগ হতে লাগলো। এইভাবে, আরো কিছুদিন তারকার শ্বশুরবাড়িতে কষ্ট সহ্য হতে-হতে আর রত্নাদের উতলা হতে-হতে কেটে গেলো।

এক বছর পর, গরমের ছুটিতে, অনন্ত মামার বাড়িতে কিছুদিন কাটাবে ব'লে এলো। তারকা-ও এসেছিলো এই সময়ে। দুজনে কথাবার্তা হোলো। অনন্ত অবিশ্যি বেশি কথা বলে নি। বলার বিশেষ কিছু ছিলো না। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কথা ব'লে তারকা খানিকটা স্বস্তি বোধ করলো। এই সব শুনে অনন্ত 'হায়' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলো না। চার দিন এইভাবে কেটে গেলো, তারা

অনন্তকে মনের মতো করে খাওয়ালো, গল্প করলো— তারপর চলে গেলো শ্বশুরবাড়ি। যাবার সময় খুব কান্নাকাটি করলো, অনন্ত-ও নিজেকে সামলাতে পারলো না— তার চোখ জলে ভরে এলো। তারকার কথা মনে পড়তে, পরে, আরো মন খারাপ হোলো।

এবার নিজের দেশে-গ্রামে ফিরে গিয়েও অনন্ত তারার কথা ভুলতে পারলো না। বার বার মনে পড়তে লাগলো সব কথা। মা'র কাছেই দু-তিনবার শাশুড়ি তারার ওপর যে যে অত্যাচার করে— তার কথা বললো। কিন্তু কোনোমতেই নিজেকে অনন্ত আর সামলে রাখতে পারলো না। পড়ার সময় কানের কাছে তারার বলা কথাগুলো যেন ভেসে বেড়াতো। বার বার তারার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতো। এই রকম ক'রে তিন বছর কাটলো। এর মধ্যে অনন্ত দু-একবার চন্দুর থেকে ঘুরে গেছে, তারাও আসতো। আস্তে আস্তে অনন্ত যেন কেমন বদলে যেতে লাগলো! আগের মতো জেদি স্বভাবটা একেবারেই ছিলো না। তারকা কেমন করে আছে— সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করতো কৌতূহলী হয়ে, ওকে বোঝাতো, আবার মন-মরা হয়ে পড়তো নিজে থেকেই। অনন্ত বেশ বড়ো হয়ে গেছে এখন। কাকে, কখন, কীভাবে, কী কথা বলতে হয় তা ভালোই বুঝতে শিখেছে। তারার সুখ-দুঃখের কথা শুনে মনে মনে তার সামিল হওয়ার গোপন অভীপ্সা ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছিলো তার চেতনা-প্রবাহে। একবার রাগের চোটে বলেই ফেলেছিলো : দেখবো তোমার শাশুড়ি কতো বড়ো দজ্জাল! ব্যাপার দেখে, সবাই ওকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলো। তারার ভালো লাগতো এই ভেবে যে ওর পেছনেও একজন কেউ আছে— যে সত্যিই দরদী। ইদানীং, অনন্ত খেলাধুলো করা ছেড়ে দিয়েছিলো, যখনই চন্দুরে আসতো, হাতে দু-একটা বই নিয়ে আসতো। তারাকে প'ড়ে শোনাতো। কখনও কখনও সীতা-সাবিত্রীর গল্প পড়ে শোনাতো ওকে। সীতা-সাবিত্রীর কষ্টের গল্প শুনে, তারা নিজের কষ্টের কথা ভুলে যেতো এক সময়। এইভাবে গল্প শুনে তারা ভাবতো কী ক'রে ওর স্বামী-রত্নটির মন জয় করা যায়।

কালীপুজোর ছুটিতে অনন্তর খুব ইচ্ছে ছিলো চন্দুরে আসার। রত্না খবরও পাঠিয়েছিলো। কিন্তু সুন্দরা ছেলেকে পাঠায় নি। বলেছিলো, পরে— দিন-চারেক গিয়ে থেকে আসিস। নাভুর জন্মদিন পড়ছে পুজোর সময়।'

নাভিরাজ বা নাভু অনন্তর ছোটো ভাই। এর আগে, ওর দুটো জন্মদিনে অনন্ত বাড়ি ছিলো না। অন্য কোথাও গিয়েছিলো। এবারে আর মা ছাড়লো না। প্রথামাফিক আনুষ্ঠানিক শেষ করে দিন চার-পাঁচ পর অনন্ত এলো চন্দুরে।

এদিকে রত্নারও শরীরটা ভালো ছিলো না। অনন্তর প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আশা ছেড়ে দিয়েছিলো সে। তারাকে বলেই ফেললো রত্না, 'অনন্ত বোধ হয় এবারে আসবে না।'

'অন্তকে বলেছিলে যে আমিও আসবো?' তারকা টের পেয়েছিলো অনন্ত যদি শোনে সে এসেছে বা আসবে— তাহ'লে না এসে থাকতে পারবে না।

তারকার অনুমান মিথ্যে হয় নি। দু-একদিনের মধ্যেই অনন্ত এসে গিয়েছিলো। এসে রত্নাকে অসুস্থ দেখে খুবই বিব্রত বোধ করলো, ভাবলো দু-একদিনের মধ্যে সেরে উঠবে। কিন্তু, অনন্ত আসার পরই রত্নার জ্বর বেড়ে চললো ক্রমশ। চার দিনের মধ্যেও যখন জ্বর কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না— তখন সবাই খুব ভাবনায় পড়লো। পাশের গ্রাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনা হোলো। ডাক্তার দেখে বললেন, 'খুব জ্বর তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

অনন্ত আর তারা দু জনে মিলে রত্নার সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলো। এনাপুরে খবর পাঠানো হোলো। রামাপ্পাও একদিন এসে বোনকে দেখে গেলো। যাবার সময় অনন্তকে বলে গেলো রত্না পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে ওঠা অবধি সে যেন থাকে, 'দু-চার দিনের জন্যে নাহয় ইস্কুল থেকে ছুটি করিয়ে নেওয়া যাবে— নইলে মল্লপ্পা বেচারার বড়ো অসুবিধে হবে— সে চাষবাস দেখবে না বাড়িতে পড়ে থাকবে? তারকার উদ্দেশে বললো, 'ওর শ্বশুর-শাশুড়ি এসে দেখাশোনা করবে ব'লে মনে

হয় না— ওরা তো বাইরের লোকজনের মতো এসে, দেখে চলে যায়, তুই বরং দিন-চারেক এখানে থাক, সময়মত ওষুধ দিবি, কী চায়, না চায় দেখবি—' এই সব বুঝিয়ে রামাপ্পা চলে গেলো।

চতুর্থ দিনে রত্নার জ্বর কমে এলো। অনন্তর সেবা, শুশ্রূষা যত্নে দিন ছয়েকের মধ্যে বিছানায় উঠে বসলো সে। কিন্তু শরীর খুবই দুর্বল। অবিশ্যি জ্বর এলো না আর।

চাষবাস থেকে পশুপালন— মল্ল সব কাজ করেও, সকাল-সন্ধ্যে কিছু সময় রত্নার সঙ্গে কাটিয়ে যেতো। অনন্ত আর তারা সারাক্ষণ রত্নার বিছানার পাশে থাকতো। লেবুর রস নিঙড়ে বের করে তৈরি করে দিতো অনন্ত, তারকা চা করতো। পাড়াপড়শিরা এসে রুটি বেলে পাকিয়ে, রান্নাবান্নার কাজ করে দিতো। মা সেরে ওঠার পরও দু-একদিন তারা রান্না করে অনন্তকে খাইয়েছে। মা'র বিছানার পাশে বসেই ওরা নানা ধরণের কথাবার্তা চালাতো। তারা একদিন ওর মাকে বলে ফেললো, 'অনন্ত ছিলো ব'লে তোমার সেবা করতে সুবিধে হয়েছে— নইলে আমার মতো গেঁয়ো যে কী করতো! জল গরম করা, পট্টি দেওয়া ছাড়া আমি আর কিছু জানতুম না!'

রত্নাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। বললো, 'সবই ভগবানের খেলা, নইলে ও প্রত্যেকবার পুজোর সময় আসে, এবারে এলো পুজোর পরে— যাতে আমাকে দেখতে পারে— ভগবান ঠিক ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'আমি আর কী করেছি? সবই করেছে তারা। আমি তো শুধু ডাক্তারকে খবর দিয়েছি— একদিন তো তারা সারা রাত জেগে কাটিয়েছে —আমি হলে বাপু পুরো রাত ওভাবে জেগে কাটাতে পারতুম না!' মনে-মনে ঈষৎ গর্বিত, অনন্ত সহাস্যে জবাব দিলো।

তারকাও ছাড়ার পাত্রী নয়, বললো, তুমিও তো অনেকক্ষণ জেগেছিলে সেদিন।'

রত্না আশ্চর্য হয়ে ওদের দিকে তাকালো। অসুখের সময় কী অবস্থা হয়েছিল ওর— তা বোধ হয় এদের মুখ থেকে সব শুনে বুঝতে পারলো। দু-তিন দিন যে বেহুঁশ হয়ে কেটেছে, তা ওর ধারণা ছিলো না। এই

সময় এলো ভরমা— ওকে দেখে তারা সলজ্জ ভঙ্গিতে, মাথা হেঁট করে এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ভরমা আসতে ও যে খুশি— এই ভাব প্রকাশের চেষ্টা করলো। অনন্তর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ নেই ব'লে, সে একটু দূরে সরে বসলো। রত্না বললো, 'আরে— সরে বসার কী দরকার, তুই এখানেই বস।'

অনন্ত ভরমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'কী ব্যাপার— পাঁচ-ছ দিনের মধ্যে এদিকে আসো নি একবারও ?'

তারাও ভরমার মুখের দিকে তাকালো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

'চার দিন ধরে ক্ষেতে পড়ে থাকতে হয়েছিলো।' ভরমা জোড়াতালি দিয়ে উত্তর দিলো।

ভরমার কথা শুনে রত্নার এক দীর্ঘশ্বাস পড়লো। বললো, 'ও বেচারার দোষ কী— মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসতে হয়েছে তো।' জামাইকে প্রশংসা করতে গিয়ে রত্না কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ অপ্রকাশিত রাখতে পারলো না।

ভরমা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। তারপর দ্বিধাজড়িত গলায় প্রশ্ন করলো, 'এখন শরীর কেমন ?'— আরও একটু পরে, 'এখন যাই', ব'লে উঠে পড়লো। রত্নার ইঙ্গিতে তারা মাঝের কামরায় গিয়েছিলো ভরমাকে খাওয়াবার জন্যে, কিন্তু ভরমা আর সেদিকে ফিরেও তাকালো না।

রত্না অনন্তকে বললো, 'ছেলেটা একবারে শাদাসিধে, গোবেচারা। মুখ খুলে কথাও বলতে পারে না। তোর মতো কোথাও যাতায়াত-ও করে না। সারাদিন কাজ নিয়ে পড়ে থাকে।'

তারকা হেসে ফেললো, 'কেন, মা'র সঙ্গে তো বেশ গল্প করে।' তারার হাসিতে একই সঙ্গে লজ্জা আর বেদনার রেশ, ব্যঙ্গ আর অনুকম্পার ছাপ ফুটে উঠলো। সে বোধ হয় হেসে বোঝাতে চাইলো, এই প্রাণীটি এখনো জানে না "পত্নী" শব্দের অর্থ কী।

এই তিক্ততা অনন্ত-ও টের পেলো। সে তারাকে পুরো ব্যাপারটা অন্যভাবে গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েও ব্যর্থ হোলো।

আরও চার-পাঁচদিন পর অনন্ত যাবার জন্যে তৈরি হোলো। রত্নাকে বললো, 'এবারের মতো আসি।'

'আবার আসিস।' রত্না সস্নেহে জবাব দিলো।

তারার মুখটা চট করে দেখে নিয়ে অনন্ত আবার বললো, 'দিদি— আমি যাই। তুমি আরো দিন পনেরো-কুড়ি থেকে, পিসি সেরে গেলে— তারপর যেও —' তারপর পিসিকে, 'ওরা যদি ডাকতে পাঠায় তাহলে যেন মেয়েকে পাঠিও না।'

'এখন আর কী ক'রে পাঠাবো? এখনও উনুনের কাছে যেতে পারি না। এক মাস তো থাকুক এখানে —।'

অনন্ত বেরিয়ে পড়লো। তারা ওকে বাইরের দরজা অবধি এগিয়ে দিতে, অনন্ত বললো, 'তারা— তুমি এখন যাও। পিসেমশয় এলে বোলো— উনি অবশ্য জানেন আমি আজ যাবো। আর দেরি করলে রোদ বেড়ে যাবে।'

অনন্ত চলে গেলো।

শব্দহীন তারকার দু'চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়লো।

৪

তারকা ষোলো পার হয়ে সতেরোয় পড়লো। প্রথম রজঃশীলা হবার পর আরো চার বছর দেখতে দেখতে কেটে গেলো। সুখী শৈশবে প্রতিপালিত হওয়ার জন্যে বারো বছরেই ওর ঋতু শুরু হয়ে যায়। শ্বশুর-বাড়িতে প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করলেও ওর অঙ্গে অঙ্গে সচকিত যৌবন কিন্তু মুখের ওপর উদাসী ছায়ার প্রলেপ। জীবনের হাসি-আনন্দ বেচারার ভাগ্যে ছিলো না। নিরানন্দ জীবনটাই যে তার নিজস্ব, এই ধারণা গ্রহণ করে ফেলেছিলো সে। নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সব কিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করতো। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে কাজ ছাড়া

অন্য কোনো সম্পর্ক ছিলো না। ফলে, তারকা সর্বদাই চুপচাপ থাকতো।

অন্যদিকে, ছেলেকে মেয়ের থেকে মাথায় ছোটো দেখাচ্ছে ব'লে চিমমা দিনরাত ভরমাকে নানা সুখাদ্য খাওয়াতে লাগলো। এবং, ভরমাও খেয়ে-দেয়ে, দিন-দিন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলো। গাঁয়ের ছেলের যৌবন! সে একা-একাই জোয়ারের বস্তা গাড়ি থেকে নামাতো, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে রেখে দিতো সেগুলো— অর্থাৎ পুরোপুরি যুবক হয়ে গিয়েছিলো ভরমা। শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনও দাম্পত্য সুখের জন্যে উতলা হয়ে থাকতো। তারকার দিকে তাকিয়ে থাকতো উন্মনা চোখ নিয়ে। নিভৃতে, ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টাও করতো।

ভরমার বাবা অবশ্য ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলো। বউকে সরাসরি বলতো, 'ভরমা এবার ছেলের বাপ হয়ে গেছে!' চিমমা সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃত করে জবাব দিতো, 'এমন সব কথা বলো! যা তোমার কোনোদিন হবে না -- তাই নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা!' বউয়ের কাছে মুখ ঝামটা খেয়ে হুবনা চুপ করে যেতো। বাড়িতে নবজাতক আসুক— চিমমা যে একেবারেই চাইতো না তা নয়, তবে, আর একটা কথা ভেবে ফেলতো সঙ্গে সঙ্গে: তারকা গর্ভবতী হলে রত্নার গুমর বেড়ে যাবে, তারকার সুনাম বাড়বে, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, মল্লর ভিটে কিংবা জমি একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে, চিমমা কিছু পাবে না। যার জন্যে, তারকা-ভরমার দেহজ মিলন যাতে একেবারেই না হয় সেই দিকে কড়া চোখ রাখতো চিমমা।

একমাস হোলো ভরমা রাতে ঘুমোয় ক্ষেতে এসে। গাই-গোরুও বাঁধা থাকতো ওখানে। অবশ্য সকালে তারাকেও এখানে আসতে হোতো।

কাছেই ছিলো এক বিরাট পেয়ারা গাছ। চন্দুরের সব চেয়ে বড়ো গাছ। পেয়ারাও হোতো বেশ বড়ো বড়ো। সপ্তাহে একবার ফল পাড়িয়ে বিক্রি করে দিতো চিমমা। বাড়ির ঠাকুর চাকর সবাই মনের সুখে পেয়ারা খেতে পেলেও, চিমমা তারাকে কোনোদিন একটা ফলও

খেতে দেয় নি। শুধু তাই নয়, পেয়ারাগুলো কত সুস্বাদু তার প্রশংসা তারার সামনে খেতে-খেতেই করা হোতো। চিমমা ভেবেছিলো, তারকা যদি একবার পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে— তাহলে ভালো করে মুখ শোনাবার চমৎকার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু তারা চিমমাকে সেই সুযোগ একেবারেই দেয় নি। পেয়ারা খেতে ইচ্ছে হলে রত্নাকে বলতো, আর রত্না—তারকা যখন নদীতে চান করতে যেতো— দোকান থেকে পেয়ারা কিনে এনে ওর হাতে দিতো। এইভাবে তারা নিজের আকাঙ্ক্ষা মেটাতো।

পেয়ারা খাওয়ার এই ব্যাপার মা-মেয়ে ছাড়া আর কারুর জানা ছিলো না। ভরমা মনে মনে মা'র ওপর গজরাতো, ওর বউকে মা আজ অবধি একটা পেয়ারা খেতে দিলো না। অথচ, মা'কে সরাসরি কথাটা বলার মতো ওর সাহস নেই। সে ঠিক করলো, তারা যখন ক্ষেতে একা-একা আসে, তখন সে ওকে পেয়ারা খাওয়াবে। কিন্তু, আককাতায়ী যদি সঙ্গে থাকে, তাহলে আর দেওয়া যাবে না, দিলে আককা মা'কে বলে দিতে পারে।

এই সপ্তাহেও পেয়ারা পাড়ানো হয়েছিলো। গত সপ্তাহের চেয়ে এবার বেশিই পাড়ানো হয়েছে, কিন্তু কেনার লোক পাওয়া যায় নি। ঘরের মধ্যে পেয়ারা স্তূপাকৃতি হয়ে পড়ে। শেষে, জোয়ার নিয়ে পেয়ারা বিক্রি করার ভার পড়লো আককার ওপর। আককার কাছে এটা নতুন কাজ নয়, আগেও সে এইভাবে কয়েকবার পেয়ারা বিক্রি করেছে। কাজেই ভরমা মনে মনে একটা মতলব আঁটলো। কালই আককা পেয়ারা বেচতে যাবে। মা নিশ্চয়ই ওর বউকে পাঠাবে না এই কাজে, অতএব তারা কাল সকালে এখানে একা-একাই আসবে। কিন্তু ভরমা কী ব'লে কথা শুরু করবে? কথা বলবে কেমন করে? পরের দিন খুব ভোরবেলায় ভরমা ঘুম থেকে উঠলো। তিনটি চমৎকার পেয়ারা বেছে আলাদা করে রেখে ভাবলো, কী ক'রে ওকে পেয়ারাগুলো দেওয়া যায়? যদি, দিতে গেলে না নেয়? খুব ভাবনায় পড়লো সে। নিজের হাতে বউকে পেয়ারা দেবার সাহস ওর একেবারেই ছিলো না।

অতএব, সে আর একটা মতলব আঁটলো। তারার কাঠ-কুড়োনো চুবড়ির মধ্যে পেয়ারা রেখে দেবে সে—কাঠ কুড়িয়ে রাখার সময় তারার ঠিক চোখে পড়বে। ভরমা, যেভাবে ভেবেছিলো, সেইভাবেই পেয়ারা রেখে দিলো অবশেষে। তারা যখনই ওগুলো খাবে, তখনই সে কথা বলবে ব'লে ঠিক করে নিলো মনে-মনে।

আবার আর একটা কথাও মনে হোলো : কাছাকাছি থাকলে তারা যদি পেয়ারা না খায় ? ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে ভরমা সমাধান করলো, তারা এলেই সে জল আনতে চলে যাবে। তারার আসবারও সময় হয়ে এসেছে— না, এই ফাঁকেই নদীতে গিয়ে জল আনা যেতে পারে। নদীর দিকে যেতে যেতে ভাবতে লাগলো, ফিরে এসে সে নিশ্চয়ই দেখবে তারা পেয়ারা খেতে শুরু করেছে—প্রথমটা আমাকে দেখে ঘাবড়ে যাবে, আমি অভয় দিয়ে বলবো সে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তোমার জন্যেই ওগুলো রেখে দিয়েছিলাম— শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবে ও—কিন্তু কী বলতে পারে আমাকে ?' এইসব ভাবতে ভাবতে জল নিয়ে ফেরে ভরমা। কিন্তু এসেই খুব নিরাশ হোলো। তারা আসে নি—তারার বদলে মা এসেছে! বেজায় ঘাবড়ে গেলো ভরমা। চিমমা চুবড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখা পেয়ারা দেখে ফেলেছে ততক্ষণে। ছেলের বুদ্ধি গজিয়েছে দেখা যাচ্ছে! চিমমার চোখ রাগে জবাফুলের মতো লাল হয়ে গেলো বটে! নদী থেকে ফিরে আসুক, কান ধরে উচিত শিক্ষা দেবো ব্যাটাকে। এই ভেবে চিমমাও অপেক্ষা করছিলো ভরমার জন্যে। ভরমা কাছে আসতে আর তর সইলো না, চিমমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো দূর থেকেই, 'কে পেয়ারা রেখেছে এখানে ?'

ভরমা অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই জবাব দিলো 'জানি না তো !' জবাব দেওয়ার সময় ওর গলা কেঁপে গিয়েছিলো।

'তা জানবি কেন ? আজ ওই ছুঁড়ির মাথা না মুড়িয়েছি তো···' বলেই চিমমার মুখে যা এলো তাই বলে চললো এক নাগাড়ে। ভরমা একটা কথারও জবাব দিলো না। শুধু মনে মনে ভাবলো : আশ্চর্য ! নিজের বউকে যদি কিছু দিই নিজের হাতে তাতে মা'র এতো চেঁচামেচি

করার কী আছে ? আমার বিয়ে দিতেই বা মা গেলো কেন ?—নির্বিকার ঔদাসীনতায় সে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, মা'র অশ্রাব্য গালিগালাজ অনেকক্ষণ ধরে শোনার পর, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না —পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো খাটালের দিকে। খাটালের দরজার কাছে দাঁড়িয়েও মা'র অকথ্য প্রলাপ তার কানে এলো। ভরমা কী করবে এবার, ঠিক করতে পারলো না। একটা গোরুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, আনমনা হয়ে তার পিঠে হাত বোলাতে লাগলো। গোরুর গলার নিচে হাত রাখলো, আদর পেয়ে গোরু ভরমার কাঁধের ওপর মাথা রাখলো। গোরুর মুখে হাত রাখলো। অনির্বচনীয় এক ভাবাবেগে ভরমার বোধ হয় চুমু খেতেও ইচ্ছে হোলো গোরুটাকে। আশ্চর্য এক ভাবনায় ভরমা যেন ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগলো, ভাববার চেষ্টা করলো মা'র ওপর কেন এতো রাগ হচ্ছে আজ। সহজ একটা ইচ্ছেকে মা বাধা দিচ্ছে কেন ? ভরমা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না মা'র এই ক্রোধের কারণটা কি। অনুক্ত এক যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে— কখন যে সে গোরুটার পাশ থেকে অনেক দূরে চলে গেলো — সে নিজেই টের পেলো না। সারা শরীর-মনে শুধু যন্ত্রণাবোধ ছাড়া আর কোনো অনুভূতি তার রইলো না।

খাটালের এক কোণে রাখা তাজা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হ'ল ওর। শুয়েও পড়লো এক সময়। গোরুটা সহসা ডেকে উঠলো। গোরুটার ডাক শুনে খোঁটায়-বাঁধা-বাছুর প্রাণপণে চেষ্টা করলো দড়ি ছেঁড়ার। চিমমা সেই সময় ভেতরে ঢুকে অত্যন্ত কর্কশভাবে বলে উঠলো, কী রে—ভূতে পেয়েছে নাকি— এই রকম বসে আছিস ? ওগুলোকে ডাল-পাতা খাওয়াতে হবে না ?—একটু পরে দুধ নিয়ে চিমমা বললো, 'দুধ খাবি তো খেয়ে নে —আমি বাড়ি যাচ্ছি। ছুঁড়িটা আর কী করেছে দেখতে হবে—দু-দণ্ড চোখের আড়াল হবার উপায় নেই—অমনি শয়তানি শুরু হয়ে যাবে। তোর আর কি—আমি মরলে তোর কি করে চলবে ভগবান জানে।' চিমমা আরো অনেক কিছু বকবক করে গেলো। ভরমা চুপচাপ দুধ খেয়ে নিলো—কিন্তু দুধের স্বাদ সেদিন আর তার ভালো লাগলো না।

চিমমা চলে যাবার পর, ভরমা উদ্বিগ্ন হয়ে রইলো। পেয়ারাগাছের ওপর একটা শুক উড়ছে। হাল্‌কা হাওয়ায় ঝিম ধরা ভাব। অপরূপ এই নৈসর্গিক পরিবেশে ভরমার মন কেমন করে উঠলো—বিশেষ একটি অভাববোধে। মাথায় চারার বোঝা নিয়ে সে এগিয়ে আসতে তার পায়ে কাঁটা ফুটলো। রেগে গিয়ে হেঁসোর এক কোপে সে কাঁটা গাছটা কাটতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। কেনো ক্রমে মাথার বোঝাটা খাটালের মধ্যে ফেলে দিয়ে সে বাড়ির পথ ধরলো। সূর্য ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে, রোদের তেজ ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

বাড়ির কাছে এসে ভরমা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। চিমমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো :

এতো বড়ো ধাড়ি মেয়ে—এখনো তোর আক্কেল হোলো না? খাবার সময় তো কিছু বলতে হয় না! গপ গপ করে সব খেয়ে নিস। আর কতো বার বলতে হবে তোকে? নিজের ঘর-সংসারের দিকে এতটুকু নজর নেই বেহায়া কোথাকার।

হুবনার জবাব শোনা গেলো! কী হচ্ছে এসব? এবার চুপ করো বাপু!

'এই করেই তো তুমি বউয়ের মাথাটা খেয়েছো! আমার বউ, আমার বউ, আমার বউ করে তো বউকে মাথায় তুলেছো— বাড়ির রীতিনীতি সব চুলোর দোরে গেছে।'

'বউকে লোকে মাথায় করেই রাখে!'

'এইভাবে কাজ চলবে? এখন পণ্ডিত এলে কী বলবো আমি? একটা রুটি আলাদা করে রাখতে কী ওর নড়া ছিঁড়ে গিয়েছিলো?'

ভরমা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। বাবা বোধ হয় খেতে এসেছে, ভগবানের নামে তুলে রাখা রুটি না রেখেই তারা বোধ হয় খেতে দিয়েছে– যার জন্যে মা এতো চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। ভরমা ভেতরে ঢুকতে চিমমা দ্বিগুণ জোরে বাক্যবাণ চালালো, 'এই যে আর একজন! জীবনে বিবি সাহেবার মুখ দেখেছে কী না সন্দেহ— কিন্তু বিবির পায়ে মাথা রাখতে কসুর করে না! বুঝবে, বুঝবে— সব বুঝবে ওই বউ যখন ওর বুকের ওপর হামান দিস্তে মারবে!'

'কী হয়েছে?' ভরমা জানতে চাইলো।

'কি হয় নি তাই বল! সব চুলোর দোরে গেছে। ভগবানের নামে একটা রুটি তুলে রাখতে তোর বউয়ের মনে থাকে না।'

'একদিন যদি বাদ গেছে তো কী হয়েছে? আটা দাও।'

ব্যাস— আর যায় কোথায়। চিমমা এই কথাটুকুর জন্যেই বোধ হয় অপেক্ষা করছিলো, সে সঙ্গে সঙ্গে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। সকালবেলার পেয়ারা-কাণ্ড দেখার পর থেকেই চিমমা একটা সুযোগ খুঁজছিলো, এইবার সুযোগটা পাওয়া গেলো, 'বাঃ। তুই তো খুব লায়েক হয়ে উঠেছিস— দেখছি— এতো বড়ো আস্পদ্দা। আমার মুখের ওপর চোপরা!'— এই ভেবে চিমমা চড়া পর্দায় গলা তুলে ঝগড়া শুরু করে দিলো। ঝগড়া এমন পর্যায়ে উঠলো যে বাড়িতে আর কারুর খাওয়া-দাওয়া হোলো না সেদিন। তারকা না খেয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ক্ষেতে চলে গেলো, ভরমা যেদিক থেকে এসেছিলো সেইদিকেই ফিরে গেলো। চিমমা গজরাতে লাগলো।

দিনটা এইভাবে কেটে গেলো। সন্ধ্যেবেলায় আককাতায়ি কোনো-ক্রমে সবাইকে আলাদা-আলাদা করে খাইয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

তারার জন্যে ভরমার পেয়ারা সংগ্রহ, ঘরে ঝগড়া, উপোস— পাড়া-পড়শির মুখে মুখে রত্নার কানে দু-তিন দিন পরে পেঁছিলো। খবরটা শুনে রত্নার রাগ হোলো প্রথমটা, তারপর সে খুশি হোলো এই ভেবে জামাইয়ের মনে তারাকে কিছু খাওয়াবার ইচ্ছে তো এতোদিনে হয়েছে। সুলক্ষণ — রত্না ভাবলো, জামাইয়ের চিত্তজয়ের এবার চেষ্টা করা দরকার। জামাই যদি এই ব্যাপারে একা হয়ে পড়ে তাহলে তার পক্ষে বুঝে ওঠা মুশকিল। হে ভগবান, ভরমাপ্পাকে একটু সাহায্য করো— হে ধর্মরাজ —তোমাকে পাঁচ টাকা দামের ঘণ্টা কিনে পুজো দেবো। পরের দিন, জামাইয়ের জন্যে ঘরে লাড্ডু, গুঁজিয়া ইত্যাদি তৈরি করে রত্না গেলো ক্ষেতের পথে, ভরমাকে আসতে দেখে ডাকলো: ভ র মা।

ভরমা ডাকটা যেন শুনেও শুনতে পেলো না, আপনমনে সে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলো। বড়ো অনভ্যস্ত মনে হোলো নিজেকে, কিছুটা

বিব্রত। শাশুড়ি কোনো দিন এইভাবে ডাকেনি। মনে মনে অস্বস্তি বোধের সঙ্গে সংকোচও এলো। এমনিতেই লাজুক— আরও লজ্জা অনুভব করলো সে। রত্না ও বিব্রত হয়ে একটু থেমে দাঁড়ালো, তারপর আবার ডাক দিলো। এইবার, ভরমা ফিরে তাকাতে বাধ্য হোলো। রত্না কাছে গিয়ে সস্নেহে অনুরোধ জানালো, 'একবার আমার বাড়িতে যাবে?'

'কেন? পরে যাবো—'

'পরে নয়, এখনই চলো-না একটু!' রত্না খুবই আগ্রহের সঙ্গে বললো।

ভরমা লাজুক ব'লে রত্নার সুবিধে হয়েছিলো। সে সসংকোচে রত্নাকে অনুসরণ করে এগোতে লাগলো। গলির মুখে এক বুড়ির সঙ্গে দেখা: 'আরে ভরমা! অনেক দিন পর শাশুড়ির ঘরে এলে।'

রত্না সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, 'ক্ষেতে যাচ্ছিলো, আমি ভাবলুম গোটা কয়েক গুঁজিয়া খাওয়াই— তাই ডেকে আনলুম।' ভেতরে এনে, আসনে বসিয়ে একটি থালায় কিছু গুঁজিয়া আর কিছু লাড্ডু সে ভরমাকে খেতে দিলো।

ভরমা বললো, 'এতো কেন? এখনই খেয়ে এসেছি— এখন খিদে নেই।'

'এ আর এমন কি বেশি দিয়েছি?' রত্না একটু থেমে আবার বললো, 'ঘরে এগুলো বানিয়েছি, তোমাকে না দিয়ে খেতে ইচ্ছে হ'ল না। তোমার কথা প্রায়ই ভাবি—কিন্তু কি করবো—তোমার মা বড়ো আড়বুঝো—যার জন্যে তোমাদের খুশিমতো ডাকতে পারি না। আজ আর নিজেকে আটকাতে পারলুম না, তাই ডেকে নিয়ে এলুম তোমাকে।' রত্না ভরমার মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করলো।

ভরমা চুপচাপ খেয়ে গেলো। মনে হোলো অন্য কোনো চিন্তায় সে বিভোর। রত্না আবার বললো, 'আমার মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি—তুমি ছাড়া আর ওর কে আছে? যদি কোনো ভুলচুক করে— তাহলে তুমি ওকে শুধরে দিও।'

'শোধরাবো কী ? কাকে শোধরাবো ?' ভরমা কি বলবে ঠিক করতে পারলো না, তারপর বললো, 'ওই বুড়িটার জ্বালায় আর পারি না। সব সময় কিটির-কিটির করে—বুড়িকে বোঝায় কার সাধ্যি !'

'তবুও মা। তোমাকেই তো সব দেখতে হবে—মা'কেও সামলাতে হবে তোমাকে। আর তুমি-তারা যদি ঠিক থাকো, মা যতোই কিটির-কিটির করুক, দেখবে কিছু হবে না।' ভেতর থেকে আরো গোটা চারেক লাড্ডু এনে ভরমার পাতে দিলো রত্না।

ভরমা এবার একটু মন খুলে কথা বলতে লাগলো। বললো, 'সবই বুঝি, কিন্তু কী করি ? মা এমন করে রেখেছে সব যে মনে হয় যেন কাঁচির মধ্যে আটকে আছি···কথাটা তো আপনি শোনেন নি। বাজে, ফালতু ব্যাপার—চারটে পেয়ারা নিয়ে মা তুলকালাম বাধিয়ে বসলো। সন্ধ্যে অবধি আমাদের উপোস করতে হোলো···

'তাতে কী হয়েছে ? ও-রকম একটু-আধটু হয়। কপালে যদি দুঃখু থাকে, তা পোয়াতেই হবে। তবে তুমি এখন বড়ো হয়ে গেছো, যদি একটু বুঝে-সুঝে চলো তো সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তো আর তুমি আগের মতো ছোটো নও। মা'র কথা নিশ্চয়ই শুনবে—তবে এটাও তো বোঝা উচিত তোমরা স্বামী-স্ত্রী—তোমাদের যে সুতোয় বাঁধা হয়েছে তা কখনো ছিঁড়বে না।' রত্না আস্তে-আস্তে এই সব কথা খুবই স্নেহভরে বোঝাতে লাগলো। যদিও সে জানে সব দোষ জামাইয়ের, তবুও এই দোষ কতটা তা জামাইকে বোঝাতে হবে খুবই ধীরে ধীরে—তা না হলে কাজ হবে না। তা ছাড়া, ভরমার ভয়ের কারণটাও বেশ স্পষ্ট। রত্না বললো, 'আমার মেয়ে দোষ করলে তুমি যেমন তাকে ঠেলে দিতে পারো, আবার টেনেও ধরতে পারো। সে ঠিক—মরার আগে পর্যন্ত তোমাকে আঁকড়ে ধরে রাখবে। তুমি ছাড়া তার আছে কে ? তোমায় ছেড়ে সে যাবে কোথায় ?'

শাশুড়ির কথা শুনে ভরমার যেন চোখ খুলে গেলো। রত্না যে তাকে কতো ভালোবাসে, আজই সে প্রথম বুঝতে পারলো। ভীমাপ্পার কথা শুনে সে রত্নাকে ভুল বুঝেছিলো ভেবে মনে মনে লজ্জিত হোলো।

সে শুনেছে বন্ধুবান্ধবরা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কত আনন্দের মধ্যে দিন কাটায়। বন্ধুদের কথা শুনে তারও ইচ্ছে হোতো শ্বশুরবাড়িতে এসে মজা করে দিন কাটাবার। কিন্তু মা'র জন্যে তা আর হোতো না। মা'র মুখের ওপর কিছু বলারও সাহস নেই ওর, ফলে মনের দুঃখ মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হোতো তাকে। রত্না চোখ মুছলো আঁচল দিয়ে, 'আমারই বা আর কে আছে? এক মেয়ে, তুমিও আমার ছেলের মতো।' সেদিন, ক্ষেতে কাজ করতে করতে ভরমা নিশ্চয়ই এসব ভেবেছিলো।

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় চিমমার কানে কথাটা পৌঁছলো। প্রথমে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো সে, বিশ্বাস হয় নি। তারপরই ভাববার চেষ্টা করলো. এই প্রথমবার গেলো, না কী আগেও গেছে? নিশ্চয়ই গেছে, নইলে যে ছেলে মুখে রা অবধি কাড়তো না, সে এখন মুখে মুখে চোপরা করবে কী ক'রে? নিশ্চয়ই রত্না, কানে ফুসমন্তর দিচ্ছে। মনে-মনে একটা মতলব ঠাওরালো সে। স্রেফ ঝগড়া করে কাজ হবে না।

সন্ধ্যেবেলায় চিমমা ছেলের জন্যে সুজি বানিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভরমা ফিরতেই তাকে হাত মুখ ধোয়ার গরম জল ইত্যাদি দিয়ে খুব খাতির করে খেতে বসালো। সামনাসামনি ব'সে মিষ্টি করে বলতে লাগলো, 'গাঁয়ের লোকগুলো' বড়ো হিংসুটে। আমরা যে একটু সুখে-দুঃখে মিলে মিশে আছি, এটা ওদের একেবারে সহ্য হয় না।'

ভরমার খিদে ছিলো না। ধীরে ধীরে খাচ্ছিলো। চিমমা বলেই চললো, 'তুই আমার একটিমাত্র ছেলে—এ বাড়ির আমরা সবাই তোকে ভরসা করে আছি। দেখিস, তোকে আবার উলটো পালটা খাইয়ে কেউ না মাথা খারাপ করে দেয়— কারুর বাড়িতে খাস নি যেন।'

ভরমার এবার বুঝতে অসুবিধে হোলো না মা কী বলতে চায়। মনে-মনে একটু ভয় পেলো সে। মাকে কোনো জবাব দিতে ওর সাহস হোলো না। চিমমা লক্ষ্য করলো ছেলেকে, 'কী রে, কথাবার্তা বলছিস না কেন? থুম হয়ে গেছিস যে— আমার কথা বুঝতে পারছিস?' শেষের দিকে রাগ বেশ স্পষ্ট।

'বুঝতে পারছি।' ভরমা ধীরে ধীরে হলেও একটু দৃঢ়ভাবে জবাব দিলো।

চিমমা সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃতি করলো, 'বুঝতে পারিস তো— আজ কেন গিয়েছিলি? খেতে? ও ঠিক তুক করে তোর মাথাটা খাবে— ওর দরজায় গিয়ে শেষে তোকে কুত্তার মতো ল্যাজ নাড়াতে হবে। জানিস না— ওই মা-বেটি দু জনেই পাক্কা ডান্। তোকে ঠিক বাণ মারবে।'

কথাটা ভরমার ভালো লাগে না। ওর চোখের সামনে রত্নার স্নেহময়ী মূর্তি ভাসছে। ভরমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো, 'কি যা-তা বকছো! তুমি তো ভালো কিছুই দেখো না— ন্যাবা হলে লোকে সব কিছুই হলদে দেখে— তোমার হয়েছে তাই—' কথাগুলো বলেই ভরমা অনুতপ্ত হোলো, কথাগুলো না বললেই ভালো হোতো, মা তো ঝগড়া শুরু করে দিতে পারে। গতকালের ঝগড়াঝাটিতে মনটা এমনিতেই খারাপ হয়েছিলো। ভরমা ঠিক করলো এবার আর সে কোনোমতেই ঝগড়া হতে দেবে না, অতএব সে জিভ কাটলো।

'হায়। আমার কি সর্বনাশ হোলো! তুই আমার এক ছেলে আমার কপালেই এই ছিলো রে! ভগবান— জন্মে অবধি যে মুখ তুলে তাকায় নি, সে আজ সামনে চোপরা করছে। ভগবান জানে, ওকে কি খাইয়েছে, ওর পেটে কি ঢুকেছে—' তারপরই, কান্না-কান্না চোখে, গলার স্বর বদলে, 'দুপুরে গিয়েছিলি— না?'

কোনো বিষয়ের দোষ-গুণ বিচারের ক্ষমতা ভরমার কোনোদিনই ছিলো না। ছেলেবেলা থেকেই অন্যের ওপর নির্ভরশীল, শাদাসিধে, গোবেচারা। ফলে মা'র কথাগুলো সে উড়িয়ে দিতে পারলো না। রত্নাকে যে দৃষ্টিতে সে দেখছিলো, সেই দৃষ্টিতে এখন সে মা'কে দেখতে পেলো। স্নেহশীল, আতুর জননী। সাধারণভাবে মা'র প্রভাবে সে শৈশব থেকে প্রভাবিত— এই মুহূর্তে মা'র নাটকীয় বিলাপ, করুণ স্বর তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ভাবলো, যে শাশুড়ি তাকে কোনোদিন ডাকে নি— সেই শাশুড়ি আজ তাকে খাইয়ে-দাইয়ে এত তোয়াজ

করছে কেন? বারণ করলেও দুবার লাড্ডু দেয় কেন? মা তাহলে ঠিকই বলছে। রত্নার প্রত্যেকটি আচরণ ভরমার কাছে খুবই সন্দেহজনক মনে হোলো এই মুহূর্তে। তারকার ভরা যৌবনের যে শরীরী আকর্ষণ সে স্বাভাবিক ভাবে অনুভব করছিলো কিছুদিন ধরে, মা'র কথা শুনে তা নিমিষে অন্তর্হিত হোলো এই ভেবে, শাশুড়ি নিশ্চয়ই তুক করে কিছু খাইয়ে দিয়েছে। যার জন্যে, তারকার আসঙ্গলিপ্সা সে প্রাণপণে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

9

চারমাসের মধ্যেই হুবনা শয্যাশায়ী হোলো। চারদিন ভালো থাকে তো তিন দিন জ্বর হয়, ঈষৎ কাশি, মাঝে মাঝে টানা জ্বর, হাত পায়ে অসম্ভব ব্যথা, খেতে ইচ্ছে করে না— এই রকম হতে-হতে তাকে একদিন শুয়ে পড়তে হোলো। দু একজন হাতুড়ে বদ্যিও দেখতে এলো। আধ পয়সার ওষুধ দিয়ে কেউ কেউ ব'লে গেলো সেরে উঠলে বাকি পয়সা নিয়ে যাবো। কিন্তু বাকি পাওনা আদায় করতে শেষ অবধি আর কেউ এলো না। হুবনার প্রবল ইচ্ছে হোতো একবার ক্ষেতে গিয়ে কাজ করে আসতে, আবার কখনো ভাবতো, এবং অনেকের সামনে বলেও ফেলতো, 'ভগবান আমাকে সবই দিয়েছেন— মরার আগে যদি নাতি নাতনির মুখ দেখে যেতুম— তাহলে কোনো দুঃখ থাকতো না।'

কথাটা রত্নার কানে ওঠা ইস্তক সে মল্লকে বার বার বলেছে, 'হুবনাকে যখন দেখতে যাবে, যেন কথাটা তুলো— মেয়ের মাসিক হয়েছে আজ চার পাঁচ বছর— পিদিমের সলতের মতো সে জ্বলে যাচ্ছে কিন্তু ভরমার সঙ্গে এখনো তাকে এক বিছানায় শুতে দেওয়া হয়নি। ...তুমি কী ভাবছো জানি না, কিন্তু ব্যাপারটা কী ভেবে দেখেছো? তোমার বোনের মতলবটাই বা কী? হুবনাকে কথাটা

জানিয়ে দাও।' মেয়ের জন্যে মল্লও চিন্তিত, কিন্তু এই রকম কথা মুখ দিয়ে বের করবে কি ক'রে— সে ভেবে পেলো না।

একদিন হুবনার সঙ্গে সে দেখা করতে গিয়ে দেখলো, চিমনা পাশে নেই। মল্ল, একথা-সেকথার পর, বললো, 'দিন দিন খুবই দুর্বল হয়ে পড়ছো ভায়া— চোখের সামনে নাতি-নাতনিকে খেলতে দেখলে তুমি কবে ঠিক হয়ে যেতে।'

হুবনাও একমত হোলো, 'ছেলের বিয়ে দিয়েছি পাঁচ-ছ বছর হয়ে গেলো। ছেলের বন্ধুদেরও দু-একটা বাচ্চা হয়ে গেলো— আমার কপালটাই খারাপ।'

'কপাল? কী যে বলছো! বাচ্চা পয়দা করার জন্যে কপাল নয়— জুড়ি মেলানো দরকার…'

কথাটির অর্থ বুঝতে পেরে হুবনার বিষণ্ন মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। অতি করুণ, অতি বিষণ্ণ সেই হাসি। মল্লর বুঝতে বাকি রইলো না হুবনা সব জানে, কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে কিছু বলতে পারছে না। এখন তো শয্যাশায়ী, ফলে আর কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে, তারকা অন্তঃসত্ত্বা এই খবর পেয়ে হুবনা যদি মারাও যায়— সুখেই মারা যাবে। এতটুকু দুঃখ থাকবে না।

হুবনা হয়তো আরো কিছু বলতো, কিন্তু দরজার আড়ালে আড়ি-পেতে-কথা-শুনতে-অভ্যস্ত চিমনা চট করে বেরিয়ে এলো। বললো, 'আমার যে কি ক'রে দিন কাটছে— তা যদি এ জানতো— এর মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা নানা মতলব খেলছে- রাতদিন আমার চোখে ঘুম নেই ভেবে-ভেবে—'

স্ত্রীর বিলাপে হুবনা চুপ হয়ে গেলো। মল্লও একটু অপ্রস্তুত হোলো। সে জবাব দিলো, 'এ নিয়ে আমারও চিন্তা। তুই দেখিস ঘরে যেন বিপদ আপদ না হয়— ঘরে যদি দু-চারটে কাচ্চাবাচ্চা থাকতো—'

'বাচ্চা কি রাস্তা থেকে ধরে আনতে হবে? এ তো এখন বিছানায়—'

আরো কিছুক্ষণ অসংলগ্ন কথাবার্তা চললো।

দুপুরে ভরমা খেতে এলে চিমমা বললো, 'আজ তোর শ্বশুর এসেছিলো— মেয়ের ব্যাপারে।'

ভরমা আশ্চর্য হোলো। 'মেয়ের ব্যাপারে? কেন?'

'জিজ্ঞেস করছিলো মেয়ের এখনো বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি কেন?

কৌতূহলী হোলো ভরমা। 'কে বলছিলো?'

'কে আবার বলবে?' তারপর একটু থেমে, 'কত বড়ো ধূর্ত ওরা। যেদিন থেকে তোর বাবা বিছানা নিয়েছে, সেদিন থেকেই ওরা ধরে নিয়েছে এই বাড়িটা ওদের হাতে যাবে। খুশির চোটে তোর শাশুড়ি—' হাত দিয়ে দেখিয়ে, 'ইয়া মোটা হয়ে গেছে!'

ভরমার দুর্বোধ্য মনে হোলো, 'বাবা বিছানা নিয়েছে তো ওরা খুশি হবে কেন?'

'তুই নেহাৎ-ই বাচ্চা। কিচ্ছু বুঝিস না। বুড়োকে তো ওরা পায় হাত করেই ফেলেছিলো। এখানে, ভুড়ুক-ভুড়ুস তামাক টানার ছলে তোর বাপের কান ভরে দিচ্ছিলো।'

'কেন?' ভরমা বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞেস করলো।

'কেন? এখনো বুঝতে পারলি না? তুই কি একেবারেই বাচ্চা না কি?' —একটু থেমে, 'তুই ওদের কোনো কথায় কান দিস নি— এইটুকু তোকে ব'লে দিলুম।' চিমমা 'ওদের কথা' রহস্যময় করে ভরমাকে জানাতে, ভরমা রেগে গিয়ে বলে উঠলো।

'খুলে কথা না বললে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বিছানায়—' এইটুকু চিমমা বলেছে, তারকা এলো। চিমমা ঝট করে কথা ঘুরিয়ে বললো, 'এখনো আমাকে নিয়ে যত টানাটানি। বড়ো হয়ে গেছিস, বউ পেয়ে গেছিস— বুড়িকে আর গেরাহ্যি কেন করবি, বল?'

ভরমা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলো। তারকা যে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে নি, তা নয়। পরে, রত্নার সঙ্গে দেখা হতে ঈষৎ রেগে, জিজ্ঞেস করলো, 'মা, বাবা বার-বার শ্বশুরকে দেখতে যাচ্ছে কেন?'

রত্না চুপ করে ছিলো। তারকা বললো, 'বাবা তো আর দু-চার কথা বলে ওঠে না, আমার সম্বন্ধে ঠিক কিছু-না-কিছু বলে তবে ওঠে। আমার কপাল আর ফিরবে না— জোর করে যেদিন বিয়ের আসরে ওকে তোলা হয়েছিলো, সেদিনই জানি আমার কপাল পুড়েছে। এখন তোমরা ব'লে ক'য়ে কী আমার বিধিলিপি খণ্ডাতে পারবে?'

রত্নার খুব মন খারাপ হয়ে গেলো কথাটা শুনে। ভেবেছিলো, ভুবনার সঙ্গে মল্লর কথাবার্তা হ'লে হয়তো ভালো কিছু একটা হবে। কিন্তু মেয়ের মুখ থেকে যা বেরিয়ে এলো আজ— তাতে খুবই মুষড়ে পড়তে হোলো ওকে। এলোমেলো চিন্তার জট ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হোলো, মেয়ের জন্যে যাই করি— ফল উলটো হয়। সবই কী গ্রহের ফের? জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করে দেখলে কেমন হয়? তারকাকে কিছু বলার মতো না পেয়ে রত্না চুপ করেই রইলো।

এই জাতীয় চিন্তা রত্নার যে এই প্রথম তা নয়। এর আগেও সে কিছু কিছু গণকঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেছে, পয়সা খরচ করেছে, কারুর কথা মিলে গেলে তাকে যথোচিত দক্ষিণা দিয়ে তাবিজ-মাদুলি করিয়ে মেয়ের গলায় বেঁধে দিয়েছে। চিমমার চোখে পড়লে সে আবার এইসব তাবিজ-মাদুলি খুলিয়ে ভেঙে ফেলতো। দু-তিনবার এই রকম ভাঙাভাঙি হয়েছে ব'লে তারকা গলায় তাবিজ বাঁধা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিলো। কেননা, তারকার বুঝতে অসুবিধে হয় নি এইসব তাবিজে শাশুড়ির মন পাওয়া তো যাবেই না, উপরন্তু চোখের বালি হতে হবে আরও তাড়াতাড়ি। কিন্তু রত্না কখনো এ-সবে নিরাশ হয় নি বরং পাশের গাঁয়ের দৈবজ্ঞমশায়ের কাছে গিয়ে পরামর্শ চেয়েছে। দৈবজ্ঞমশাই পূর্বজন্মের কর্মফল স্মরণ করিয়ে উপদেশ দিয়েছেন, তোমার মেয়ের পেছনে 'অশুভ শক্তি' কাজ করছে— অমাবস্যার দিন কালো শাড়ি পরে তুমি ইললেবা দেবীর পুজো দাও, দেখবে মেয়ে সুখে থাকবে—'

রত্না এই জাতীয় দেবীর পুজোর যোগাড় করছে দেখে মল্ল

বললো, হুবনা অসুস্থ। চিমমা না ভেবে বসে আমরা মনের আনন্দে পুজো করছি।'

মেয়ের ভালো করা ছাড়া রত্নার মনে অন্য কোনো চিন্তা ছিলো না। যেহেতু দৈবজ্ঞ মশায়ের আদেশ পুজো করার, রত্না পুজো করবেই। সে জবাব দিলো, 'তাতে কী হয়েছে? হুবনার অসুখ তো অনেক দিন ধরেই চলছে— পাঁচ-ছমাস তো নিশ্চয়ই হবে— তাতে কি ও-বাড়ির লোক খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে? তাছাড়া, আজ দিন পনেরো-কুড়ি হুবনা লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরাও করতে পারছে। কাজেই পুজো করলে ক্ষতি কী?'

রত্নার জবাবে মল্ল চুপ করে গেলো। দেবীর পুজো ব'লে তারকাকেও দিন চারেকের জন্যে বাড়িতে নিয়ে এলো। তারকা আবার এনাপুরে খবর পাঠালো মামী আর অনন্তকে— কিন্তু ওরা কেউ তখন এলো না, বলে পাঠালো চার-ছদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না, তবে অমাবস্যার ভোরে এসে পৌঁছবে।

একদিন দুপুরে, নদী থেকে জল আনতে যাবার সময় চিমমার সঙ্গে চাঙ্গলাবুড়ির দেখা। একথা-সেকথার পর চাঙ্গলা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি হঠাৎ জল নিতে এলে?'

'মহারাণী বাপের বাড়ি গেছে! কাজেই আমি ছাড়া আর কে জল আনবে? ওর আর কী, বিয়ের পর এসে মজাসে বসে গেছে পালং-এ। আর ঘর সামলাতে সামলাতে আমার মাথার চুল উঠে গেলো— শরীরে আর পারি না।' কথাগুলো চিমমা বললো এই উদ্দেশ্যে যেন চাঙ্গলাবুড়ি রত্নাকে দু-কথা শোনাতে পারে।

চাঙ্গলা ও-কথার জবাব না দিয়ে বলে উঠলো, 'রত্নার যে কী হয়েছে! আমাদের শাস্ত্রে যে দেবদেবীর পুজোর কথা লেখা নেই— ইললেবা, করেধ্যা— এইসব মিথ্যে দেব-দেবীর পুজো ক'রে কি মেয়ের সংসারে শান্তি আসবে?'

চিমমা সব বুঝেও না বোঝার ভান করলো। 'কোন্ দেবী? কোন্ মেয়ের সংসার?'

'কোন্ মেয়ের আবার ! তোমার বউয়ের। যতো সব মাথামুণ্ডু। মেয়ের সংসারে শান্তি আনতে গেলে তোমাদের বাড়ির যে দেবী তার পুজো করা দরকার। তা নয়, কার কাছ থেকে কি শুনে এসে। কি রকম দেবী কে জানি— শুনেছি রাতে ভূতের মতো খায়। দিনের বেলায় পুজো হয় না—'

এই সব ব'লে চাঙ্গলাবুড়ি গজগজ করতে করতে চলে গেলো। চিমমা একবার ভাবলো বাড়িতে এসে হুবনাকে সব বলে, তারপর ভাবলো, বলে কোনা লাভ হবে না। কাজেই সে চুপচাপ রইলো এ ব্যাপারে।

অমাবস্যার দিন সকালে উঠেই রত্না রান্নাবান্নার কাজে লেগে পড়লো। জল আগের দিন তুলে রাখা হয়েছিলো। রত্না চটপট বাজার থেকে মশলাপাতি এবং পুজোর উপকরণ কিনে নিয়ে এলো। পড়শিদের ভেতর থেকে জনাতিনেক মহিলা এলেন রত্নাকে সাহায্য করার জন্যে— চান করে নতুন কাপড় পরে এসব কাজে হাত দিতে হয়। মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে কাজ করার ফাঁকে-ফাঁকে আসছে— কাজেই রত্না তারাকে পুজোর আসল কাজে হাত দিতে দিলো না। ঘরের ছোটো-খাটো কাজগুলো সে করে গেলো। তারা কিন্তু বার-বার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে, দরজার কাছে একটু আওয়াজ শুনলেই ছুটে বেরিয়ে আসছে। বেলা যত বাড়তে লাগলো ততোই অধৈর্য হয়ে উঠলো সে। অবশেষে একটা গোরুর গাড়ি দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালো। তারা এক দৌড়ে চলে এলো গাড়ির কাছে। মালপত্র নামাবার জন্যে মল্লও এলো। গাড়ি থেকে একা সুন্দরা নামছে দেখে তারকা হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'অন্ত আসে নি ?'

গাড়ি থেকে নামতে নামতে সুন্দর জবাব দিলো, 'ওর পরীক্ষা সামনে— তাই আসতে পারে নি।'

তারার মুখ ছোটো হয়ে গেলো। এতোক্ষণ ধ'রে সে অনন্তর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেলো এবার।

ওই দিন বিকেলের দিকে মল্ল হুবনার কাছে গিয়ে বললো, 'আজ

সন্ধ্যেবেলায় পুজো। কোনো রকমে এসে একটু প্রসাদ নিয়ে যাও যদি—'

'তোমার সঙ্গে আবার কী নেওয়া-দেওয়া? তুমি কি আমার পর না কী? অন্যদের আসতে বলেছো? 'তোমাকে ছিলিম দিতে দিতে হুবনা প্রশ্ন করলো।

'খাওয়াদাওয়া অল্পই। ডাল ভাত আর কি— তোমাকে এসেই আমি নিয়ে যাবো, আবার সঙ্গে করে ফেরত দিয়ে যাবো। এমন কিছু দূরও নয়—'

'বেশ। যাবো—' হুবনা এইটুকু বলেছে, চিমমা এসে পড়লো, 'কোথায় যাবে শুনি? কেন যাবে?' চিমমা বেশ রেগে-রেগে কথা বললো, সবাই আমাকে ডাকাডাকি করেছে তাদের বাড়ির কাজে আমি কোথাও যাই নি। একজন তো তার কাজে যাবার জন্যে আমাকে ভীষণ পীড়াপিড়ি করেছে— তবুও আমি যাই নি। আমার ঘরে খাবার অবধি পাঠিয়ে দিয়েছে, তবুও আমি খাই নি—' চিমমা বোঝাবার চেষ্টা করলো পাড়ার লোক ওকে ভালোবাসে।

মল্ল জবাব দিলো, 'পাড়ার সবাই তোমাকে ভালোবাসে ডাকাডাকি তো করবেই। আমিও তোমার খাবার পাঠিয়ে দিতুম, কিন্তু ভগবানের প্রসাদ বাড়ির বাইরে আনা ঠিক নয়— তাই তোমাকে, মানে তোমাদের আমার ওখানে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে চাই।' অতঃপর সবাইকে নেমন্তন্ন করে, হুবনাকে আবার অনুরোধ জানিয়ে মল্ল ফিরে গেলো।

মল্ল যাবার পরই চিমমা হুবনাকে এক চোট নিলো।

'কেউ একবার বললেই হোলো, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে যাও খ্যাঁটনের জন্যে। কোনো ভালো বাড়িতে খেতে পাও নি কোনো দিন? হা ঘরে বাড়িতে খেয়ে এসে যদি অসুখে পড়ো— কে তোমাকে দেখবে এখানে ভাবো না একবারও? চার মাস ধরে তোমার সেবা করতে করতে আমার কোমরে বাত ধরে গেছে।'

হুবনার চোখ অভিমানে ছলছল করে উঠলো, বললো, 'আজ চার দিন ধ'রে হাঁটতে পারছি না। কাশিটা যদি আর না বাড়ে— তাহলে গিয়ে খেয়ে আসবো। আমি তো আর কাল যেতে পারবো না— তুমি

পারো, তোমার ভাই, আজ— নয়তো কাল গিয়ে খেয়ে আসতে পারো।'

'ভাই না ছাই! ওটা এখন ইবলিশের বাড়ি! আমি মরলে তবে ওর মেয়ে শান্তি পাবে। আমি কবে মরবো, সেই দিনের জন্যে ওরা অপেক্ষা করছে—' চিমমা ওর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিলো হাত-পা নেড়ে, অঙ্গ-ভঙ্গি করে, 'ওদের সবাইকে মরতে হবে!'

সূর্যাস্ত হতে হতে রান্নার কাজ শেষ হোলো। মল্ল দেবী কারেব্যাকে কালো শাড়ি পরিয়ে দিলো। ভোগের ভাত সামনে রেখে— একটা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর 'হোলিগে' পরোটা সাজিয়ে রাখলো, তারপর, ধুপ জ্বালিয়ে নারকেল ভাঙার পর, রত্না প্রণাম জানিয়ে দেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানালো : মা— আমার সব দোষ মাপ করে দাও। আমার মেয়েকে উদ্ধার করো। তারকার সঙ্গে রত্না সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার পর— মল্লও সাষ্টাঙ্গ হোলো। মনে মনে মানত করলো, 'সামনের বছরে যদি তারার ছেলে হয়, তাহলে তোমাকে আবার পুজো দেবো, শাড়ি দেবো।' এইভাবে অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে দু এক ঘণ্টা কেটে গেলো।

মল্ল, তারপর, পাড়াপড়শিকে ডাকতে গেলো খেতে আসার জন্যে। পুরুষদের খাওয়া হয়ে যাবার পর মল্ল হুবনাকে ডেকে নিয়ে এলো। খেতে বসলো দু জনে একসঙ্গে। অসুস্থ হুবনার বিস্বাদ মুখে খাওয়াটা বেশ স্বাদু মনে হওয়ায় সে একটু বেশিই খেলো। বললো, 'মরতে যখন হবেই— তখন খেয়ে মরাই ভালো! কদ্দিন পর আজ একটু গুড় খেলুম।'

রত্না আগ্রহী হয়ে বললো, 'আপনি খান— কিছু খারাপ হবে না। ভগবানের প্রসাদ— সব তাঁর ওপর ছেড়ে দিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।' ফলে, হুবনা একটু বেশিই খেলো।

রত্না সেদিন চিমমাকে ডাকতে গিয়ে, হাত ধরে বহু অনুনয় বিনয় করেছিলো, কিন্তু চিমমা আসে নি। জবাব দিয়েছিলো, 'বাড়ির সবাইকে খেতে হবে— এমন কী কথা আছে? বিয়ে বাড়ি তো নয়!

শ্বশুর গেছে, বউ গেছে— ব্যাস, আবার কী !' ভরমাকে সেদিন একটু আগে খাইয়ে চিমমা ক্ষেতে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। ফলে, ভরমাও নির্বিকার ছিলো খাওয়া সম্বন্ধে।

আরো এক মাস কেটে গেলো। হুবনা ঠিক পুরোপুরি সেরে উঠলো না। টানা-হ্যাঁচড়া করে শরীরটাকে ব'য়ে নিয়ে চললো। কার্তিক মাসের বর্ষায়, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঘায়ে সে আবার শয্যাশায়ী হোলো। চিমমা কথা শোনাতে ছাড়লো না, হাজার বার সে বললো, 'তখন আমার কথা শোনো নি— যাও সম্বন্ধীর বাড়ি গিয়ে পাত পেড়ে খেয়ে এসো আবার।' চিমমা শুধু হুবনাকেই কথাটা বলে ক্ষান্ত হোলো না, বউকে আরো কুৎসিতভাবে বললো, 'ডেকে নিয়ে গিয়ে কী খাইয়েছিস— কে জানে ! চারদিন লোকটা বেশ ভালো ছিলো, তোদের আর সহ্য হোলো না।'

এই জাতীয় অভিযোগ শুনে তারার চোখ জলে ভ'রে যেতো। দিনরাত সে ভগবানকে ডাকতো, হে ভগবান— একবার আমার শ্বশুরকে ভালো করে দাও, নইলে এ বদনাম আমার ঘুচবে না।

এদিকে হুবনার অবস্থা আরো খারাপের দিকে চললো। হুবনার অবস্থা দেখে চিমমার ধারণা বদ্ধমূল হোলো যে ওকে কিছু খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। হুবনা চোখ বুজলে ওকে দেখবে কে— এই চিন্তায় চিমমার সন্দেহ আরো ঘন হতে লাগলো। অতএব, চিমমা গেলো দেবেন্দ্র নামে এক পণ্ডিতের সঙ্গে সলা পরামর্শ করতে। পণ্ডিতমশাই সদ্য দিবা-নিদ্রাভোগের পর জেগে উঠে, চিমমাকে ডেকে বসালেন আপ্যায়িত করে, 'চিমমা যে ! অনেকদিন পর এলে।'

'শুধু শুধু তো আসতে পারি না— কাজ না পড়লে— তা আপনার 'পঞ্চাঙ্গ' বের করুন একবার—'

পণ্ডিতমশাই 'পঞ্চাঙ্গ' বের করে অস্ফুট স্বরে মন্ত্র আওড়ালেন। চিমমা প্রণামীর পয়সা রেখে— পণ্ডিতমশায়ের পাশে বসে পড়লো। তারপর পণ্ডিতের উদ্দেশে বললো, 'ভালো করে গুণে বলুন— হাত জোড় করে বলছি— মল্লদের বাড়িতে খেয়ে আসার পর থেকেই ওর

অসুখটা বেড়ে গেছে। ওকে ওরা কিছু খাইয়ে দিয়েছে কী ?'

দেবেন পণ্ডিত খুবই মনোযোগের সঙ্গে সব কথা শুনে— তিন চারবার কড়ি ফেলে 'গুণতে' শুরু করলেন। তারপর, চিমমার হাতে ছোট্ট এক চিলতে ডালভাঙা কাঠ দিয়ে বললেন এক জায়গায় রেখে দিতে। চিমমা ভক্তিভরে সেইটা নিয়ে পণ্ডিতমশায়ের বইয়ের এক জায়গায় গুঁজে দিলো— পণ্ডিতমশাই বইয়ের পাতাটি খুলে ভেবে-চিন্তে বললেন, 'এ কাজ করেছে এক নারী যে··· ।' দেখা গেলো, চিমমার অনুমানই ঠিক। চিমমা জিজ্ঞেস করলো, 'এই দশা কাটাবার কী বন্দোবস্ত আছে ?'

'আছে। তবে পয়সা খরচ করতে হবে।'

'খরচের জন্যে ভাববেন না। আমিই দেবো সব। আপনি বন্দোবস্ত করুন।'

'বন্দোবস্ত আর কি করবো— শাস্ত্রমতে গ্রহ শান্তি করবো। দেবীকে কালো শাড়ি পরিয়ে পুজো দেবো— রাতে লোক খাওয়াবো— তারপর পুজোর পর একটা তাবিজ বানিয়ে দেবো। ওটা হুবনার ডান হাতে বেঁধে দেবে— ব্যাস।'

চিমমা আবার করজোড়ে অনুরোধ জানালো, 'তাই করে দিন— দু এক টাকা না হয় এখনই দিয়ে যাচ্ছি।' 'ঠিক আছে। চিন্তার কিছু নেই। সব সামলে দেবো— কেউ ওর একটা চুলও বাঁকাতে পারবে না। পুজোর জিনিসপত্র তুমি ঘরে যোগাড় করো— যদি তাও না পারো, আমাকে সওয়া দু টাকা পাঠিয়ে দিও। আমি সব ঠিক করে রাখবো।'

'টাকা এনে দেবো', ব'লে চিমমা উঠছে এমন সময় পণ্ডিতের বউ ভেতর থেকে ডাক দিলো, 'চিমমা— ভেতরে এসো।'

'না— এখন যাই। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

'সন্ধ্যে হয়ে গেছে তো কী হয়েছে। বাড়িতে বউ আছে যখন তখন অত ভাববার কী আছে ?' পণ্ডিত গিন্নি মরুদেবী জবাব দিলো।

চিমমা ভেতরে এসে বললো, 'বউ কাজ করবে ? তাহলেই হয়েছে ! যতক্ষণ না কিছু করতে বলি— ততক্ষণ করবে না, ঠায় বসে

থাকবে। আর ওকে বলতে-বলতে, নিজে করলেই বরং কাজটা চটপট হয়ে যায়।'

'আজকালকার মেয়েদের কথা আর বোলো না! আশপাশেও তো এই দেখি আজকাল। তুমি আর কি বলবে।'

'সবই এক। কিন্তু আমার কপালটা একটু বেশি খারাপ—' চিমমা নিজের বক্তব্য পেশ করলো।

মরুদেবী গালের ওপর আঙুল রেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ও মা! তবে বাপু— তোমরা একটু পুরোনো দিনের—' তারপর একটু থেমে, 'তা চিমমা, তোমার বউয়ের বাপের বাড়ি এ গাঁয়ে আর পণ্ডিত পেলো না? অন্য গাঁয়ে গিয়ে পণ্ডিত ডেকে আনলো? তোমার বউয়ের হয়েছেটা কী?'

চিমমা জবাব দেবার আগেই মরুদেবী আবার বলে উঠলো, 'না-হয় অন্য গাঁ থেকে পণ্ডিত আনলি— তা গাঁয়ের পণ্ডিতদের কী একবার নেমন্তন্ন-ও করতে নেই? অবিশ্যি, আমার কথা বলছি না, মাঝরাত্তিরে আমি কি আর যেতুম? আর উনি? বেলা পড়ার পর এক গণ্ডূষ জলও মুখে দেন না!'

শেষের কথাটি মরুদেবী এই ভেবে বললো চিমনা যেন মনে না করে মল্লদের বাড়িতে নেমন্তন্ন না পেয়ে সে রেগে গেছে।

'তোমায় বলে নি?' চিমমা ঈষৎ গর্বের সঙ্গে জবাব দিলো, 'আমাকে তিন-তিনবার ডাকতে এসেছিলো, তবুও আমি যাই নি।'

মরুদেবী উত্তর দিলো, 'যাও নি—? ভালোই করেছো। ওখানে খেলেই বা কী সুখ হোতো?

10

ভুবনাকে সৎকার করে সবাই ফিরে এলো এখুনি। সকাল বেলা ব'লে বহু লোক জড়ো হয়েছিলো। ভরমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

মল্ল ওর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলো। শেষ নিঃশ্বাস পড়ার আগে ভুবনাকে যেখানে শোয়ানো হয়েছিলো, সেই জায়গাটা গোবর দিয়ে লেপে দেওয়া হোলো— জলভরা একটা ঘড়া রেখে দেওয়া হোলো সেখানে। সৎকারে যারা গিয়েছিলো তারা ওই ঘড়ার মধ্যে ফেরার-পথে-নিয়ে-আসা ধুলো আর কুশ ফেলে দিয়ে বাড়ি-মুখো হচ্ছিলো। বারান্দায় বসেছিলো চিমমা। ওর পাশে রত্না। ঘরের এক কোণে তারকা। আককাতায়ি কুমারী— তাই এখানে না বসে, তাকে বসতে হয়েছিলো ভেতরের ঘরে। প্রতিবেশিনী দু একজন অন্য কাজ করে দিচ্ছিলো। তদারকির ভারটা ওদের ওপরই ছিলো।

ভরমাকে ঢুকতে দেখে চিমমা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'বাবাকে পুড়িয়ে ছাই করে এলি রে! আমার সিঁদুর মুছে দিলি! আমার কি সর্বনাশ হোলো রে!' এইসব বলে চিমমা আরো দ্বিগুণ জোরে কেঁদে উঠলো।

রত্না চিমমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিলো, 'কেঁদে কী হবে বোন, যে যাবার সে চলে গেছে। এখন মন শক্ত করো।'

'ওরে আমার কি হবে রে···'

আর একজন সান্ত্বনা দিলো ওকে, 'কাজ ফুরিয়ে গেলে এখানে কেউ থাকে না রে— উনি ঠিক টেনে নেন। যখন যেখানে দরকার —ভগবান তাকে সেখানেই নিয়ে যান।'

রত্না বলে উঠলো, 'তবুও মরার আগেও ওঁর আক্ষেপ যায় নি। যদি নাতি হবে শুনেও যেতেন—'

চিমমা এবার রত্নাকে আরো জোরে জাপটে ধরে কেঁদে উঠলো। তারকাও কাঁদছিলো। এদের মতো সজোরে কান্নাকাটি করতে অভ্যস্ত না থাকায় সে প্রায় শব্দহীনভাবে কাঁদছিলো। ফলে, সে কারুরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। সবাই চিমমাকে সান্ত্বনা দিতেই ব্যস্ত ছিলো। দেবেন্দ্র পণ্ডিতের বউ তারকার কাছে গিয়ে ঈষৎ কটাক্ষ করে বললো, 'বন্ধ করো তো বাপু এসব! যা হয় ভালোর জন্যেই হয়।'

তারকা কোনো জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কি জবাব দেবে, ভেবে পেলো না। হুবনা মারা যাওয়ায় সে-ও শোকে মুহ্যমান। চিমমা কিন্তু এই শোকের মধ্যেও ছোবল মারতে ছাড়লো না, বললো, 'ওর আর কি দিদি— ওরা কি খাইয়ে দিয়েছিলো কে জানে —আমার তো হাত পা খোঁড়া হয়ে গেলো।' কথাটা ব'লে চিমমা আরো উচ্চৈঃস্বরে, ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে, রত্না খুবই বিব্রত বোধ করলো। চিমমাকে কি ব'লে থামাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। মনে হোলো তারার অল্প কান্না দেখে চিমমা বুঝি আরও জোরে কেঁদে উঠছে। একটু পরেই, রত্না উঠে গিয়ে তারার চুলের মুঠি ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো, 'এখন কোত্থেকে আসবে তোর শ্বশুর? কে তোকে আর তারা ব'লে ডাকবে? কার বিছানা পাট করবি রোজ?' —এইভাবে রত্না মেয়েকে শোক প্রকাশ করার তালিম দিলো। ততক্ষণে, আরও কিছু মেয়ে বউ এসে পড়লো।

দুপুরের দিকে পাড়াপড়শিরা এসে যখন ওদের জন্যে দই নিয়ে এলো, এবং খাওয়া-দাওয়া করাবার চেষ্টা করল, কান্নার ধুম আরো বেড়ে গেলো। তবুও, পড়শিরা ওদের হাত ধরে জোর ক'রে খাওয়ালো। এরপর, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ বেড়ে যাওয়ায় লোক-জনের আসাযাওয়া একটু কমে গেলো। বাড়ির গোরু-মোষগুলোকে জাব দেওয়ার জন্যে রত্নাও চলে গেলো রাস্তায় দেবেন পণ্ডিতের বউয়ের সঙ্গে দেখা হ'তে সে জিজ্ঞেস করলো রত্নাকে, 'কী, চললে না কী?'

হ্যাঁ। সকাল থেকেই ওখানে ছিলুম। বাড়ি আসতে পারিনি। এখন গিয়ে বাড়িতে যারা কাজ করে, তাদের গোরু-মোষদের— খাওয়ার ব্যবস্থা করে— আবার ফিরে আসবো।'

এর মধ্যে, সেখানে চাঙ্গলাবুড়ি-ও এসে হাজির, বললো, 'কাজ তো করতেই হবে। যে যাবার সে তো চলে গেলো— কিন্তু বাকি-গুলোকেও মেরে গেলো। যেমন-তেমন করে দিন কাটাতে হবে এখন।'

রত্না জবাব দিলো, 'ছেলে অবিশ্যি এখনো ততো বড়ো হয়নি— তবুও সে এখন এক মস্ত বড়ো সহায়।'

'তা তো ঠিকই। কি করা যাবে— ক্রিয়াকর্ম করতেই হবে।

স্বর্গে ইন্দ্র-চন্দ্রকেও খাটাখাটুনি করতে হয়। আমরা তো সামান্য মানুষ।’

মরুদেবী চাঙ্গলাকে আর কথা বাড়াতে না দিয়ে বললো, ‘যারা থেকে গেলো তাদের ঠিক চলে যাবে। কিন্তু যে লোকটা খাটতে খাটতে বুড়ো হয়ে গেলো, যে-ই দু-দণ্ড বসে আরাম করার সুযোগ এলো তখনই ভগবান তাকে সরিয়ে নিয়ে চলে গেলো হুট করে—’

ছলছলে চোখ রত্না জবাব দিলো, ‘ভগবানের মার দুনিয়ার বার। কেউ কিছু করতে-পারে না।’

‘আহা— বড়ো খাঁটি লোক ছিলো গো। শেষের দিকে দিব্যি চলা-ফেরা করতো। লাঠি ধ’রে ধ’রে মন্দিরে এসে পুরাণ শুনতো। চিমমা বেচারির বিধবা হওয়া কপালে লেখা ছিলো— ও-ও যদি মারা যেতো ভালো হোতো।’

রত্না দীর্ঘশ্বাস ফেললো, ‘ও-সব হিসেব-নিকেশ যার করার সেই করে।’ এই ব’লে রত্না বাড়ির পথ ধরলো।

সেই দিনটা তো কেটে গেলো কোনোক্রমে। পরের দিন অস্থি-ভস্ম পুঁতে দেওয়ার কাজ হোলো। শোকের গভীরতা ক্রমশ অদৃশ্য হতে লাগলো। ভরমা এখন আর অতটা বিচলিত নয়। চিমমা কাঁদতে-কাঁদতেও নিজের কাজ ঠিক-ঠিক করে গেলো। দেবেন পণ্ডিতের বউ ও চাঙ্গলার সঙ্গে রত্নার যে কথাবার্তা হয়েছিলো, তাও তার কানে এলো। ছেলেকে ডেকে সে বললো, ‘ভরমা— তোকে যা বলছি তার একটা কথাও মিথ্যে নয়। তোর বাবা গেছে রত্নার জন্যে— এখন সে আমাকে মারতে চাইছে।’

‘যতো সব বাজে কথা দু-চারদিন ক্ষান্ত দাও বাপু!’ বিরক্ত হয়ে ভরমা জবাব দিলো, ‘এখন আমার আর আছে কে?’

‘কি যে আল-ফাল বলিস! তোর শাশুড়ি সবার সামনে বলেছে এসব কথা। আর তুই এখনো রত্নার জন্যে লাফাচ্ছিস। দেখিস— ও এবার তোকে মেরে ছাড়বে।’

‘কী যে বলো! আমাকে মেরে কী হবে ওঁর? ওঁর তো আর

এক গাদা কাচ্চা-বাচ্চা নেই।'

'তাই না কী? তাহলে আর কেন, তুই ওখানে গিয়েই থাক তা'হলে ছেলে সেজে! এখনো ঘরে আছিস কী করতে?' এইটুকু রাগের ঘরে ব'লে উঠে, চিমমা অতঃপর করুণ গলায় ব'লে উঠলো, 'বিধবা— এখন আর আমার নিজের বলতে কী আছে? সবার পায়ের ধুলো হিসেবে থাকতে হচ্ছে আমাকে— ওগো, তুমি আমায় কোথায় ফেলে চলে গেলে গো! স্বগগো থেকে নেমে এসে একবার দেখে যাও আমার কী হাল হয়েছে— মা গো! বাবা গো!

গমের দাম জিগেস করে মল্ল ফিরে এসে বোনকে কাঁদতে দেখে এক ধমক দিলো, চুপ কর বলছি! তোকে কি এমন ভাসিয়ে গেছে সে? এতো বড়ো বাড়ি, ছেলে, ছেলের বউ— তোর অভাব কী? এদের দেখাশোনা করে তোর দিন কেটে যাবে—'

ভরমা উঠে এসে জানতে চাইলো, 'গমের দাম জেনে এসেছো?'

'এসেছি। বাসব্যা তিন চাইছে। গুড় চাল ওর কাছ থেকে কিনলে দামটা আর একটু কমাবে।'

ভরমা এবার মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা, তুমি কত দিয়ে গম কিনেছো? সবাইকে তো খাওয়াতে হবে।'

চিমমা রুক্ষভাবে উত্তর দিলো, 'আমাকে জ্বালাচ্ছিস কেন? তোর মামা আছে— মামাকে জিজ্ঞেস কর।'

মা'র কথা শুনে ভরমা আহত হোলো মনে-মনে। কিছু বললো না। বোনের উদ্দেশে মল্ল বললো, 'গাঁয়ের সবাই আসবে— এক বস্তা তো নিশ্চয়ই লাগবে— ও-গুলো আবার পিষে নিতে হবে।'

'যা ভালো বোঝো— তাই করো। উঃ ভগবান— কেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে— !'

চিমমার বিলাপ শুরু হয়ে গেলো আবার।

হুবনার কাজ-কর্ম করার জন্যে মল্ল কিছুদিন বোনের বাড়ি থেকে গেলো। ভরমা ছেলে মানুষ, সংসারের কিছুই বোঝে না এখনো। অথচ, হুবনার শ্রাদ্ধ এখনো বাকি। কাজেই, জীবদ্দশায় গাঁয়ের সবার

প্রিয় এই লোকটির শেষ কাজ উপযুক্তভাবে করা দরকার। হুবনার টাকা-কড়ি ভালোই ছিলো— সবই চিমমার হাতে তুলে দিয়ে সে চোখ বুজেছে। ধার-বাকি রেখে জিনিসপত্র কেনা হ'য়েছিলো। পরে চিমমা শোধ করে দেবে, এই ভেবে। অন্তত মল্ল, ছেলে ভরমা— তাই ভেবেছিলো। এই নিয়ে ওদের দু জনের মধ্যে কথাবার্তাও হয়েছিলো।

বাড়ির সমস্ত কাজ তারাই করতো। সঙ্গে থাকতো আককাতায়ি। চিমমার ঠিক আগের মতো দৌড়-ঝাঁপ করে কাজ করার অবস্থা ছিলো না। বাড়িতে যাদের আনাগোনা ছিলো, তাদের সঙ্গে কথা বলে চিমমা সময় কাটাতো— যার জন্যে ঘরে-বাইরে, প্রত্যেকের খাওয়ানো দাওয়ানোর ভারটা পড়েছিলো তারার ওপর। তারা সব কাজই করতো নিখুঁতভাবে— শুধু একটি কাজ তাকে কখনো দেওয়া হয় নি। তা হোলো, ভরমা ফিরে এলে তাকে খেতে দেওয়াটা আককাতায়ির এথতিয়ার ছিলো— চিমমা স্বয়ং বসে থাকতো সেখানে। তারাকে আসতে দেওয়া হোতো না ধারে কাছে।

তারকাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভরমার জন্যে পরিবেশন করতে আসতো না। আবার, ভরমা বোন খেলায় ব্যস্ত দেখে খেতে আসতো, এবং মা'কে কথা বলায় ব্যস্ত দেখলে 'মা খেতে দাও' ব'লে নিজেই আসন নিয়ে বসে পড়তো মা আসার আগেই— তারকা বিব্রত হোতো, ভরমার অভিপ্রায় বুঝতে পারতো— হয়তো খাওয়া আনতেও যেতো, কিন্তু চিমমা গম্ভীর স্বরে বলে উঠতো ভরমার উদ্দেশে, 'একটু বস-আমি আসছি।' আবার এমনও হোতো, চিমমা তারাকে কোনো কাজের অজুহাতে সেই সময় বাইরে পাঠিয়ে দিতো, আককাকে বলতো ভাত বাড়ার জন্যে। ভরমা নিরুপায় হয়ে খেয়ে যেতো।

একদিন মল্ল গম তুলিয়ে রেখে ফিরছে, পথে দেবেন পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হোলো। দেবেন পণ্ডিত তীক্ষ্ণ চোখে মল্লকে দেখে প্রশ্ন করলেন, মনে হচ্ছে শ্রাদ্ধভোজের বন্দোবস্ত করছো?'

'হ্যাঁ। শ্রাদ্ধ তো করতেই হবে। জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে-করতে শ্রাদ্ধের দিন তো এসে পড়বে।'

দেবেন পণ্ডিত জিজ্ঞেস করলেন, তা বেশ—কিন্তু পূজোর আয়োজন কেমন করছো? এতো বড়ো লোক চলে গেলো। শর্মদ শিখর—পূর্ণ বিধানে পূজো-পাট করাও, পালকি টালকি বের করো।'

শ্রাদ্ধ জমকালো ক'রে করার ইচ্ছে মল্লরও ছিলো, কিন্তু দেবেন পণ্ডিত যেভাবে করতে বলছেন—সেই রকম বিরাট ভাবে নয়। মল্লর জবাব ওসব দিলো, 'আমরা গরিব মানুষ। পালকি-টালকি বের করে কী হবে? ওসব বড়োলোকদের শোভা পায়। শাদাসিদে পূজো করে পাচ জনকে না জানালেও চলে যাবে—তাছাড়া ছেলেও এখনো ছোট, এত খরচ করতে যাই কি করে?

দেবেন পণ্ডিত মুখ বাঁকালেন, 'কী যা তা বকছো। হুবনা ছিলো আমাদের গাঁয়ের চৌগলা* —এক সুপুরি পেতো—এটা মনে রেখে কাজ কোরো বাপু।'

মল্ল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, সব বুঝি। ধুমধাম তো দরকার—কিন্তু খালি কথায় তো চিড়ে ভেজে না—টাকা আসবে কোথ থেকে?

'টাকা যোগাড় করতে হবে। এইটাই তো হুবনার শেষ কাজ—এরপর হুবনার আর কোন কাজটা হবে শুনি? না, না—আমি বরং সন্ধ্যের সময় চিমমার সঙ্গে কথা বলবো।' দেবেন পণ্ডিত জানেন চিমমা নিশ্চয়ই রাজি হবে।

'বেশ তো—কথা ব'লে দেখুন!' ব'লে মল্ল এগিয়ে গেলো।

দেবেন পণ্ডিত চিমমাকে কি বোঝালেন কে জানে, দেখা গেলো চিমমা পালকি বের করে, ঘটা করে পূজো দেবার জন্যে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছে। পালকিসহ পূজোর এই আয়োজন চলতে লাগলো। ওই দিন চার ছ মণ আনাজ কিনে প্রিয়জনকে খাওয়ানো ছাড়া, প্রত্যেকটি শ্মশানযাত্রীকে খাওয়াবার পরিকল্পনা নেওয়া হোলো, পরের দিন গ্রামের সবাইকে। দেবেন পণ্ডিত দুদিনের কার্যক্রম ঠিক করে দিলেন। পরিকল্পনামতই কাজ হোলো। প্রথম দিন পালকির সামনে

* চৌগলাঃ সম্মানিত, গণ্যমান্য ব্যক্তি—পান-সুপুরি দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

বাজনা বাজাবার জন্যে অন্য গাঁ থেকে বাজনাঅলাদের নিয়ে আসা হলো। আত্মীয় স্বজনে ভরমাদের বাড়ি গমগম করে উঠলো।

হুবনার পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ না হওয়া অবধি চিমমার সেদিন উপোস থাকার কথা। যার জন্যে সে ভেতরে গিয়ে বার-বার চা খেয়ে আসতে লাগলো। এমন সময় সুন্দরাবাঈ এসে হাজির হোলো এনাপুর থেকে। হুবনার মৃত্যুর খবর সে আগেই পেয়েছিলো, কিন্তু শ্রাদ্ধবাসরে যোগ দেওয়ার আগে এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার সুন্দরার পক্ষে প্রয়োজন ছিলো। মল্লর বাড়িতে না গিয়ে সুন্দরা সোজা এখানে এসেছিলো। চিমমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছতেই চিমমার কাছে সুন্দরার আসার খবর পৌঁছে গেলো। ঝটপট চা শেষ করে চিমমা বেরিয়ে এলো, বললো, এতোদিনে আসার সময় হোলো তাহ'লে?' তারপর যথারীতি মাথা চাপড়ে বিলাপ করে উঠলো, 'আর কী দেখবে বোন!' সুন্দরাও কেঁদে-কেটে বিলাপ প্রকাশ করে জবাব দিলো, 'আর কেঁদে কী হবে? সে তো এখন ভগবানের ঘরে চলে গেছে। সংসারের সব কাজ সাঙ্গ করে—ব্যাটার বিয়ে দিয়ে—সে চলে গেছে। তোমরাও তো ওকে অনেক যত্নআত্যি করেছো!··· বেস্পতিবার মারা গেছে? ঠিক সময় চিঠি পাইনি—তাই আজ এলুম।'

চিমমা বিলাপ করার ঢঙ রেখেই জবাব দিলো, 'বুধবার রাতে নিঃশ্বেস আটকাতে লাগলো বার-বার—হায়! হায়!—দিনের আলোও দেখে যেতে পারলো না আর।' তারপর লম্বা ক'রে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে, 'ভোরের দিকে একটু জ্ঞান এসেছিলো, চোখ খুলে একবার 'তারা' ব'লে ডেকেছিলো—ভাবলুম এ যাত্রায় বুঝি বেঁচে গেলো। সকালে এলো দেবেন পণ্ডিত আর ভীমাপ্পা—আহা বড়ো ভালো লোক—ওরা—' চিমমা আর এক প্রস্থ কাঁদলো, 'গায়ে হাত দিয়ে দেখে কী—হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা!....ছেলে পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, পুরুৎ—সবাইকে ডেকে আনলো। দশ টাকার চাল দান করতে হোলো—ছোটো জাতদের লোককে খই দিতে হোলো—' এতটা বলবার পরই

চিমমার কান্না আর থামায় কে, সে অবশেষে বললো, 'কানে মন্ত্র পড়ার আগেই সে চলে গেলো।'

'আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার সময় বিশ টাকার আনাজ বিলোতে হয়েছিলো, পাঁচ মণ গম বিলি করতে হয়েছিলো চাকর-বাকর আর ছোটো জাতের মধ্যে....এ ছাড়া সোনা দিয়ে ফুল তৈরি করে সব ছেলেরা....'

'আমিও কিছু কম করি নি বোন—তবে মল্লর জন্যে একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলো। তবে, মল্লপার কথা আমি কানে তুলি নি একটাও। সব নিজের মতো করেছি—আমার আর কে আছে এখন—' ব'লে চিমমা আর এক দফা ভেউ-ভেউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

বাইরে থেকে জলের একটা ঘড়া এনে ভীমাপ্পা ভেতরে রাখতে এসে, চিমমাকে চুপ করতে বললো, 'আরে বাবা—হুবনার কাজটা ভালোভাবে করো—তাহলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চিমমা চোখের জল মুছে সুন্দরার কাছে জানতে চাইলো, 'তোমার সঙ্গে আর কে এসেছে?'

'কেউ না তো! বড়ো ছেলেকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে।'

'অন্তু এসেছে! কোথায়? ডেকে নিয়ে এসো ওকে—বেচারার নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে—কিছু খেতে দাও ওকে।'

এই ব্যাপারে আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটলো। যেদিন গাঁয়ের লোক সবাই খেতে এলো, সেদিন সব কাজ করার পর ভীমাপ্পা কিছু না খেয়ে বাড়ি চলে গেলো। স্বস্ত্যয়নের পর চিমমার কানে গেলো কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে চিমমা লোক পাঠালো ভীমাপ্পাকে ডেকে আনার জন্যে। কিন্তু ভীমাপ্পা এলো না। লোক ফিরে এসে জানালো, ভীমাপ্পা বলেছে, এ বাড়িতে কে কার কথা শোনে? সবার সঙ্গে বারো দিনের অশৌচ শেষ করে সবার সঙ্গেই খেতে বসেছি, ছেলে বললো, কাকা তুমি আমাদের সঙ্গে এখানে বসো, মগত্নমের মল্ল এসে বললো, তুমি এর পরে বোসো'—এই ব'লে আমাকে উঠিয়ে দিলো। ওর বাড়ি না কী? এইজন্যেই কী ওখানে গিয়েছিলুম যেচে বে-ইজ্জত

হওয়ার জন্যে? এখন আর যাওয়া চ'লে না আমার।'

চিমমা সব শুনে মল্লকে কথা শোনাতে ছাড়লো না, মল্ল জানে না কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। এ রকম কথা শুনে ভীমাপ্পা তো চলে গেলো—কিন্তু কালই তো ওকে আমার দরকার হবে।' এই কথা ব'লে চিমমা গেলো ভীমাপ্পার বাড়ি, ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসার জন্যে। তবুও ভীমাপ্পা এলো না। ওর জন্যে খাবার-দাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হোলো।—

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাবার পরের দিন, দুপুরবেলায়, অনন্ত ভেতরের একটা কামরার মধ্যে শুয়েছিলো। নানা কথা তার মনে উঁকি দিচ্ছিলো। সারাদিন তারাকে খাটতে হয়, এ বাড়িতে ওকে কেউ জিজ্ঞেসও করে না খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কী না, কিংবা খুব খাটছো—একটু জিরিয়ে নাও। কাল থেকে অনন্ত দেখছে তারা এক মুহূর্তের জন্যেও জিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ পায় না। এই সব ভাবতে ভাবতে অনন্তর তন্দ্রা এলো। তন্দ্রার মধ্যে সে যেন তারকার ম্লান চেহারাটা দেখতে পেলো। মনে পড়লো ছেলেবেলায় খেলা করার সময় তারকার সেই মিষ্টি-মিষ্টি হাসিখুশি চেহারাটার কথা। স্বপ্নের মধ্যেই অনন্ত খুব দুঃখ পেলো, তারপর আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো ভরমার ডাকে, 'আরে কতক্ষণ ধরে ঘুমচ্ছো—উঠে কিছু খেয়ে নাও। ঘুমটা ভালো হয়নি—না?' বলতে বলতে ভরমা পাশে বসে পড়লো।

'দু দিন ঠিকমতো ঘুম হয়নি। পরশুদিন ভোরে উঠেই পুজো আর পালকি, তারপর কাল অনেক রাতে খাওয়া দাওয়া হয়েছে—' চোখ কচলে চার দিকটা দেখে নিয়ে সে এবার প্রশ্ন করলো, 'সবার জিনিসপত্র ফেরত দিয়ে দিয়েছো?'

গত চার পাঁচদিন একসঙ্গে থাকার জন্যে অনন্ত আর ভরমার মধ্যে বেশ হৃদ্যতো গড়ে উঠেছিলো। তাছাড়া, এই ক'দিনে ভরমাও টের পেয়েছিলো, সম্ভবত নতুন দায়িত্ব পেয়ে, কার সঙ্গে কীভাবে মিশতে হয়।

'মোটামুটি সব কাজ হয়ে গেছে।'

'কী ক'রে? সবে তো দায়িত্ব নিয়েছো, এরপর দেখবে একটার পর একটা কাজের ভার নিতে হচ্ছে।' আরো কিছু বলতে গিয়ে অনন্ত সহসা কথাটা ঘুরিয়ে দিলো, 'অবিশ্যি চিমমা মামী সব কাজই সামলে নেবে তোমার হয়ে।'

অনন্তর কথা শেষ হতে-না-হতে ভরমা একটু অসন্তোষের সুরে বললো, 'মা কী কাজ সামলাবে? মা যদি সব সামলে নিতে পারতো তাহলে কী আর এই হাল হোতো?'

'আরে মা'র কথা ছেড়ে দাও! ওনাকে একটু সামলে রেখে তোমরা স্বামী-স্ত্রী একটু ঠিক থাকলেই হোলো।' অনন্ত, ভরমার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করলো।

'কথাটা অবিশ্যি ঠিক।' ব'লে অনন্তর সঙ্গে ভরমা সেদিন দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিলো।

'এই কথাবার্তার পর ভরমার মনোভাব বুঝতে অনন্তর অসুবিধে হয়নি। তারার মানসিকতাও তার অজ্ঞাত ছিলো না। তারা এবং ভরমা—দু জনেই যে পরস্পরের সান্নিধ্য পেতে উৎসুক—তা অনুমান করা কঠিন হয়নি। প্রথম দিকে তারা খুবই চেষ্টা করেছিলো ভরমাকে কাছে আনার জন্যে কিন্তু ভরমা পিছিয়ে গিয়েছিলো, এখন ভরমা চেষ্টা করলো তারাকে কাছে আনার জন্যে, কিন্তু তারা পিছিয়ে গেলো। দু জনেই যেন অথৈ সাগরে হাবুডুবু, কিনারায় যাবার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু এই টুকুই বোঝা যাচ্ছে দু জনেই এক গন্তব্যে একদিন-না-একদিন পৌঁছে যাবে। ঝড় থামলেই নিস্তরঙ্গ সাগর পার হয়ে যাবে ওরা একদিন। এইসব চিন্তা ক'রে অনন্তর খুব মন খারাপ হয়ে গেলো।

অনন্ত বেশ বড়ো হয়ে গেছে। দশম শ্রেণীতে পড়ে। বিচারবুদ্ধি ক্রমশ প্রখর হচ্ছে। ভরমার সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই তারার জন্যে সে কেমন যেন বিচকিত, অস্থির হয়ে উঠলো। অনন্ত যেদিন ফিরে যাবে, তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় চিমমা মন্দিরে গেলো।

বারান্দায় সুন্দরা কথা বলছিলো আককাতায়ার সঙ্গে। ভরমা-ও বাড়িতে ছিলো না। তারা রান্নাঘরে সকালের দুধ জ্বাল দিচ্ছিলো। অনন্ত জল খাবার অজুহাতে সেখানে চলে এলো, ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী তারা—ভরমার দুধ গরম করছো বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমার কাজ দুধ গরম ক'রে রাখা—খাওয়াবে কিন্তু অন্য লোক!' তারা খুব সহজভাবেই উত্তর দিলো, 'ওকে দুধ খাওয়াবো সে ভাগ্য আমার নেই!'

'এখনো সে-ভাগ্য হয় নি?'

তারা নিরুত্তর।

'এতোদিন 'সার্ভিস' হোলো—তবুও?'

তারা 'সার্ভিস' কথাটা বুঝলো না, 'কি হোলা?'

'মানে এ্যদ্দিন ধরে চাকরি হোলো তবুও ভাগ্য হোলো না?'

'না। দেখি কবে হয়। হবে একদিন ঠিকই।'

'সে কী?'

'বাঘিনীর মতো মা রয়েছে খাওয়াবার জন্যে, বোন রয়েছে অন্য কাজ দেখা-শোনার জন্যে। আমি স্রেফ রাঁধুনি—খাওয়ার সময় যদি কাছে থাকি তাহলে ওর না কী নজর লেগে যাবে!'

'নজর লেগে যাবে! কী বলছো তুমি! লোকে হোটেলে সবার সামনে খায়, নজর লাগে না। আর বাড়িতে বউয়ের সামনে বসে খেলে নজর লাগবে—কে বলেছে এসব কথা?' অনন্ত তারার কাছে আরো কিছু শুনে নেবার চেষ্টা করলো।

'শহরে তোমরা অনেক ভালো আছো। নজর-টজরের বালাই নেই—কিন্তু আমাদের গাঁয়ে—অন্য কথা—'তারপর একটু থেমে, বোধ হয় আমার বাড়িটাই অলুক্ষণে।' অনন্ত তারাকে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, উনুনের আগুনের আঁচে তারার মুখটাও কেমন যেন মনে হোলো। আগুনের আঁচ মুখের ওপর ছায়া ফেলেছে।

'অলুক্ষণে? কেন? যা খুশি তাই বলছো।' অনন্ত পরিবেশটা হালকা করতে চাইলো।

'কপাল খারাপ হ'লে যা হয়—যেখানেই যাই লোকে দূর দূর করে!'

'তোমাকে আবার কে দূর-দূর করলো?' কৌতূহলী হোলো অনন্ত।

'সবাই।'

'সবাই? ভরমা?'

'ও-ই তো প্রথম আমাকে দূর-দূর করে!' ব'লে তারা ঘড়ি ঘুরিয়ে দেখলো আশপাশে কেউ আছে নাকি। অনন্ত, বুঝতে পেরে, বলে উঠলো, 'কেউ নেই।'

উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেললো তারা, ও যদি আমাকে দূর-দূর না করতো, তাহলে আমার এই হাল হয়? এরা আমাকে তো ঘরের ধুলোর মতো মনে করে।'

'তুমি এরকম ভাবছো কেন?' যদি ভরমার কথাটা এই ফাঁকে বলা যায়, অনন্ত সেই সুযোগ খুঁজলো।

'কেন ভাববো না? সবাই জানে ....।'

অনন্ত অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারাও। অনন্ত নিঃশব্দে তারাকে দেখলো, কি বলবে বুঝতে না পেরে বললো, তুমি এ রকম হয়ে গেলে কেন?'

'কী রকম হয়ে গেছি? দিব্যি আছি—কোনো অসুখ বিসুখ নেই, শয্যাশায়ী হইনি, আজ-কালের মধ্যে মরে যাবো—সে আশাও নেই। চেয়ে-চিন্তে খাই—সবার কাজ করি—ব্যাস, দিব্যি আছি!'

তারার কথায় অনন্ত মনে-মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলো। বিষণ্ণ স্বরে বললো, 'এমনি বলছিলাম, কিছু মনে কোরো না। দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন। কাচ্চা-বাচ্চা হোক—তখন দেখবে আর মরতে ইচ্ছে করবে না।'

তারা কোনো জবাব দিলো না। অনেকক্ষণ ধরে আঁচ জ্বলে যাচ্ছে; দুধ গরমের কথা সে ভুলে গিয়েছিলো, দুধ চাপিয়ে আনমনা হতেই বেশি গরমে দুধ উথলে উঠলো, সে চট করে দুধটা নামিয়ে

ফেললো, বললো, কাচ্চা-বাচ্চা—হুঁ !'

বাইরে থেকে আককার আওয়াজ পাওয়া গেলো, দুধ পুড়ে গেছে না কী ?

অনন্তর দ্রুত বেরিয়ে এসে আককাকে শুনিয়ে তারাকে বললো, 'এই রকম করলে হাত জ্বালিয়ে সব পুড়িয়ে ফেলবে তুমি !'

তারা অনন্তর দিকে তাকালো। কথাটা অনেকক্ষণ ধরে তার মনে দৌড়াদৌড়ি করলো।

11

ভুবনার শ্রাদ্ধে যারা এসেছিলো তারা চলে যাবার পর মল্ল জামাইকে আলাদাভাবে ডেকে বললো, 'জিনিসপত্র সব এনেছিলুম বাসব্যার দোকান থেকে। কাপড় আর অন্যসব কেনাকাটার জন্যে ও-ই টাকা দিয়েছে, মোট আড়াই শো টাকা পাবে—মা'র কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে ওটা মিটিয়ে দিও তাড়াতাড়ি। দেরিতে দিলে ব্যাপারটা ভালো দেখাবে না। আমি চলি এখন, দশ-পনেরো দিন ক্ষেতে যাইনি—ওখানে কি অবস্থা হয়েছে, কে জানে !'

ভরমা বলে উঠলো, তার চেয়ে মা'র কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আপনিই ওটা চুকিয়ে দিয়ে যান। বাসব্যার দেনা যখন শোধ করতেই হবে—এখনই করে দিন।'

'ভাই—নিজেদের কাজ নিজেরা করে নিলেই ভালো। তাছাড়া, এটা তোমাদের বাড়ির ব্যাপার, আমি তো আত্মীয়। এর চেয়ে বেশি আমার কিছু করাটা ভালো দেখায় না। তাতে, চিমমা কিছু মনে করতে পারে। ভীমাপ্পার কথাটা মনে নেই ? আমি সেদিনই হয়তো চলে যেতুম—তারপর ভাবলুম, না, কাজের বাড়িতে অর্ধেক কাজ ফেলে রেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কাজ হাতে নিয়েছিলুম—

পুরো করে দিয়েছি। এখন তোমরা নিজেদের কাজ বুঝে নাও।' খুবই শান্তভাবে কথাগুলো ব'লে মল্ল চলে গেলো।

পরের দিনই বাসব্যা লোক পাঠালো টাকা নেবার জন্যে। ভরমা নিজেই দোকানে গিয়ে ব'লে এলো, 'কাল দেবো।' নিজেকে বড়োই অসহায় মনে হোলো তার, এই ধরণের কাজকর্ম সে জীবনে করেনি। যার জন্যে, দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সে সোজাসুজি চ'লে গেলো মা'র কাছে। চিমমা সব কথা শুনে জবাব দিলো, 'ঘরে জিনিসপত্র আছে, গোরু-মোষ আছে, তোর বউয়ের গায়ে গয়না আছে—এগুলো বিক্রি-বাটটা করে দেনা শোধ ক'রে দে। তোর বাবা তো আর তোকে ভিখিরি ক'রে রেখে মরেনি।'

জবাব শুনে ভরমা চুপ করে গেলো, ভাবলো, বাবা মা'র হাতে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিলো যাতে শৃঙ্গের সময় কোনো অসুবিধেয় না পড়তে হয়, অথচ মা টাকাটা দিতে চাইছে না কেন? দোকান থেকে আবার লোক আসতে, ভরমা তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললো, 'মা'র কাছ থেকে চাও।'

ভরমার কথামতো লোকটি চিমমাকে বলতে, চিমমা যেন আকাশ থেকে পড়লো, 'আমি কোথা থেকে টাকা দেবো ভাই? ছেলে আর ছেলে-বউয়ের দেওয়া দুটো রুটি খেয়ে আমি তো পোষা কুকুরের মতো ঘরের এক কোণে পড়ে থাকি। উনি বেঁচে থাকতে কী আমাকে এসব কোনোদিন ভাবতে হয়েছে? জলের মতো টাকা খরচ করেছি মনের খুশিতে। এখন আমি আর কে? যা করবার সব ছেলে করবে—আমার কাছে কেন টাকা চাইতে এসেছো?' এরপরই চিমমার উচ্চৈস্বরে বিলাপ শুরু হয়ে গেলো, 'আমাকে কি বিপদে ফেলে গেলে গো! আমাকেও তুমি সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন গো!' চিমমার বিলাপে তাগাদা-দিতে-আসা লোকটি হকচকিয়ে গেলো। কি বলবে ঠিক করতে না পেরে সে ফিরে গেলো অবশেষে।

দিন দুয়েক পরে বাসব্যা মল্ল আর ভরমাকে ডেকে পরিষ্কার বললো, মাল নেবার সময় মনে ছিলো না? এখন মা ছেলেকে

দেখাচ্ছে, ছেলে মা'কে দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা কী?'

মল্ল আরো দু-চার দিন দেখার জন্যে বললো, আর ভরমা জবাব দিলো, 'মা'র কাছে আর একবার চাও—যদি না পাও তো, আমিই যেভাবে পারি তোমার দেনা মিটিয়ে দেবো।'

সেইদিন দুপুরবেলায় ভরমা চিমমাকে বললো, 'মা তোমার কাছে তো টাকা আছে—বাসব্যার পাওনাটা মিটিয়ে দাও। কাল বরং চৈত্র মাসের ফসল রুই করে বেচার পর টাকাটা নিয়ে নিও। এ ঘরের সবই তো তোমার—ঘরের জিনিস বাইরে বেচার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। আর তুমি এতো টাকা আগুড়াচ্ছো কেন? বাইরে আমি একেবারে মুখ দেখাতে পারছি না। তোমার ভালো লাগছে এইসব?' ভরমার আবেদনে দীনতা প্রকট।

'কেন দেবো? আমার কিছু থাকবে না? এতো তোদের কামাই করা টাকা নয়। সব আমাকে সে দিয়ে গেছে। তোদের উচিত নয় ওই টাকা চাওয়া, আমারও উচিত নয় দেওয়া।' চিমমা বেশ নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দেওয়ায় ভরমা এবার রেগে গেলো, লাল লাল চোখ করে সে বলে উঠলো, 'দেবে না—যখন টাকার দরকার তখন তুমি এইসব বলছো? বেশ, গোরু-মোষ বেচে আমি টাকা শোধ করবো?'

কী! এতো বড়ো আস্পদ্দা! আজ ও নেই ব'লে তুই আমার ওপর চোখ পাকাচ্ছিস?' চিমমা কপাল চাপড়ে বলতে লাগলো, 'তুই যদি মারতে চাস তো মার আমাকে—কে তোকে বুদ্ধি দিচ্ছে আমি সব জানি—আমি তোর মা, দশ মাস দশদিন পেটে রেখে জন্ম দিয়েছি তোকে। আমার সঙ্গে এই রকম 'ব্যাভার'—দেখিস তোর ভালো হবে না!'

'কেন ফালতু কথা বলছো? কে আমাকে বুদ্ধি দেবে? কেন অন্য লোককে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছ?'

'আমি মিছিমিছি দোষ দিচ্ছি? খেয়াল আছে মেয়ে জোয়ান হয়ে যাচ্ছে, ওকে বিয়ে দিতে হবে, শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হবে। তোকে টাকা দিয়ে আমি খালি হাতে ব'সে থাকবো?'

ভরমা চুপচাপ, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ওর বিবর্ণ মুখে ছোপ-ছোপ রক্ত ফুটে উঠলো আবার, উত্তেজনায় ঠোঁট ছুটো কেঁপে উঠলো, 'বেশ, তোমার ঘর সংসার তুমিই সামলাও—' বলে সে দপ দপ করে পা ফেলে বেরিয়ে গেলো। চিমমা সেইদিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসলো। একটু পরে তারকা বাইরে থেকে আসতে বললো, 'তোমার সোয়ামি ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।'

তারকা চুপ করে থাকলেও ওর ঠোঁটে আশা-নিরাশার একটা চাপা হাসির আভাস চিমমার নজর এড়ালো না।

চিমমা বলে উঠলো, 'ও তোরা ষড় ক'রে এটা করালি তা'হলে? তাইতো বলি, ব্যাটা আমার এতো লাফায় কেন—কে ওকে এতো সাহস দিলো! যা পারিস তোরা ক'রে নে—' তারপর তর্জনী তুলে, 'মা-ছেলের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলি শেষ কালে? তুই তা হলে এইসব শিখিয়ে দিয়েছিস ওকে?'

তারকাও এবার চুপ করে রইলো না, 'আমি কেন শেখাতে যাবো! মিছিমিছি আমার নামে বদনাম করছো কেন? আমার নাম নিয়ে জ্বলে উঠছো কেন?

'কি—তোর নামে আমি জ্বলছি! এখন দেখছি সবাই আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলছে! কপাল পুড়লে এই রকমই হয়—' বলে চিমমা আবার ঘণ্টা খানেক ধরে মড়াকান্না শুরু করে দিলো। পাড়ার সবাই জড়ো হয়ে সেই কান্না শুনে নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করে দিলো এইভাবে, 'এই সময় হুবনা বোধহয় ঘুরে যায়—ছুপুরে বোধহয় চা বানাতে বলে, তারপর চা খেয়ে—মানে, চা খাবার সময়েই বোধহয় ওর চিমমার কথা মনে পড়ে। এইজন্যে বেচারি এমন ক'রে কাঁদে।'

'সারা ঘরে····সময় আর কাটতে চায় না, যতই কাজ করি—মনে হয় কিস্সু কাজ করিনি।' চিমমা এইটুকু ব'লে আর কথা বাড়ায় না! মেয়েরা নিজেদের মধ্যে এই সব আলাপ আলোচনা করে এক সময় চলে যায়। তারপর ঘরের বাইরে আলোচনা করে:

'বলি, এখন কেন মা-ছেলের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে? ওর কোথায়

হুবনার জন্যে মন খারাপ থাকার কথা—তা নয়—'

ঝগড়া করা ছাড়া চিমমার আর কাজ কী আছে? ব্যাটা আর ব্যাটার বউকে তো উস্তম-খুস্তম করে মারছে। বুড়ি হয়ে গেলি—তবুও আককেল হোলো না? একটু তো বোঝা উচিত—'

'বউ তো একেবারে সোনার টুকরো। খাটিয়ে খাটিয়ে বউটাকে তো মেরে ফেলার যোগাড় করেছে।'

মাঝখান থেকে এক বৃদ্ধা বললেন, কিযে বলিস তোরা—খাটলে কী আর শরীর খারাপ হয়? আমার মেয়ে কাজ করে না? আসলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি মিল থাকে—তাহলে কোনো খাটুনি গায়ে লাগে না। মেয়ে ফুর্তিতেই থাকে।'

প্রথম যে কথা বলেছিলো, সে এবার একটু আশ্চর্য হওয়ার ঢঙে বললো, 'ফুর্তিতে থাকবে কী ক'রে? তারাকে ভরমার বিছানার কাছে ঘেঁসতেই দেয় না। পরশুদিন তারা এসেছিলো আমাদের বাড়ি—দিব্যি খেয়ে বলেছে ওরা এখনো একসঙ্গে শোয়নি! ভগবান জানে, চিমামার কি মতলব—'

'হুঃ! তুই শোয়ার কথা বলছিস ওরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এখনো কথা অবধি বলতে পারে না। চিমমা—ঠিক একদিন এই বউকে তাড়িয়ে দিয়ে ব্যাটার জন্যে আর একটা বউ আনবে—দেখবি।'

'কিন্তু তারা তো পরের বাড়ির মেয়ে নয়। নিজের ভায়ের মেয়ে যাকে বলে ভাইঝি।'

'ভাইঝি তো কী হয়েছে? আর একটা আনবে।'

'আনলেই হোলো! কেউ দিলে তো?'

'না—দেবার কী আছে, যদি তাকে ঘর-বাড়ি সব দিয়ে দেয়।'

'হ্যাঁ—ঘর-বাড়ি রাস্তায় পড়ে আছে! আর, ঘর-বাড়িও এক সময় আলাদা হয়ে যায়, বউকে যদি আদরে না রাখতে পারে, বউ যাবে কোথায়? বউয়েরও তো একটা ব্যবস্থা হওয়া চাই।'

'সব নির্ভর করে ছেলের ওপর। ছেলে যদি ঠিক থাকে চিমমা কী করবে?'

'ছেলে ঠিক থাকবে কী ক'রে? ছেলেটা কী নিজের মতো কিছু করতে পারে? তবে—জোয়ান ছেলে—ওইবা এমন ক'রে কদ্দিন কাটাবে?'

মেয়েরা এইসব কথা আলোচনা করার পর অন্য কথা আলোচনা করতে শুরু করলো।

রাগের চোটে ভরমা দু-তিনদিন বাড়ির বাইরে কাটালো। বন্ধুর বাড়িতে 'খাওয়া-দাওয়া করলো। ভেবেছিলো, মা বুঝি ডেকে পাঠাবে। কিন্তু, প্রত্যেক দিনই তার কল্পনা ভুল ব'লে প্রতিপন্ন হোলো। চিমমাও দেখলো ছেলেকে জব্দ করার এই সুযোগ। চিমমা বাড়ির চাকরটাকে ডেকে বললো, ভরমা রাগ করে কয়েকদিন বাড়ির বাইরে কাটাচ্ছে, তুই বরং গোরু-মোষগুলোকে একটু দেখাশোনা কর।' চাকর ভরমাকে এ কথা জানালো, ক্ষেতে এসে। কথাটা শুনে ভরমা আরো রেগে গেলো, ঠিক করলো জীবনে আর ও বাড়িতে পা দেবে না। সন্ধ্যের দিকে সে গেলো মল্লদের বাড়ি। মল্ল বাড়ি ছিলো না। রত্না দুধ দুইছিলো। ভরমা বসে পড়লো চুপচাপ। বেশ খিদেও পেয়েছিলো ওর মুখ চোখ শুকনো। মাথার চুল এলোমেলো। রত্না বললো, 'আমার ঘরে তখন আসতে, তোমার মা পছন্দ করতো না। পরে তোমাদের মা-ছেলের মিল হয়ে গেলো। এখন, মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসে যদি আমার বাড়িতে আসো—তাহলে তোমার মা আর রক্ষে রাখবে না। না বাপু—তোমাকে আর আমার এখানে আসতে হবে না।'

ভরমা একটু কঠিনভাবে জবাব দিলো. মা'র কথায় আর কী যায় আসে? ভাবছি, তারাকে নিয়ে আসবো এবার—তোমাদের এখানে একটু থাকার জায়গা পাবো?

রত্না অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। ভাবতে লাগলো, হাজার হোক মা আর ছেলে, ঠিক এক হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে এই ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়লে খামোকা বদনাম কিনতে হবে। কাজেই, রত্না খুব সহজভাবে বললো, 'তোমার এখানে থাকাটা ঠিক হবে না। সম্পর্ক

ভাঙতে চাইলেই কী ভাঙতে পারা যায়? তুমিও রেগেছিলে, তোমার মা'ও রেগেছিলো—ঝগড়ার মুখে কী বলতে কী বলেছো····ঘরে তো এ রকম ঝগড়া হয়ই····যদি চাও তো তোমার মামার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ধার শোধ করে দিতে পারো, কিংবা বাছুরটা বেচে দিতে পারো —তাছাড়া ক্ষেতের কাজও এখন কম—চৈত্রমাসে আমি না-হয় তোমার সঙ্গে গিয়ে লগমস্বার মেলায় 'রুই' কিনে আবার বেচে দেবো তোমার কাছে—তোমাকে আর কি বোঝাই—বলো তো?'

রত্নার কথা ভরমার ভালো লাগলো না। কিঞ্চিৎ উষ্মা বোধ করে সে উঠে পড়লো। রত্না আবার বললো, 'ভরমা—একটু দুধ খেয়ে যাও। ঘরে ঝগড়া করে এদিক-ওদিক খেয়ে বেড়াচ্ছো শুনলুম—আমি তো তোমাকে খাওয়াতেও পারি না এখানে। বাড়িতে সব ঠিক হয়ে গেলে, আমি আবার তোমাকে খাওয়াতে পারবো এখানে।' কিন্তু ভরমা ততক্ষণে কোনো কথার জবাব না দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেলো। আর ফিরেও তাকালো না। রত্নাও মনে-মনে পীড়িত হোলো, কিন্তু কিছু করার নেই।

সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ার সময় রত্না তারাকে কলসি কাঁখে আসতে দেখে, এগিয়ে গেলো। আশপাশে কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে রত্না তারাকে ভরমার খবর দিয়ে বললো, 'তোকে নিয়ে আলাদা থাকতে চায়। এখানে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে কি না জিগেস করছিলো।

'তুমি কী বললে?' তারার মুখ সহসা উজ্জ্বল দেখালো। অন্ধকারে, রত্না বোধহয় মুখের এই ভাব লক্ষ করতে পারলো না। রত্না জবাব দিলো:

'পাগলি! আরে—হাজার হোক ওরা মা আর ছেলে। আমি তো বাইরের লোক। ওদের ঠিক মিল হয়ে যাবে—বদনাম হবে আমার। তাই আমি ওকে বাড়িতে ফিরে গিয়ে থাকতে বলেছি।'

মা'র জবার শুনে তারকা নিশ্চুপ হয়ে গেলো। মুখটা মলিন হয়ে গেলো আবার। রত্না আরো বললো, 'তোকেও বোধহয় জিজ্ঞেস

করবে। খবরদার—আলাদা থাকার কথায় রাজি হ'সনি। হ'লে বুঝবো, তুই এইসব ওকে শিখিয়েছিস।'

'যেতে দাও। ও আর আমায় জিজ্ঞেস করেছে।'

'দেখিস—ঠিক জিজ্ঞিস করবে। ওর মাথায় এখন পোকা কিলবিল করছে। এখনো রেগে আছে—রাগ পড়ে গেলে অন্যরকম হয়ে যাবে। কাজেই, ওর কথায় রাজি হয়ে বেরিয়ে পড়লে পরে গণ্ডগোল হবে। যদি রাজি হয়ে যাস—তাহলে তুই আমার মরা-মুখ দেখবি—ব'লে রাখলুম।' তারার ভবিষ্যৎ-কামনার জন্যে মেয়েকে দিয়ে দিব্যিও খাইয়ে নিলো রত্না।

কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়লে মানুষ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কোন রাস্তায় গেলে সমস্যার সহজ সমাধান হয়। হিতাহিত জ্ঞান একেবারে চলে যায়। ধরে নেয়, সে যা করছে তাইতেই বোধ হয় সমাধান হবে। ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। যার জন্যে মা'র কাছে দিব্যি খেলেও, অনেক আলোচনা করেও—তারার মন টানলো ভরমার দিকে। সে ভাবতে লাগলো, ভরমা যদি জিজ্ঞেস করে কী হবে—'না' বলার দরকার কী—ওই ঝগড়ার পরেও কী সে আর কোনোদিন বাড়ি ফিরতে পারবে? আর আমি ওর বউ হয়েও ওর সঙ্গে থাকবো না—না। তা হতে পারে না। আমি যাবো ওর সঙ্গে। যা হয় হবে।

সকালে তারকা ক্ষেত থেকে ফিরছে, মনে হোলো পেছন থেকে কে যেন 'এই!' ব'লে ডাকলো। তারকা ফিরতে দেখলো ভরমা খুব দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসছে। ভরমাকে দেখে খুব খুশি হোলো সে। ভরমা এসে কি জিজ্ঞেস করবে—সে জানে। বুকটা হঠাৎ কেমন ধুকধুক করে উঠলো। স্বামীর সঙ্গে এইভাবে সে কোনোদিক কথা বলেনি। তার ওপর, এই রকম একটি বিষয় নিয়ে।

ভরমা কাছে এলো। সে-ও ভাববার চেষ্টা করছিলো কীভাবে কথাটা বলা যায় তারা-কে। অধিকন্তু, এর আগে সে পুরো ব্যাপারটা মনে-মনে তালিম দিয়ে রেখেছিলো, কিন্তু স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়াতে তালিম-দেওয়া-বিবৃতি পুরোটাই যেন ভুলে গেলো। কি বলবে, কেমন

করে বলবে বুঝতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করলো কোনো ক্রমে, কোথায় যাচ্ছো ?' গলা দিয়ে আওয়াজ বেরতে চাইলো না।

'কোথায় আর যাবো ? ক্ষেতে।'

'আমি চলে আসার পর মা আর কী বলে ?'

তারা জবাব দিলো চিমমার অনুকরণে, 'যেখানে খুশি যাক—আজ, নয়তো কাল ঠিক ফিরে আসবে—যাবে কোথায় ?' —কথাগুলো ব'লেই তারকা ঘাবড়ে গেলো, চুকলি করাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

'বটে !' রাগে লাল হয়ে গেলো ভরমার চোখ।

তারা অবশ্য খুশি হোলো, বিশ্বাসের বরফ গলছে ব'লে মনে হোলো। তারা আবার বললো, 'তুমি এ-রকম করছো কেন ? মা—'

'মা'র ভয় আমি আর করি না। তুমি খুব ভয় পাও মা'কে—না ?'

'পেতেই হয়। শাশুড়ি যখন।'

'ভয়ের একটা সীমা আছে। সেই সীমা পার হ'লে…'

ভরমার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হোলো। চোখ দিয়ে জলের ফোঁটা পড়তে লাগলো টপটপ করে। একটু শান্ত হয়ে প্রশ্ন করলো।

'একটা কথা বলবো। শুনবে ?'

'উঁ।' তারা জানে এইবার ভরমা বলবে কথাটা। সে বললো, 'শোনার মতো যদি হয়—কিন্তু—কিন্তু—'

তারপরও চোখে জল এলো। মনের মধ্যে অনেক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ভিড় করে দাঁড়ালো।

ভরমা ধীরে-ধীরে বললো, শোনো—আগে আমার কথা। সেদিন ঝগড়ার সময় তুমি ছিলে না—টাকা দিতে চাইছে না, আমাকে দিতে বলছে—কিন্তু আমি কোথায় পাবো টাকা ? বাসব্যা পাঁচ-জনের সামনে আমাকে অপমান করেছে দেনা মেটাতে পারিনি ব'লে। মা'র কাছে টাকা আছে অথচ দেবেনা—আমার চেয়ে টাকা বড়ো মা'র কাছে। আমি আর বাড়ি যাবো না। ছেলের দরকার নেই মা'র—দেখবো এবার কে ক্ষেত আর ঘরবাড়ি সামলায় ?'—এরপরই, যেমন রহস্য উদ্‌ঘাটন

করছে এমন সুরে ভরমা বললো, 'তুমিও চলে এসো আমার সঙ্গে। আমরা দু জনে আলাদা থাকবো—' ভরমার গলা কাঁপতে লাগলো, দিনরাত কলুর বলদের মতো খেটে কী পেয়েছি আমি?'

'বুঝলুম। কিন্তু থাকবো কোথায় আমরা?'

'এক মাস ভীমশিকাকার ওখানে থাকবো। ফসল তোলার পর ক্ষেতে একটা চালা-ঘর বানিয়ে নেবো। তারপর—তারপরের ব্যাপার দেখা যাবে।'

'মা কী এখানে আমাদের একা থাকতে দেবে? তার চেয়ে বরং, মা'র চোখের আড়ালে, আমরা অন্য কোনো গ্রামে চলে যাই।'

প্রস্তাবটা ভরমার পছন্দ হোলো না। এখানকার ঘরবাড়ি জমি-জমা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে তার থাকার ইচ্ছে নেই। ওর বক্তব্য, মা'র সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, বাড়িতে অশান্তি, কাজেই আলাদা থাকবে। ফসলের ভাগ সে ছাড়বে না। বাসব্যার দেনাও শোধ করবে এখানে থেকে—ভরমা এইটুকুই ভেবে রেখেছিলো।

ভরমা সহসা রূঢ়ভাবে বললো, অন্য কোথাও যাবো না। এখানেই থাকবো। তুমি আসবে কী—না?'

নিরুপায় হয়ে তারকা জবাব দিলো, 'আসবো।'

'আজ সন্ধ্যে বেলায় তাহলে ভীমশিকাকার বাড়িতে চলে এসো।'

'আচ্ছা'

ভরমা খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললো, 'আসবার সময় তোমার শাড়ি আর আমার পরার ধুতি নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা।' তারা বেশ চিন্তায় পড়লো, পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগলো সে।

'এখন গিয়ে যদি দেখো ওরা বাইরে—তাহলে সব বের ক'রে রেখে দেবে—তারপর আসার সময় সব নিয়ে আসবে। বুঝলে?'

তারা ঘাড় নেড়ে জানালো, 'হ্যাঁ।'

12

ওই ঘটনার পর আরো এগারো মাস পার হয়ে গেছে। এই এগারো মাসের মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না—শুধু তারকার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠা ছাড়া। রোজ সকালে উঠেই চিমমার মুখ শুনতে হোতো, 'এই যে মহারাণী; সোয়ামির ওপর দরদ দেখিয়ে ঘরটা ভাঙতে চেয়েছিলে!' সঙ্গে, তারার মা বাপকেও উদ্ধার করতো চিমমা। এই রকম একদিন, তারা নদীতে গেছে কাপড় ধুতে, রোদ চনচন করছে, আশপাশে কেউ নেই, টল টল করছে নদীর জল—তারকার মনে হোলো ছেলেবেলায় সে যেমন করে মা'র কোলে বসতো, ঠিক সেইভাবেই যেন সে নদীর কোলে বসে আছে। পরণের এক একটা কাপড় খুলে ধুয়ে সে পাথরগুলোর ওপর রাখতে লাগলো। বিষণ্ণ ভাবনায় বুঁদ হয়ে গেলো সে এক সময়, ভাবতে লাগলো, এভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ—এই প্রচণ্ড জ্বালা সহ্য করে আর কতদিন বেঁচে থাকা যায়। ......ঠিক এই সময় সুমতি, ওর ছেলেবেলার বান্ধবী, জল নেওয়ার জন্যে, এসে দাঁড়ালো।

সুমতি বেশ বড়ো হয়ে গেছে। একটি ছেলেও হয়েছে ওর। কয়েক দিন সে এসেছে বাপের বাড়ি। ছেলেবেলার এই দুই সখীর মধ্যে কত কথাই না হোতো! সুমতিকে দেখে তাই বোধ হয় তারকার চোখ ছলছল করে উঠলো—দেখাদেখি, সুমতির চোখও জলে টলটলে হয়ে উঠলো। দু জনেই প্রথমটা ভেবে পেলো না কি বলবে, নিষ্পলক হয়ে শুধু দেখতে লাগলো পরস্পরকে। তারপর, চোখ মুছে সুমতি বললো, 'চার-পাঁচ দিন ধরে তোর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি।'

'আমিও যেদিন মা'র কাছে শুনলুম তুই এসেছিস—সেদিন থেকে চেষ্টা করেছি তোর সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু আমি তো আর তোর মতো—' তারকা আর কিছু বলতে পারলো না, ওর চোখের জল নদীতে পড়তে লাগলো বড়ো বড়ো ফোঁটা হয়ে।

সুমতি এবার মাথা থেকে ঘড়া নামিয়ে তারার ভিজে কাপড়গুলো ধুতে বসলো। তারা বললো, 'রেখে দে—আমি ধুয়ে নেবো, তুইও তো শ্বশুরবাড়ি থেকে খাটাখাটুনি করে আসছিস।'

'তাতে কী হয়েছে। আমরা বরঞ্চ একসঙ্গে কথা বলতে বলতে বাড়ি যাবো। বাচ্ছাটাকে ভুলিয়ে রেখে এসেছি—যেতে দেরি হ'লে কি করে বসবে—কে জানে।'

ছোট্টো এক টুকরো কাপড় নিংড়ে তারা জানতে চাইলো, 'তোর শাশুড়িটা কেমন রে?'

'এক রকম। শাশুড়িরা যেমন হয়—তবে তোর শাশুড়ির মতো খাণ্ডার নয়। উফ্—তোর শাশুড়ির জুড়ি তুনিয়ায় পাওয়া যাবে কি—না—সন্দেহ!' তারপর, একটু থেমে, 'হ্যাঁরে—ভরমা তোর সঙ্গে… ?'

'হুঃ! ওই মায়েরই তো ছেলে—আর কতো ভালো হবে!' তারা শাড়ি নিংড়োলো। তু জনে মিলে চান করলো অনেকক্ষণ ধরে। সুমতি কাপড় ধুয়ে দিতে, তারা সেগুলো নিংড়ে—পাথরের ওপর মেলে দিতে লাগলো শুখোবার জন্যে।

'মাঝখানে—তোরা আলাদা ছিলি?'

'আলাদা থাকতে গিয়েই আমার সর্বনাশ হোলো। ওর কথা শুনে আলাদা থাকতে, মা বাবাও বিগড়ে গেলো আমার ওপর। নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারলুম—যেই শাশুড়ি টাকা দিলো, অমনি মা-ব্যাটা এক হয়ে গেলো!'

'তাই নাকী? একবার যখন আলাদা হয়ে গেলি, তখন আলাদা থাকলেই ভালো করতিস তোরা।'

'কপাল আর কাকে বলে!'

সুমতি অনেকক্ষণ ধ'রে তারাকে দেখলো, তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'আজ নয় তো কাল, ঠিক কপাল ফিরবে—দেখিস—আরে, ভগবান তো আছে।'

'উঁ। আর এ পোড়া কপাল ফিরেছে।'

চোখ মুছে, ঝুড়ির মধ্যে কাপড়গুলো রাখতে-রাখতে সুমতি

বললো, 'ছিঃ—ও রকম বলতে নেই রে তারা।'

সান্ত্বনা দিলেও সুমতি মর্মে গিয়ে বিঁধেছে তারার দুঃখ। শ্বশুরবাড়িতে তারার দিনগুলো আরো দুঃসহ হয়ে উঠেছে। চিমমা আজকাল ছেলের মেজাজ দেখে চলে—ফলে তারাকে সুযোগ বুঝে কষ্ট দেওয়াটা বেশ অনায়সই হয়। দিন দুয়েক আগে, সন্ধ্যের সময় চিমমা জল আনার জন্যে একটা বিরাট ঘড়া এগিয়ে দিলো তারার দিকে, তারপর গোয়ালঘরে ছেলেকে এসে বললো, 'দেখলি—সময় বুঝে কেমন ঘড়া নিয়ে জল আনতে গেছে! আসলে, সত্যা এসেছে—তাই আড্ডা মারতে গেছে।'

ভরমা একবার তাকালো। মুখ লাল—মা'র কথায় ওর মাথা ভোঁ ভোঁ করে উঠলো। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠলো, মনে হোলো একটা কামরার মধ্যে আটকে ওর মুখে-চোখে কেউ যেন ঘুঁসি মেরেছে হাত পা বেঁধে—এইসব ভেবে ওর হাত-পা যেন পাথরের মতো হয়ে গেলো, মনে হোলো এখুনি প'ড়ে যাবে। সে কোনোক্রমে নিজেকে সামলে রেখে দাঁড়িয়ে রইলো, সারা শরীর ঘর্মাক্ত, গলা কাঠ-কাঠ, নাক দিয়ে গরম শ্বাস বেরোলো, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো সে। সুযোগ বুঝে চিমমা বলে গেলো, 'আমার কথা মিথ্যে নয়। নদীতে গেলে দেখতে পাবি সব।' ভরমা সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা এগোলো, একটু চলার পর হাত পায়ে সাড় এলো। চোখের সামনে অন্ধকার ঈষৎ ঝাপসা। হাওয়ার ঝাপটায় নির্বীয পাতার মতো সে এগিয়ে এলো আরো কিছুটা পথ, নদীর কাছাকাছি। তারপর একটা গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে সে দেখতে লাগলো তারাদের। জলভর্তি ভীষণ ভারি ঘড়াটা সত্যপরি সঙ্গে ধরাধরি করে তারা উঠিয়ে নিলো। ব্যাস, এইটুকুই যথেষ্ট ছিলো—গত দুদিন এই নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি চলছিলো বাড়িতে। তারকা না খেয়েছিলো—তবুও এসেছিলো নদীর ঘাটে।

নদীর ধার দিয়ে ওরা দুজনে এগিয়ে এলো কথা বলতে-বলতে। 'সুমি—তুই তো খুব সুখী—না?' অন্য কেউ সুখী একথা শুনেও বোধ

হয় এক ধরণের সুখ পাওয়া যায়, এইজন্যেই তারা হয়তো প্রশ্নটা করেছিলো।

'সুখী'—সুমতি বলতে গিয়েও বলতে পারলো না, শুধু বললো, 'শ্বশুরবাড়িতে সুখ-দুঃখু দুই-ই আছে। কোনো রকমে চালিয়ে নিই—আর কি।'

তারা আনমনা হয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তবুও তো একটা ছেলে হয়েছে তোর—অন্তত পৌঁছে গেছিস এক জায়গায়। রায়সাহেব আছে কেমন?'

'দিব্যি আছে। এখানে আসতে দিতে চায় নি প্রথমটা, বলেছিলো, 'ছেলের শরীর ভালো নয়—এখন যেও না'—এর আগেও, আমাকে দু চারবার নানা ছলছুতোয় আটকে রেখেছিলো, এবারে আর পারলো না—তাই চলে এলাম—'

এ-সব কথা তারার কাছে নতুন। সে আশ্চর্য হয়ে সুমতির কথা শুনতে লাগলো। সুমতি বলছিলো, 'মেলা দেখে যাবো ভেবেছিলুম—কিন্তু দেরি হয়ে যাবে ব'লে, মেলার আগেই চলে যাবো।'

এইসব কথা বলতে-বলতে ওরা বাড়ির কাছে এসে পড়তে, সুমতি বললো, 'একদিন আসিস আমাদের বাড়িতে—বাচ্ছাটাকে দেখে যাস।' তারপর জিজ্ঞেস করলো, শ্বশুরবাড়ি কখন পৌঁছবি?'

'কেন?' তারকার মুখ থেকে কথাটা যেন নিজে থেকেই বেরিয়ে গেলো।

সুমতিও বোধহয় সেদিন এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলো—কিন্তু ছেলেকে আদর করতে ব'সে বোধহয় প্রশ্নটা ভুলে গিয়েছিলো।

ভাগ্যের খেলা বড়ো বিচিত্র। এই খেলায় অংশ গ্রহণ করতে অনন্ত এসে পড়েছিলো নাভিরাজকে নিয়ে। অনন্তর জন্যে তারার জীবন আর এক উল্লেখযোগ্য বাঁকে এসে থেমে দাঁড়ালো। অনন্ত এখন আর আগের মতো ছোটো নয়, হাইস্কুলে পড়ে, পরনে মিহি ধুতি, পরিচ্ছন্ন জামা, গলায় সোনার লকেট—পুরোপুরি একালের নব্য তরুণ।

তারা ওকে কৌতুহলী চোখে একবার দেখার পর—বার-বার দেখতে ইচ্ছে হোলো। অনন্তর কথাবার্তা বার-বার শোনার ইচ্ছে হোলো। ওর প্রত্যেকটা কথা তারার ভালো লাগতো। অনন্তর ওঠা-বসা, চালচলন, সবই খুব ভালো লেগে গেলো ওর। যেদিন থেকে অনন্ত এসেছে রত্নার কাছে, সেদিন থেকে প্রায় রোজই সে নদাতে যায় চান করতে। দু একবার রত্না বারণ করেছিলো. 'ঠাণ্ডা জল—রোজ চান করলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোর'—কিন্তু অনন্ত রত্নার বারণ শোনে নি। আবার, সে যেতোও যখন তারাও নদীতে কাপড়চোপড় ধুতে আসতো, সেই সময়ে। অনন্তর কাপড়চোপড়ও তারা শুখিয়ে দিতো খুব সাবধানে, যাতে ধুতিতে একটু দাগও না লাগে! কাপড় আর বইয়ের পেছনে অনন্তর কত সময় যায়—কে জানে। এই জাতীয় কোনো না কোনো কথা তুলে তারা অনন্তর সঙ্গে নাগাড়ে কথাবার্তা বলে খুব খুশি হোতো।

গত এক মাস ধরে মল্ল সপরিবারে ক্ষেতের কাছে—একটা দোচালা তৈরি করে আছে। সঙ্গে গোরু-মোষগুলোর জন্যে একটা খাটালও বানিয়েছিলো। যার জন্যে, গাঁয়ের ভেতর যাবার খুব একটা দরকার হোতো না ওদের। তবুও, কথা হোলো যে শুক্রবার ওরা গাঁয়ে যাবে—কেননা প্রত্যেক বছর লগমব্যা-র মেলায় মল্লকেই খাটা-খাটুনি করতে হোতো। পুজোর প্রসাদের বন্দোবস্ত, দেবী বরণ, যার মাথায় করে দেবী আসেন তাকে সুচারুভাবে খাওয়ানো, তারপর সবার জন্যে ভোগ—এই সবেরই ব্যবস্থাপনার ভার থাকতো মল্লর ওপর। ফলে, বাসনকোসন, আনাজপাতি, রান্নাবান্না—এই সব কাজে মল্ল, ঘরের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে, পাঁচ ছ দিন ধরে ডুবে থাকতো। এইটাই ওর বহু প্রচলিত অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

অনন্তর সঙ্গে কিন্তু গ্রামের কারুরই তেমন আলাপ পরিচয় নেই। সব সময় ক্ষেতে-ই থাকতো সে। রত্নার সঙ্গে গল্প করে, খাওয়া-দাওয়া করে সময় কাটাতে হোতো। তারকা মাঝে-মাঝে শ্বশুরবাড়ি থেকে ক্লান্ত হয়ে আসতো, তবুও অনন্তর সঙ্গে গল্প করার আকর্ষণ কাটিয়ে

উঠতে পারতো না। এদের দু জনের মধ্যে থাকতো নাভিরাজ। দুপুরের দিকে দোচালার টিন গরমে তেতে উঠতো—যার জন্যে তারকা আমগাছের নিচে কম্বল বিছিয়ে বসার বন্দোবস্ত করতো। অনন্ত সেই কম্বলের ওপর বসে কখনো পড়তো, পড়তে-পড়তে ঘুম এলে বুকের ওপর বইটা রেখে ঘুমিয়ে পড়তো। ক্ষেত থেকে আসতে-আসতে হঠাৎ একদিন তারার চোখে পড়লো অনন্ত ওইভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই মুহূর্তে সে পলকহীন চোখে দাঁড়িয়ে পড়লো, এর আগে অনন্তকে সে এইভাবে কখনো দেখে নি। ঘুমন্ত মুখ, সদ্য-ওঠা গোঁফ, হাওয়ায় উড়ছে-এক-মাথা-ঝাঁকড়া চুল—তারকা মন্ত্রমুগ্ধের হতো দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে লাগলো। এই মুহূর্তে অপরূপ মনে হচ্ছে অনন্তকে। রোদ মাথায় করে তারকা যে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো একভাবে তা সে নিজেই জানে না। অনন্ত হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসতেই—তারাকে দেখতে পেলো। তারা তখনো রোদের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'তারা! রোদে দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

তারকা একটু থতমত খেয়ে গেলো, কোনো রকমে ঢোক গিলে গিলে বললো, 'মা আসবে কী না—তাই—'

অনন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। মুহূর্তের জন্যে এক চিলতে হাসি তার ঠোঁটে এসে মিলিয়ে গেলো, সে চোখ বুজলো আবার।

রত্না স্বভাবসিদ্ধভাবে চিরকালই একটু মুক্ত-হস্ত। ফলে, খেতে বসার সময় অনন্ত 'না না' করলেও রত্না একটু বেশি করেই খাইয়ে দিতো। গাঁয়ের বউ! লোককে বেশি করে খাওয়াতে এরা চিরকালই ভালোবাসে—কিন্তু মুশকিলে পড়লো অনন্ত—খাওয়া শেষ করতে বেচারা হিমসিম খেতো! বেচারা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে যতটা সম্ভব ততোটা খেতো, রত্না বলতো, 'য়্যাঁ! এতো বড়ো হয়ে গেছিস—তবুও বাচ্চাদের মতো খাস!'

অনন্ত জল খেয়ে উঠে পড়ার জন্যে তৈরি হ'তে-হতে, মল্ল হাত ধুয়ে আসতো, বলতো, 'কীরে পাতে এতো প'ড়ে রইলো কেন? কে খাবে তোর এঁটো? না কী তোর বউ আছে এখানে? খেয়ে নে

বলছি হতভাগা—নইলে তোর কান ছিঁড়ে দেবো।' মল্ল অবশ্য পরিহাস করেই কথাগুলো বলতো, রত্না হাসতে হাসতে বলতো, 'যা হাত মুখ ধুয়ে নে—আমি আর তারা না হয় তোর এঁটো খেয়ে নেবো।'

একেবারে বাল্যকাল থেকে রত্না ও মল্লদের এখানে যাতায়াত করার জন্যে অনন্তর প্রতি এদের স্নেহ ভালোবাসার অন্ত ছিলো না। ফলে, রত্না বা মল্লর কোনো কথাই ওর কাছে কোনোদিন রূঢ় ব'লে মনে হয়নি। অনন্ত আঁচাবার জন্যে উঠে পড়তো, কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে তারকা বলে উঠতো, 'বেশ—বেশ—এঁটোকুটো খাবার বেলায় আমরা!' অনন্তর এঁটো খেতে তারার অবশ্য কোনোদিনই খারাপ লাগতো না, বরং মায়ের আগেই সে সব খেয়ে ফেলতো পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে মল্ল বলতো মেয়েকে, 'কী রে ঘি পরোটার লোভে তো বেশ চট ক'রে বসে পড়লি? এমনিতে, কারুর এঁটো গেলাসে জল খেতে বললে তো ধুয়ে খাস!'

সন্ধ্যেবেলায় অনন্ত বিছানায় ব'সে ব'সে মাঙ্গলিকগীতির বই পড়তো। আড় হয়ে শুয়ে তারা শুনতো মন দিয়ে। রত্না দুধ গরম করতে-করতে কোনো-না-কোনো মেলার গল্প শোনাতো, এই গল্পে তারার ঠিকমতো মাঙ্গলিকগীতি শোনা হোতো না, সে মাকে বলতো, 'আরে বাবা—বক বক বন্ধ করো—' তারপর অনন্তকে, 'ওই জায়গাটা থেকে আবার পড়ো—' রত্না চুপ করে যেতো। মেয়ের মনে দুঃখ দিতে নেই।

'আচ্ছা—তোরা শোন।' ব'লে পাড়াপড়শিদের নিয়ে রত্না বেরিয়ে আসতো। পড়তে পড়তে অনন্ত গান গেয়ে উঠতো, তারা তন্ময় হয়ে সেই গান শুনতো, তারপর গান শুনতে-শুনতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়তো।

পরের দিন তারা বিছানা ছেড়ে উঠতে রত্না বললো, 'ওঠ-ওঠ, এতো দেরি করলে কী ক'রে হবে—অনেক কাজ প'ড়ে আছে, কাল মেলা—'

তারা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়লো। অনন্ত তারাকে বললো,

'এতো হড়বড় করার কী আছে? আমিও না হয় তোমার কাজ ক'রে দেবো।'

রত্না অনন্তর কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লো, 'শোনো ছেলের কথা! তোর পাঠশালায় কী রান্নাবান্না করা শেখায় না কী?'

অনন্তও হেসে ফেললো। আসলে তারার প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্যে তার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। সে নিজেও জানে না তারার কোন কাজে সে সাহায্য করতে পারে। তারাও মজা পেয়ে ব'লে উঠলো, 'আমি রুটি বেলবো—তুমি বরং উনুনটা জ্বালো। পারবে তো?'

'আলবৎ পারবো।' অনন্ত মহা গর্বের সঙ্গে জবাব দিলো, এ আর এমন কি কঠিন কাজ—বাচ্চা ছেলেও পারে!'

সেদিন রান্না করতে বেশ দেরি হয়ে গেলো—তবুও মল্ল কিন্তু যথাসময়ে খেতে এলো না। সে ভরমাকে পাঠালো খবর দিতে, আজ আর সে খেতে যাবে না—অনন্ত যেন ব'সে না থেকে খেয়ে নেয়। ভরমা এসে কিন্তু বাড়ির ভেতর ঢুকলো না, বাইরে থেকে কথাটা ব'লে চলে গেলো। অনন্ত একবার ডাকলো, 'ভরমা—এসো—'

'না। কাজ আছে এখন।' জবাব দিলো ভরমা। এই সুযোগে অনন্ত-ও তারার পেছনে লাগার একটা ছুতো পেলো, 'উফ্! তোমার বর কি পাগড়িই না বেঁধেছে—যেমন পাগড়ি তেমন লম্বা দাড়ি—ধুতিটাও তেমনি একেবারে ছেড়ে-বাবার মতো পরেছে!' তারা জবাব দিলো, 'এতে হাসার কী আছে? ও তো আর তোমার মতো পাঠশালায় যায় না সেজেগুজে—আর ওকে যেমনিই দেখতে হোক ও আমার।'

'হুঁ! হনুমানের মতো দেখতে তায় আবার পাঠশালায় যাবে!' তারা মনে-মনে ক্ষুণ্ণ হোলো, অনন্ত তো ভরমাকে বাঁদর উপাধি দিতে পারতো, তা নয় হনুমান!

একটু পরেই অনন্ত খেতে বসলো। তারা পাতা-বোঝাই ক'রে

তরকারি দিতে, অনন্ত অবাক হয়ে বললো, 'এ তো? খাবো কী ক'রে?'

'আমি কী জানি!'

ব'লে তারা আড়চোখে দেখতে গিয়ে অনন্তর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতে—ছু জনেই হেসে ফেললো। বড়ো আশ্চর্য, সেই দৃষ্টি বিনিময়ে দু-জনেই এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হোলো সহসা। তারা রুটি দিয়ে অন্য কাজে হাত দিলো, কিন্তু অনন্তর আজ কিছু খেতে ইচ্ছে হোলো না, একবার মনে হোলো মাথাটা কেমন যেন বনবন করে ঘুরছে, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তারার চেহারাটা চোখের সামনে যেন কেমন ঘুরপাক খেতে লাগলো। তারা পাতে দই ঢালতে গেলে, অনন্ত মানা করলো, 'না—আর চাই না' তারা প্রশ্ন করলো, 'তাহলে খাবে কী দিয়ে?' অগত্যা অনন্ত জবাব দিলো, 'দাও তাহলে!' কোনো রকমে খাওয়া সেরে অনন্ত উঠলো। খেতে-খেতেও ওদের দু-একবার চোখাচোখি হয়েছিলো,—আর দু-জনেই দু জনের চোখের ভেতর মনের এক অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়ছিলো।

দুপুরে বাটনা বাটার সময় তারা গুণগুণ ক'রে গাইছিলো:

'পুতলি রাণী তুই কার মেয়ে....'

অনন্তও গানটা শুনলো, তারপর লিখে নিলো। সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ সবার সামনে অনন্ত গানটা গেয়ে উঠতে, তারা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো, কিন্তু অনাস্বাদিত এক রোমাঞ্চে শিউরে উঠলো বার বার। অনন্তর চতুরালীতে খুশি হোলো।

সন্ধ্যের দিকে সবাই গেলো মন্দিরে। গাঁয়ের নদী থেকে মন্দিরটা প্রায় এক মাইল দূরে—তবুও তারার উৎসাহে কিন্তু কোনো ভাটা পড়লো না। ওর সাজ পোশাক উজ্জ্বল চেহারা দেখে মনেই হোলো না যে গাঁয়ের মেয়ে। সঙ্গে ইংরিজি-স্কুলে-পড়া অনন্ত—ব্যাস, আর যায় কোথায়? সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো। মন্দিরের কাছে এসে ওরা দেখলো ইতিমধ্যেই অনেকে এসে গেছে। কুরুব ঢোল বাজাচ্ছে, একটু পরেই মাদিগর চামার দেবীকে নামাবে।

এইসব ঠিকমতো দেখতে গেলে মন্দিরের সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো দরকার, কিন্তু মুশকিল হোলো অনন্তকে নিয়ে, নতুন জুতো পায়ে সে ওখানে উঠতে পারবে না।

তারা বললো, 'অনন্ত তুমি জুতো এখানে রেখে যাও—আমি দেখবো।'

অনন্ত পালটা প্রশ্ন করলো, 'তাহলে তুমি ঠাকুর দেখবে কেমন ক'রে?'

'আমি তো অনেকবার দেখেছি—তুমি তো একবারও দেখোনি।'

অনন্ত, এরপর, তারকার জিম্মায় জুতো রেখে মন্দিরের সিঁড়ির ওপর উঠলো। মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে তারকাকেও দেখতে লাগলো। ইতিমধ্যে নাভিরাজকে নিয়ে রত্নাও এসে পড়লো, তারকা জুতো আগলাচ্ছে দেখে সে এক চামারকে ডেকে জুতোজোড়া রাখতে ব'লে—তারকাকে নিয়েই সিঁড়ির ওপর উঠতে লাগলো। ইতিমধ্যে দেবীকেও নামানো হয়ে গেছে—দেবীর চুল উড়ছে, হুংকার দিয়ে দেবী দৌড়ে আসছেন, তাঁর পেছনে চার চামার; কুরুবীর ঢোল বাজানো বন্ধ হয়ে গেছে, সে ভীত-চোখে দেবীকে দেখছে, সবাই হাত-জোড় ক'রে দেবীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। মল্ল ও আরো কয়েকজন ভেন ঘর থেকে দেবীর ভোগ নিয়ে এলো--দেবীগর্জনে মুখরিত হোলো মন্দিরের চত্বর। দেবী অতি দ্রুত ভোগ মুখে পুরতে গিয়ে এদিক-ওদিক পড়ে গেলো, একজন তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল এগিয়ে দিতে, কয়েকজন দেবীর মুখ ধুইয়ে দিতে গেলো—কিন্তু দেবী মুখ ধোয়াতে দিলেন না- আরও জোর হুংকার দিয়ে উঠলেন। দ্বিতীয় চামার একটা কম্বল এনে দেবীর গায়ে ফেলে দিলো। একটু পরেই দেবী কথা বললেন: 'হা হা হা! আমার কথা তোদের মনে ছিলো না এতোদিন? আমি তোদের ····হা হা হা····বিশ বছর আগে এই মন্দিরে কী হয়েছিলো তোদের মনে নেই?····' ভয়ের চোটে লোকে কান ধরলো। দেবী আবার গর্জন করলেন: 'বটে! আমি এখনো তোদের কিছু করিনি—তোদের

দাঁত ভেঙে দেবো—এই, তুই কে? সামনে এক সম্ভ্রান্ত 'গৌড়', সে তাড়াতাড়ি হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা করলো, 'আমার কী অপরাধ হয়েছে দেবী—আপনি ব'লে দিন, আমি শুধরে নেবো।'

এবার আর তোদের ক্ষেতে ফসল ফলবে না—তোরা কেউ বাঁচবি না। সারা গাঁয়ে লাস উজাড় হয়ে পড়বে.... ?

'আপনি আমাদের বাঁচান দেবী!' সবাই সমস্বরে প্রার্থনা জানালো।

'মড়া পোড়াবার কাঠ অবধি পাবি না তোরা....হু হু হু....'

ভবিষ্যৎ-বাণী ক'রে দেবী মাটির ওপর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বেজে উঠলো প্রচণ্ড জোরে। এক চামার কম্বল জড়িয়ে দেবীকে উঠিয়ে নিয়ে পালকির ওপর বসিয়ে দিলো। মানুষ দেবীকে দর্শন করার জন্যে পরিক্রমা-রত পালকির সঙ্গে সঙ্গে আনাগোনা শুরু করলো। ভক্ত-পূজারীর দল হাতে নারকেল ভেঙে এগোতে লাগলো। যুক্তিবাদী অনন্তও সবার দেখাদেখি হাত জোড় করলো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় চমৎকার চাঁদ দেখা দিলো আকাশে। মেলার আনুষ্ঠানিক নাট্যানুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবার কথা। সবাই এসেছে। অনন্ত-ও গল্প করার মেজাজে খোস গল্প শুরু করে দিয়েছে।

ভেতরে সবাই নানা কাজে ব্যস্ত। বাইরে অনন্ত, তারা ও আরো কয়েকজন গান গাইছে, গল্প করছে, কথা বলছে, ধাঁধাঁর প্রশ্ন-উত্তর বলছে। ধাঁধাঁর খেলায় হারুক-জিতুক—সবাই হাসছে। গ্রামের ধাঁধারুদের মধ্যে তারকা বেশ নামজাদা এবং চালাক—ফলে অনন্তকে হেরে যেতে হচ্ছে বার বার। অতঃপর, তারকাকে হারাবার জন্যে অনন্ত ওর ছোটো ভাইয়ের একটা বই নিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, 'জঙ্গলের মধ্যে পাথর, পাথরের ভেতর সোনা, সোনার মধ্যে জল—বলো তো কী?'

তারকা দুবার শুনলো, তারপরই জবাবটা দিয়ে দিলো। অনন্ত এবারও হেরে গেলো। নিয়ম অনুসারে হেরে গেলে কিল খেতে

হয়—অনন্তর কিল খাওয়ার সময় প্রায় এসে গেলো।

তারা ধাঁধা জিজ্ঞেস করলো আবার, 'লাল ঘোড়ার সওয়ার—এক রাজা নেমে গেলে আর এক রাজা ওঠে—কোন রাজা?' অন্য মেয়েরা তাকিয়ে আছে অনন্তর দিকে, যদি বেচারা জবাবটা দিতে পারে! না, অনন্ত এবারও জবাব দিতে না পেরে হেরে গেলো। এবং, হেরে গিয়ে শর্ত করলো তারকা যদি কিল না মারে, তাহলে সে একটা মজার গল্প বলবে। তারা তাতেই রাজি। এবার ভরমা আর তারাকে নায়ক-নায়িকা করে অনন্ত এমন এক মজার গল্প বললো যে তারাকে হার মানতে হোলো অবশেষে। গল্প বলার ফাঁকে, সবার অলক্ষে, অনন্ত ছোট্টো করে একট চিমটি কাটলো তারাকে, তারা অনন্তর মুখভঙ্গি দেখে না হেসে আর পারলো না। গত দু বছর ধরে তারার মনের মধ্যে যে গুমোট ভাব জমেছিলো, অনন্তর পাল্লায় প'ড়ে এই চার পাঁচদিনেই তা উধাও হয়ে গেলো।

অভিনয় শুরু হোলো। মন্দিরের সিঁড়ির ওপর যেসব 'গৌড়' জন আর সুধীজনের আসন—তারই মধ্যে গল্প অনন্তর জন্যে একটা জায়গা আগলে রেখেছিলো। অনন্ত বসলো সেখানে গিয়ে, আর তারা মেয়েদের মধ্যে ভরমা-ও এসেছিলো, কেননা এই জাতীয় অভিনয় দেখায় তার ভীষণ আসক্তি। সে বসেওছিলো প্রথম সারিতে। মঞ্চের ওপর এক একজন অভিনেতার অভিনয় শেষ হলেই দ্বিতীয় অভিনেতা প্রবেশ কবছে। পর্দার কাজ করছে একটা শাল। জনৈক দূত প্রবেশ করেই ইশারা করতে দু চারজন দর্শকদের ভেতর থেকে উঠে গিয়ে সেই শাল ধরলো দু দিক থেকে। এদের মধ্যে ভরমাও ছিলো—সম্ভবত অভিনেত্রীকে ভালো ক'রে দেখার জন্যেই ভরমা শালটা ধরেছিলো। এই অভিনেত্রীরাও আবার গাঁয়ের মেয়ে—কাজেই তাদের দেখার লোভ সামলানো শক্ত। যাই হোক, ভরমা শাল ধরতেই জনৈক অভিনেত্রীর প্রবেশ ও সংগীত শুরু হোলো—ভরমা তার দিকে তাকিয়ে রইলো এক মনে। দর্শকদের ভেতর থেকে এক যুবক দর্শক ভরমার উদ্দেশ্যে টিটকিরি কাটলো: 'বুদ্ধু! আগে

কখনো মেয়ে দিখিস নি না কী!' কথাটা শুনে আশপাশের সবাই হেসে উঠলো, এবং সেই মুহূর্তে অনন্তর চোখ পড়লো তারার দিকে। তারার ঠোঁটে চাপা রহস্যময় হাসি, সানন্দ আবার করুণ-ও। অভিনয়ের ফাঁকে-ফাঁকে, ওরা পরস্পরকে এইভাবে দেখা গেলো। চোখে চোখ রেখে ওরা বার বার একাত্ম হয়ে উঠলো, এক সুরে মনের বীণায় ঝংকার তুললো। এক আত্মার সঙ্গে অন্য আত্মার সঙ্গম হতে লাগলো বার বার। এইভাবে, কৃষ্ণ-সত্যভামা নাটকের শেষ দৃশ্য কাক-ভোরে শেষ হবার পর—অনন্ত আর তারা বিচিত্র এক অনুভূতি নিয়ে—একসঙ্গে বাড়ি ফিরলো।

সূর্যের তেজ একটু একটু ক'রে বাড়তে লাগলো। অনন্ত বিছানার ওপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে—রত্না আর তারা, তাদের ক্ষেতের বাড়িটায় যাবার জন্যে জিনিসপত্র ঠিক করছে—এমন সময় এক প্রতিবেশিনী এলো। রত্না তাকে যথাযথ অভ্যর্থনা জানালো। একথা সেকথার পর সে প্রশ্ন করলো, 'তারা—কবে যাচ্ছিস এখান থেকে ?'

তারা কিছু বলার আগে রত্না জবাব দিলো, কাল তো মেলা শেষ হোলো, সবে—আরও চার পাঁচদিন থেকে তারপর যাবে—ওর শ্বশুরবাড়িতে এখন তো আর তেমন কোনো কাজ নেই। কাল তুমি মেলায় যাও নি ?'

'গিয়েছিলাম। এখন তো তিন বছর অন্তর একবার হয়! তুমি যাও নি কেন ?'

ওরা সবাই গিয়েছিলো। কিন্তু সবাই গেলে বাড়ির কাজ করবে কে ? তাই আমি আর যাইনি।'

'এবারে নাকি খুব রোগ-টোগ হবে ?'

'মেলায় দেবী লগস্যা তো তাই বললো। এক একটা চিতেয় নাকি চারটে ক'রে মড়া উঠবে—কুকর্ম বেড়ে গেছে, এসব তো হবেই!'

'চিমমা বলছিলো—

'দোহাই—চিমমার কথা এ-বাড়িতে বোলো না! আমি এক

বলবো আর ও তার মানে করবে অন্য। মাঝখান থেকে যে কথা চালাচালি করে তারই হয় পোয়া বারো!' রত্না এইটুকু ব'লে একটু থামলো।

প্রতিবেশিনী জানালো, 'বউ মেলায় গেছে তো কী হয়েছে—চিমমাকে বোঝায় কে? আককা মেলায় যাবার জন্যে এতো ক'রে বললো—তবুও মা ওকে যেতে দিলো না।'

'তাই আককাকে দেখতে পাইনি মেলায়।' বাইরে বেরিয়ে আসতে-আসতে তারা বললো।

'গেলে তো দেখতে পেতে। তুমি গিয়েছিলে ব'লে চিমমা কী বলেছে—শুনেছো?'

'ন্ না তো। কী বলেছে?'

'শ্বশুর মারা গেছে এক বছরও হয়নি—এরই মধ্যে রঙ-ঢঙ করে তোমার মেলায় যাওয়া উচিত হয় নি।' আমি বললাম কমবয়েসী মেয়ে—কাঁহাতক আর বাড়িতে বসে থাকবে। কী হয়েছে একটু মেলায় গেলে?' চিমমা সম্বন্ধে এই জাতীয় কিছু টক-মিষ্টি-ঝাল আলোচনা হোলো।

তারা শুধু ওর মাকে বললো, 'দেখলে মা—তুমি আবার আমাকে বলছিলে আককাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে!'

এদের কথাবার্তা শুনে অনন্ত উঠে বসলো। প্রতিবেশিনীর কথাবার্তা তার মোটেই ভালো লাগে নি। এই জাতীয় কথা চালাচালির ফলে তারা এর আগে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে। সে একটু রূঢ়ভাবে প্রতিবেশিনীকে বললো, 'এখানে এসে ওদের কথা বলার দরকার কী? এতে তো ঝগড়া হবেই।'

'আমি কী ঝগড়া বাঁধাতে এসেছি না কী?' প্রতিবেশিনীও ঈষৎ অসন্তুষ্টভাবে জবাব দিয়ে চলে গেলো।

'অনন্ত, বাড়িতে-আসা-লোককে তোর এমন কথা বলা ঠিক হয়নি।' রত্না বললো।

জবাব দিলো তারা, 'কিন্তু আমাদের ব্যাপারে এদের এতো মাথা

ঘামাবার কী আছে? একে তো মিথ্যে কথা, বাজে কথা—তার ওপর আবার টক-ঝাল-লংকা!'

ওই দিন দুপুরবেলায় তারা তাদের ক্ষেতের দোচালায় গেলো। গোরু মোষগুলো ওখানেই ছিলো। মেলার জন্যে এই দুদিন ওরা গাঁয়ে থেকে গেলো। যেদিন ওরা ক্ষেতের বাড়িতে গেলো, তার পরের দিন দুপুরবেলায়, আমগাছের ছায়ার নিচে বসে অনন্ত আর তারা কথা বলছিলো। ওদের সঙ্গে—এক পাশে নাভিরাজও বসেছিলো। অনন্ত বই থেকে একটা গল্প প'ড়ে সহজ করে শোনাচ্ছিলো। তারা মাঝে-মাঝে বুঝতে পারছিলো না ব'লে আবার পড়তে বলছিলো। গল্প পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে অনন্ত হেসেও ফেলছিলো। অনন্তকে হাসতে দেখে নাভিরাজ-ও হাসছিলো।

গল্পের মাঝে একটা গীতিকবিতাও ছিলো। অনন্ত সুর করে যে গানটা গাইলো তার মর্মার্থ:

> বিদ্যুদের ঝলকাণির মতো, হাসতে হাসতে তুমি এলে। চোখে তোমার অনঙ্গ-শর, চাঁদের মতো মুখে লাজুক হাসি হেসে সহসা ঢিলে-হয়ে-যাওয়া আঁচলটাকে ঠিক করে নিলে। উর্বশী রম্ভা কিংবা মেনকা, তোমার মতো কেউ নয়। শুধু আমার সঙ্গে তুমি একটু কথা বলে যাও, বিকেলের এই পড়ন্ত বেলায়। নদীতে জল আনতে গিয়ে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম, প্রথম দর্শনেই আমার মনের আয়নায় তুমি সজীব হয়ে উঠেছিলে। তোমার অতলস্পর্শ চোখের গভীরে আমি ডুবে গিয়েছিলাম…

হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে অনন্ত যখন গানটা গাইছিলো, তারা যেন কোন ফাঁকে ওর আরো কাছে সরে' এসেছিলো। নাভিরাজ ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি—প্রাপ্তবয়স্কের অভিজ্ঞতা তার একেবারেই হয়নি। সে শুধু ওদের হাসি দেখে মাঝে মাঝে হাসছিলো।

অনন্ত বিভোর হয়ে গান গাইতে গাইতে কখন যে তারার হাতের ওপর হাত রেখে দিয়েছিলো সে নিজেই টের পায়নি। গান শেষ হবার পরও ওরা পরস্পরের আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়িয়ে বিলি কেটে খেলা করতে লাগলো। অনন্ত তারার দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ—দু জনে দু জনের চোখের দিকে হঠাৎ শিউরে উঠলো এক সময়। মনে হোলো

ওদের শরীরে যেন আর এতোটুকু শক্তি নেই। নাভিরাজ অবিশ্যি এসব কিছুই বুঝলো না। তারা গালের ওপর হাত রেখে অনন্তর গান শুনে গেলো একটার পর আর একটা।

এইভাবেই অনন্তর হাত একসময় তারার কাঁধের ওপর পড়তে, তারা আরো কাছে সরে এলো। অনন্তর হাত তারার পিঠের ওপর দিয়ে—চুলের ফাঁকে আশ্রয় খুজলো।

'নাভু—দিছু কী করছে একবার দেখে আয়তো।' তারা নাভিরাজকে পাঠিয়ে দিলো সেখান থেকে।

নাভিরাজ ওঠবার উপক্রম করতে, রত্নার গলা শোনা গেলো ভেতর থেকে, 'তারা—একবার এদিকে আয়তো, লাড্ডুটা ঠিকমতো বানাতে পারছি না।' আনমনা হয়ে তারা উঠে দাঁড়াতে—অনন্তর বইটা পড়ে গেলো। আবার ছু জনের দৃষ্টি এক হোলো।

ছু জনের চোখেই নেশার ছায়া, তারার হাঁটু ছুটো হঠাৎ কেঁপে উঠলো। সে ধীরে ধীরে চলে যেতে, অনন্ত শুয়ে পড়লো।

সেদিন, পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত গিয়েছিলো খুব মন্থর গতিতে। সন্ধ্যের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই শুয়ে পড়েছিলো। অনন্ত আর মল্ল শুয়েছিলো বাইরে। তারা আর রত্না ভেতরে। ওদের ছুজনের মাঝখানে নাভি। সেদিন রাতে তারার চোখে একেবারেই ঘুম এলোনা। বিছানার ওপর সে খালি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। মাঝে-মাঝে ঘুম ভেঙে যেতে, রত্না জিজ্ঞেস করলো 'কীরে এখনো ঘুমোসনি?'— 'এখুনি ঘুমটা ভেঙে গেলো।' কাক-ভোরে ঘুম ভাঙলো মল্লর। সে উঠেই গোরু-মোষের পরিচর্যায় লেগে গেলো। একটু পরে রত্না উঠে সকালের জলখাবার তৈরি করতে বসে গেলো। খাওয়া দাওয়া সেরে জমি চাষ করতে চলে গেলো মল্ল। রত্না তারাকে বললো, 'আমি গাঁয়ে গিয়ে গমটা পিষিয়ে আনি—'

'আমিও যাবো?' তারা জিজ্ঞেস করলো আনমনা হয়ে।

'কী দরকার? কাল থেকে তো শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যাঁতা ঘোরাতে হবে তোকে—এই চারদিন বেশ ছিলি এখানে—'

বলতে বলতে রত্না চলে গেলো। আশপাশে আর কেউ নেই। নাভি এখনো ঘুমচ্ছে।

তারা অনন্তর বিছানার কাছে এসে একটু কাশলো। ভাবলো অনন্ত বোধহয় কথা বলবে, কিন্তু অনন্ত তখনো ঘুমচ্ছে। ভোরবেলার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে। সারা রাত ধ'রে সেও দুপুরবেলার ঘটনাটা ভেবেছে। ভেবে-ভেবে অস্বস্তি 'বোধ করেছে। যতবার ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করেছে, ততোবার মনে এসেছে। দুচোখের পাতা এক হয়নি। কেন এমন হোলো বোঝবার চেষ্টা করেছে, মনের মধ্যে গোপন এক দুরভিসন্ধিও ঝলক দিয়েছে; পরক্ষণেই আবার মনে হয়েছে, না—না, উচিত হবে না। লেখাপড়া জানি, বুঝদার লোক—আমার পক্ষে উচিত হবে না তারার মতো গ্রামীণ, নির্বোধ মেয়েকে ঠকানো। যদি সে আগ্রহীও হয়—তাহলে তাকে অনাগ্রাহী ক'রে দেওয়া দরকার। এইসব ভাবতে-ভাবতে কাক-ভোরে ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো অনন্ত।

অনন্তর দিকে তাকিয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ অজানা এক ভয়ে ওর বুক কেঁপে উঠলো। তবুও অনন্তর প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব ক'রে সে দাঁড়িয়েই রইলো। ঘুমন্ত অনন্তর মুখটা বড়ো মিষ্টি দেখালো। বিছানার মধ্যে এক মাথা কালো চুলের মধ্যে মুখটাকে চাঁদের মতো মনে হোলো। চোখ নাক মাথা—যেন নিখুঁত কোনো ভাস্কর্য। ওর ফোলা ফোলা গাল দুটো তারার সব সময়েই বেশ ভালো লাগতো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে লাগলো। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠা-নামা করা অনন্তর লালচে ঠোঁটে চুমু খেতে ইচ্ছে হোলো ওর—ভাবলো চুলগুলোর মধ্যে ধিলি কাটি—অনন্তর মুখটা সে আরও ভালোভাবে দেখতে লাগলো। এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন তার গায়ে আবার কাঁটা দিয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে সে পিছু হাঁটতে লাগলো। প্রথমে আস্তে। তারপর দ্রুত।…নাভিরাজকে জাগিয়ে দিলে হয় এখন। তবুও, চৌকাঠ অবধি এসে সে থেমে

দাঁড়ালো। নাভি-কে এখুনি জাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা উঠে গেলো। আনমনা হয়ে সে আবার ফিরে এলো অনন্তর বিছানার কাছে—তারপর কখন যেন ওর পায়ের কাছে এসে বসে গেলো। কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে কোমল হাত দুটি অনন্তর পায়ের ওপর রেখে সে কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাক দিলো : অনন্ত!

তারার আর্দ্র কণ্ঠস্বর কানে যেতে অনন্ত জেগে উঠলো। চোখ খুলতেই তারাকে দেখতে পেলো সামনে।

'কী ব্যাপার অনন্ত? কোন কথা বলবে ঠিক করতে না পেরে তারা অসংলগ্ন এই প্রশ্নটি করে ফেললো।

অনন্ত চোখ কচলালো! তারাকে পায়ের কাছে ব'সে থাকতে দেখে একটু সরে গেলো। মল্লর বিছানাটা খালি—অনন্ত সেইদিকে তাকালো দেখে তারা বললো, 'ঘরে কেউ নেই।'

'কোথায় গেছে সব?'

'বাপু ক্ষেতে। মা গাঁয়ে।' তারার কণ্ঠস্বরে প্রত্যাশা স্পষ্ট।

ভীষণ বিব্রত বোধ করলো অনন্ত। তারাকে এই মুহূর্তে উন্মাদিনীর মতো দেখাচ্ছে। মনে-মনে অনন্ত ভাবলো, না—এগোনো ঠিক হবে না। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে অনন্ত জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি মা'র সঙ্গে গেলে না কেন?'

তারা নিরুত্তর থেকে মুখ নিচু করলো।

অনন্ত আবার কথা বললো, 'এখানে এলে কেন তুমি?'

'কেন এসেছি? তুমিই বলো।' তারার গলায় মিনতি, দীনতা—একাকার হয়ে গেলো।

অনন্ত কি জবাব দেবে ঠিক করতে পারলো না। ভাবলো, বলে, 'তুমি এখান থেকে চ'লে যাও'—কিন্তু বলতে পারলো না। সে গম্ভীরভাবে শাল মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। শালের শেষ প্রান্তে ওর পা দুটো বেরিয়ে রইলো। শালের স্বচ্ছ আবরণের ভেতর দিয়েও অনন্ত তারাকে দেখতে পেলো। তারার মতোই উজ্জ্বল তারকার চেহারা। অনন্ত শাল ফেলে দিয়ে উঠে বসলো আবার, তারার

কাছ থেকে সরে বসার চেষ্টা করলো না। তারা আরো কাছে ঘেঁসে এলো। আরও আর্দ্র, নরম, মিনতিমাখা গলায় সে বলে উঠলো :

'চুপ ক'রে আছো কেন? কিছু বলছো না কেন?'

অনন্তর খুব ইচ্ছে হোলো রূঢ়ভাবে কিছু বলতে, কিন্তু তারার মুখের অবস্থা দেখে বলতে পারলো না। সেই মুহূর্তে দু জনেই দু জনের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তারকা দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে রেখেছিলো। অনন্তর কী হোলো কে জানে, সে আলতো করে টোকা দিলো তারার গালে। চেপে-ধরা ঠোঁট থেকে হাসি বেরিয়ে এলো, ও যেন অনন্তর মনের কথা ধরতে পেরে খুব খুশি হয়ে গেলো।

তারা কাঁপা-কাঁপা গলায় বললো, 'ভেতরে চলো।'

'নাভু?' অনন্ত জিজ্ঞেস করলো।

তারা চুপ করে গেলো। মুহূর্তে ওর মুখ থেকে সব রং উধাও হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। মনে হোলো প্রচণ্ড কোনো শক্তি তাকে যেন আকর্ষণ করছে। কী ভেবে বলে ফেললো আবার, 'ভেতরে চলো।'

'ভেতরে? কেন?' খুব অস্পষ্টভাবে অনন্ত কথা বললো।

তারকা চারদিকে চোখ ফেলে তাকালো ভোরের আকাশে তখনো ফ্যাকাশে চাঁদ।

সহসা অনন্ত মনে-মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। শরীরের সব রক্ত ত্রিম ত্রিম ক'রে নেচে উঠলো। বড়ো আশ্চর্য হয়ে গেলো সে। ঘন-ঘন দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। মনে হোলো, শরীরে যেন আর শক্তি নেই। প্রবল উত্তেজনায় তার মনে হোলো এই বুঝি সে পড়ে যাবে। অনন্ত একহাতে তারাকে টেনে ধরলো, অন্য হাত দিয়ে তারার কাঁধ, বুক অনুভব করতে লাগলো। তারা দুহাত অনন্তর মুখ ধরে তাকিয়ে রইলো—অনন্ত তারাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে যুগলবন্দী হোলো।

চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। বিবর্ণ-মুখ চাঁদ। সম্ভবত চুম্বনরত তারা—অনন্তকে দেখে ঊষা লজ্জারুণ হোলো। আকাশের পূর্বদিকে স্বাতী

নক্ষত্র জ্বল জ্বল ক'রে উঠলো। দূরে গাছের ওপর থেকে একটা পাখি ডেকে উঠলো।

এমন সময় 'তারা তারা' ব'লে ডাকতে-ডাকতে রত্নাকে আসতে দেখা গেলো।

13

সচেতন কোনো মানুষ যদি ভুল রাস্তায় যেতে চায়, তাহলেও সে পুরোপুরি যেতে পারে না। নানা কিছু সে তলিয়ে চিন্তা করে দেখে, এবং এইভাবেই সে চিন্তা করতে-করতে ভুল রাস্তার হদিশ হারিয়ে ফেলে। চেতনাপ্রবাহী নৈসর্গিক প্রভাব এ ক্ষেত্রেও মানুষকে প্রভাবিত করে ফেলে। সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে বিবেক বিচলিত হয়ে পড়ে। তবুও, মানুষ কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির দাস। এবং, এইটাই স্বাভাবিক। তাৎক্ষণিক ইচ্ছাপুরণের পরই সতী আর অসতী ইচ্ছারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখনই, বিবেকবোধ ফিরে আসে। যা কিছু করেছি—অন্যায় করেছি, আর করবো না—এই জাতীয় মানসিকতা আসে। অনন্তরও তাই হোলো।

বিছানায়, শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে, অনবরত এপাশ-ওপাশ করতে অনন্ত শুধু এইসব কথা ভেবে চললো। নিজেকেই নিজের কাছে বড়ো অসহ্য মনে হোলো। কেন হোলো এটা? রত্না কী টের পেয়ে গেছে? মল্ল যদি শোনে? তারার শ্বশুরবাড়ির লোক যদি জেনে যায়—তাহলে ওর কী দশা হবে? এমনিতে অবাঞ্ছিত বউ—যদি তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয় ওরা? মল্ল-রত্নার কী অবস্থা হবে তখন? নিজেকেই অপরাধবোধে পীড়িত করলো সে। ভগবানকে ডাকলো, 'হে ভগবান—তুমি তারাকে ভালোভাবে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দাও—কেউ যেন টের না পায় এ কথা'—তারা ওখানে সসম্মানে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হবো'।

এতোটা ভাবার পরই, অনন্তর আর এক ভাবনা শুরু হোলো। তারকা স্বামীর সঙ্গে থাকলে সুখে থাকবে তো? যদি না থাকে— তাহলে আমি কী সুখী হ'তে পারবো? না। কিন্তু কেন? আমার তৃপ্তির জন্যে তো ওকে সারাজীবন দুঃখী থাকতে হবে। না, তা কেন হবে? তারচেয়ে তারা সুখী থাকুক সারাজীবন। আমি যদি— দুঃখে মারাও যাই কোনো ক্ষতি হবে না। আমি মরলে কী তারা সুখী হবে? তাই বা কেমন ক'রে হবে? তবুও—দুঃখী হয়ে থাকার কোনো দরকার নেই ওর। ও সুখে থাকুক, সারাজীবন হাসিখুশি থাকুক, কিন্তু—কিন্তু কেমন ক'রে?

এখান থেকে অনন্ত আর একটা চিন্তাসূত্র আবিষ্কার করলো। কী হবে এতো সব ভেবে? যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু—কাল যদি আমার বউ এইসব জানতে পারে—তাহলে আমার সম্বন্ধে তার কী ধারণা হবে? ছিঃ! কিন্তু বউ কী ভাববে না ভাববে ভেবে আমার লাভ কী? তাকে কী আমি সত্যিই বউ ব'লে মনে করি? আর এটাকে বিয়ে বলে নাকী? ছোটোবেলায়, পুতুল-বিয়ের মতো একটা ব্যাপার। আবার এমনও হতে পারে আমি যেমন আর একজনের সঙ্গে—সে-ও হয়তো আর একজনের সঙ্গে—? না, তা হতে পারে না। মনে হোলো, নতুন কোনো লোক—যে তাদের বিয়ে দেখেছে ছোটোবেলায়, দেখেছে অনন্ত স্ত্রীকে কীভাবে গ্রহণ করেছে—সে যেন সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। খুবই ভয় পেলো অনন্ত; সে যেন নতুন লোকটির সামনে আত্ম-ধিককারে কুঁকড়ে যাচ্ছে!

সকালের রোদ আস্তে আস্তে কড়া হয়ে উঠলো। তবুও রোদের নরম স্বাদ এখনো কাটেনি। তারকা বাসন মাজতে বসেছে খুবই খুশি মনে। অন্যদিনের মতো সে অনন্তকে জাগিয়ে দেয় নি আজ। অনন্তর মুখোমুখি হতে কেমন যেন লজ্জা করছে। রত্না গাঁ থেকে ফিরে আসার পর থেকেই চুপচাপ, গম্ভীর। মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে। মা মেয়ে, একান্ত দরকার ছাড়া, কোনো কথা বলছে না। গম্ভীরমুখ চোখ দেখে

মা'র সঙ্গে কথা বলার সাহস হোলো না ওর। মনে-মনে তারকাও একটু বিচলিত। মনে হচ্ছে যেন ভীষণ কোনো অপরাধ করেছে সে। মা বোধ হয় দেখে ফেলেছে সব। যার জন্যে মা কথা বলছে না রাগে। কথাটা ভেবে ভীষণ লজ্জায় তারা যেন কেঁপে উঠলো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। যন্ত্রণায় চোখে জল এলো—পাছে মা দেখতে পায়, তারা বাসন মাজতে-মাজতে মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে নিলো। হঠাৎ, রত্না বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'অনন্ত এখনো ঘুমচ্ছে! ব্যাপার কী? রত্নার কণ্ঠস্বরে তখনো গাম্ভীর্য।

তারা, একটু থেমে জবাব দিলো, 'কি জানি—বুঝতে পারছি না তো। এই সময় তো ও জেগে ওঠে।' তারার মুখে ভয়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট। কিন্তু আজীবন গাঁয়ের মেয়ে—সূক্ষ্ম ভাবান্তর লক্ষ করা রত্নার পক্ষে অসম্ভব। রত্না এবার সোজা অনন্তর বিছানার কাছে গিয়ে ডাক দিলোঃ অনন্ত!

চোখ রগড়ে অনন্ত উঠে বসলো। চোখ তুলে তাকালো না।

রত্না জিজ্ঞেস করলো, 'কীরে এখনো ঘুমচ্ছিস? রাতে ঘুম হয়নি—না? তোর তো আর বাইরে শোয়া অভ্যেস নেই—আর একটু ঘুমোবি না কী?'

'ন্‌না।'

'আমি ভাবছিলুম এখনো ঘুমচ্ছিস—নিশ্চয়ই শরীর খারাপ লাগছে। ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরবি—তা না, তোকে তো বারণ করলে শুনবি না। সেই ঠাণ্ডা জলে চান করবি—অসুখ বিসুখ নিয়ে ঘরে ফিরলে তোর মা আমাকে কী বলবে! মেলা-ফ্যালা চুকে গেছে—তোকে কিছু লাড্ডু বানিয়ে দিচ্ছি—তুই বরং সুস্থ থাকতে থাকতে বাড়ি যা।' ব'লে রত্না নিজের কাজ করতে চলে গেলো। অনন্তও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

তারা মা'র কথা শুনে ভয়ে-ভয়ে বললো, 'আরো দিন চারেক থাকুক না। আমি তো বুধবার চলে যাচ্ছি — অন্তও না হয় ওইদিনে যাবে। এতোদিন পরে এলো—বার বার তো আসে না—তাছাড়া

ইসকুল থেকে ছুটিও পায় না—'

'তুই-ই বা বুধবার অবধি কেন থাকবি? কাল সোমবার—কালই না হয় তুই চলে যা। ঘরে শাড়ি আছে—মেয়েকে ঘরে রেখে—তার চেয়ে ও যেখানে খুশি তোকে রাখুক!' মা'র কথার ভাব তারা ঠিক বুঝতে পারলো না। মাথা নিচু ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

বাইরে বসে অনন্ত-ও বেশ ঘাবড়ে গেছে। রত্না বোধহয় ওদের 'ওই অবস্থায়' দেখে ফেলেছে। সে আবার মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লো। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে ইচ্ছে করছে না। পাশের আমগাছে বসা কাক দুটোও যেন ব্যঙ্গ করছে ব'লে মনে হোলো অনন্তর। এইভাবে আরো ঘণ্টা দুই কাটলো। গোয়ালঘরে রত্না একটা মোষের সঙ্গে নিজের মনে কথা বলছিলো—তারা বাইরে থেকে কথার আওয়াজ শুনেও কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলো। ভয়-ভয় সেই চেতনায় ভরমার লাল চোখ দেখতে পেলো সে। এই মুহূর্তে কোন কাজ করা যায় সে ভেবে না পেয়ে চান করার জল গরম করার জন্যে উনুনে কয়লা দিতে বসলো। আগুনের গনগনে আঁচটাও কেমন যেন রাগী-রাগী। চান করার ঘড়ায় জল ঢালতে গিয়ে বড়াটা ফেলে দিলো ধপ ক'রে। গোয়াল থেকে রত্না চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী ফেললি রে?' রত্নার গলা শুনে তারা ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো এবার। রত্না তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো গোয়াল থেকে। মা'র সঙ্গে মুখোমুখি হতে তারা আর পারলো না, মা'কে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললো।

রত্নারও চোখে জল। ধরা-ধরা গলায় রত্না বললো, 'পাগলি! আমি কী তোকে থাকতে বারণ করেছি? আসলে, তোর শাশুড়ি নানা জনের কাছে নানা কথা বলছে—এইজন্যেই তোকে কাল চলে যেতে বলেছি।' মেয়ের চোখ মুছিয়ে দিলো রত্না।

তারার মনে সাহস এলো, জিজ্ঞেস করলো, 'কী নানা কথা বলছে আমার শাশুড়ি?'

'রাস্তায় চাঙ্গলাবুড়ির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। তোর শাশুড়ি ওর সামনে আমাকে বেশ দু কথা শুনিয়ে বললো, পুজোপার্বণ তো

মিটে গেছে—মেয়েকে পাঠাবে কবে? পনেরো দিন হয়ে গেলো এখনো আসার নাম নেই—আর আমি খেটে-খেটে মরছি, হাড় পাঁজরা এক হয়ে যাচ্ছে—আর মেয়ে এসেই বা কী করবে—এসে তো টং-এর ওপর বসে থাকবে!'

কথাটা শুনে শাশুড়ির ওপর রাগে তারার মুখ থমথম করে উঠলো। রত্না এবার ব্যাপারটা হালকা করার জন্যে মেয়েকে বললো, 'যেতে দে ও সব কথা!'

কথাগুলো শুনে অনন্ত প্রাণ ফিরে পেলো। চিমমার জন্যেই তাহলে রত্না এতোক্ষণ গম্ভীর ছিলো। অনন্ত আস্তে আস্তে ভেতরে এলো। তারা ঈষৎ সংকোচে জল এগিয়ে দিলো। কিন্তু, অনন্ত আবার কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে গেলো নদীতে চান করার জন্যে। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানা পাতলো লেখাপড়ার জন্যে—কিন্তু লেখাপড়ায় মন বসলো না। বার বার উদাস হয়ে যেতে লাগলো ভয়ানক কোনো সমস্যায়। বিকেলের দিকে মল্ল এসে ওকে ডাক দিলো 'খাবার জন্যে, কিন্তু 'খিদে নেই' ব'লে অনন্ত মল্লকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। মল্ল আশ্চর্য হয়ে বললো, 'তোদের মন মেজাজ বোঝা ভার—এই নিয়ে আমার তিনবার খাওয়া হোলো, আর তোর কিনা খিদেই নেই। আসলে তোরা ঘনঘন চা খাস ব'লে খিদে মরে যায়। বিশ বছরের জোয়ান ছেলে—আমাদের গাঁয়ে তোর চেয়ে ছোটো ছেলেটা অবধি তোর চেয়ে অনেক বেশি রুটি খায়?' এইসব ব'লে মল্ল খেতে বসলো।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। অনন্ত আমগাছের নিচে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে দেখে রত্না কাছে এসে ওর কপালে হাত দিলো। বললো, তোর মুখ চোখ এমন শুকিয়ে গেছে কেন? জ্বর আসেনি তো? তারার জন্যে জল গরম করছিলুম তুইও গরম জলে একটু গা ধুয়ে নে—শরীরটা হালকা লাগবে। রাত্তিরে বরং তুই আমার কাছে শুস—বাইরে শোয়াটা তোর বোধ হয় সইছে না।' বলে চলে গিয়ে রত্না আবার ফিরে এসে বললো,

'গাঁয়ে আজও বেশ ধুমধাম হবে। যদি গাঁয়ে যাস তো ভরমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসিস—চিমমার সঙ্গেও একটু কথাটথা ব'লে আসিস—একই জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকলে সময় কাটতে চায় না—তুই বরং একটু ওদের কাছ থেকে ঘুরে আয়।'

'ওখানে গিয়ে কী করবো? ওদের বাড়িতে গেলে তো কেউ একটু হেসেও কথা বলে না—এক কাপ চা-ও এগিয়ে দেয় না—'

'তবুও একবার আধবার যেতে হয় রে পাগলি! চট ক'রে কী কারুর মনের নাগাল পাওয়া যায় রে?'

'কারুর মনের নাগাল পেয়ে আর কাজ নেই! ও কাজটা বরং তুমিই কোরো! আমি ব'লে তাই চুপ করে আছি—অন্য কেউ হ'লে মজা দেখিয়ে দিতো—হুঁ!' তার মা'র কথার প্রতিবাদ করলো।

তারার কথা শুনে অনন্ত মৃদু হাসলো।

14

যেদিন তারার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা, সেদিন রত্না খুব ভোরে উঠলো। মেয়ের জন্যে চানের জল গরম ক'রে ভাত বসিয়ে দিলো। তারার চানের পর নতুন একটা শাড়ি এগিয়ে দিলো। সূর্যি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারার খাওয়া শেষ। রত্না—তারার শ্বশুর-বাড়ির পাড়ার লোকজনদের মধ্যে বিতরণ করার জন্যে ডিবে ভরে গোটা একান্ন লাড্ডু দিলো—আর দিলো কিছু গুঁজিয়া। তারকা যাতে আলাদাভাবে খেতে পারে—সেইজন্যে আর একটা কৌটোয় আরো কিছু মিষ্টি ভ'রে দিলো। আবার গিয়েই যাতে হেঁসেল ঠেলতে না হয়, সেইজন্যে এক বেলার মতো ওদের ঘরশুদ্ধু লোকের খাওয়া একটা চুবড়ির মধ্যে রত্না সাজিয়ে দিলো। এইসব নিয়ে একটা গাঁটরি তৈরী হোলো, আর, আর একটা গাঁটরি তৈরী হোলো

তারার কাপড়-চোপড় জড়ো ক'রে। প্রতিবেশিনী একটি মেয়ে আর নাভিরাজ—দু জনে মিলে তারাকে, নতুন কাপড় পরিয়ে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে ব'লে ঠিক হোলো। পুরোনো কাপড়ে যাত্রা নাস্তি—অশুভ। এইসব তোড়জোড় করতে করতে বেলা বেড়ে চললো। চোখভরা জল নিয়ে তারা মা বাপকে প্রণাম করতে গেলো। অনন্তও দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে। অনন্তকে নমস্কার করতে, আবার চোখাচোখি হোলো ওদের। তারকার চোখের মধ্যে অনুক্ত আর্তি ফুটে উঠলো। সে এবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লো। এমন সময় এক চামারকে মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে আসতে দেখা গেলো। চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিলো রত্না—সে হঠাৎ মেয়েকে ডাক দিলো, 'তারা—ফিরে আয়!' চামারটা সামনে দিয়ে না এসে, পেছন দিককার রাস্তাটা দিয়ে আসায়—বাধা পড়েছে! ফলে, তারা ফিরে এসে বসলো খানিকক্ষণ—তারপর আবার হাঁটা দিলো। এরপর, অবশ্য আর 'বাধা' পড়েনি, তবুও রত্নার মনে একটা খটকা লেগে রইলো।

চিমমাদের বাড়ি এসে ওরা দেখে চিমমা ঘরে তালা ঝুলিয়ে ক্ষেতে যাচ্ছে। মল্ল একটু রেগে গেলো। চিমমা বললো, 'এসে পড়েছো তোমারা? ভাবছিলুম তোমরা আসবে না—এই ভেবে ক্ষেতে চলে যাচ্ছিলুম।' এই ব'লে চিমমা তালা খুলে দিলো।

মল্ল জবাব দিলো, 'কেন—গতকাল তো খবর পাঠিয়েছিলাম।'

'তা পাঠিয়েছিলে, কিন্তু রাজ্যের কাজ পড়ে—আমি আর দেরি করতে পারছিলুম না—রোদ উঠে গেলে আমি আর কাজ করতে পারি না।'

'তারা করে দেবে।'

'হ্যাঁ—তারা আর করেছে! সবই আমার কপাল—মরবার সময়েও আমাকে কাজ করে যেতে হবে।'

মল্ল ঘরের ভেতরে এসে পরিবেশ হালকা করার জন্যে বললো, ছ্যাৎ! তোমাকে আর কাজ করতে হবে কেন? এদের সংসার

এখন এরাই দেখুক—তুমি স্রেফ খাওয়া দাওয়া ক'রে ঘুরে বেড়াও।'

'তাহলেই হয়েছে! যতক্ষণ খাটতে পারি—ততক্ষণই আদর। গতর খাটালে তবে খেতে পাবো—নইলে কে কার? আজকালকার বউ—বাবা!'

এবার আর মল্ল চুপচাপ থাকতে পারলো না। একটু ঝাঁঝিয়ে উঠে জবাব দিলো সে, 'যা খুশি বলে যাচ্ছো! বউ কী করবে—সবই তো শাশুড়ির হাতে।'

'তাই না কী? এইরকম করেই মেয়েকে তাহলে তোমরা শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছো! তাই আমার মুখে মুখে এতো চোপড়া—তাইতো বলি—এই পনেরো দিন ধ'রে বেশ ভালো ক'রেই গড়ে-পিটে দিয়েছো তাহ'লে!'

মল্ল এবার বোনকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'আহা—তুমি ভুল বুঝছো কেন?'

'আমি ভুল বুঝিনি। নিয়ে গেলে নববর্ষের সময়ে—তারপর এলো মঙ্গলবার, মেয়ে পাঠানো যায় না, তারপর এলো মেলা, ব্যাস, এদিকে ঘরের কাজ কে করবে সে খেয়াল রেখেছিলে?'

মল্ল উঠলো, 'তুমি তো এবার ঝগড়া করতে চাইছো দেখছি। তোমার সঙ্গে আমি তো ঝগড়ায় পেরে উঠবো না—আমি চলি।'

'আমি তো ঝগড়াটি। গাঁ শুদ্ধ সবাই বলে—তা জেনে শুনেও মেয়ের বিয়ে দিলে কেন এখানে?'

সত্যি সত্যিই ঝগড়া বাধাবার জন্যে চিমমা তৈরি হোলো।

মল্ল আর কথা বাড়ালো না। মনে মনে শুধু বললো, 'দেখেশুনে মাটি খেয়েছি—আর কী!'

চিমমা এবার তারার দিকে তাকালো, 'কী রে—তোরও এ-সব মনে ছিলো না নাকী?' ব'লে তারার আনা গাঁটরি খুলে দেখে নিলো, 'এসব আনলি কেন? উনি গেছেন এক বছরও হয়নি—ভরমা কী এখন থেকেই মিষ্টি খাবে নাকী? এইটুকু বোঝার মতোও আককেল নেই তোর?'

তারা নিরুত্তর, কিন্তু জবাব দিলো মল্ল :

'ভরমা মিষ্টি খাবে না তো কী হয়েছে? বাকিরা তো খেতে পারে। তোমরা খেতে পারো, চাকর বাকর, আরো পাঁচজনকে দিতে পারো—নইলে কষ্ট ক'রে এগুলো বানালাম কেন আমরা? সবার খাবার জন্যেই তো—'

'কে তোমাদের কষ্ট করতে বলেছে? এক বছরও হয়নি বুড়ো গেছে—আমার চোখের জল অবধি শুকোয়নি এখনো, নিজের মেয়েকে মিষ্টি খাওয়াবার জন্যে—যাও, এসব চাই না, নিয়ে যাও!' ব'লে একটা মিষ্টির কৌটো মল্লর সামনেই চিমমা আছাড় মারলো প্রচণ্ড রাগে।

'খুব বুঝদার হয়ে গেছো দেখছি!' ব'লে মল্ল এবার বেরিয়ে এলো। তারা মুখ নিচু ক'রে সব দেখে যাচ্ছিলো। মনে মনে ভাবছিলো, ওরা চলে গেলেই চিমমা এসব বললে পারতো। বাইরের ছেলের সামনে······ছিঃ ছিঃ, কী ভাবলো ছেলেটা। শাশুড়ি—ভারি শাশুড়িগিরি ফলাচ্ছি—গাঁয়ে যেন আর শাশুড়ি নেই উনি ছাড়া। লোকজনকে বসতেও বলে না—সব সময় হিংসেয় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—

চিমমা তারার উদ্দেশ্যে বললো, 'কী রে, তুই যে একেবারে বেগ্যোকাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইলি! বাপের সঙ্গে আবার চলে যাবার মতলব করছিস না কী? যা ভেতরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে আয়—আককা আমাদের জন্যে ব'সে আছে ক্ষেতে—'

রত্না, এদিকে, ওদের দোচালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঁয়ে যাবার পথটা লক্ষ করছিলো। এমন সময়, তারাকে যে দুটি ছেলে পেঁাছে দিতে গিয়েছিলো, তাদের হন্ত-দন্ত হয়ে ফিরে আসতে দেখা গেলো।

রত্না জিজ্ঞেস করলো, 'কীরে এমন দৌড়চ্ছিস কেন?'

'চা বেশি খাওয়া হয়ে গেছে মাসী!' গাঁয়ের ছেলে, তারাকে পেঁাছে দিলে একটু ভালোমন্দ খাওয়া যাবে—এই ভেবেই গিয়েছিলো।

রত্না ছেলেটির কথা শুনে অবাক হোলো, 'আজ কোনদিকে সূর্যি উঠলো যে তোরা এতো চা পেয়ে গেলি চিমমার বাড়িতে!'

একটু পরেই মল্লকে আসতে দেখা গেলো। মুখচোখ বেশ গম্ভীর। রত্না বুঝলো কিছু একটা হয়েছে। তবুও বললো, 'খুব চা-ফা খেয়ে আসছো বোধ হয়?'

মল্ল নিরুত্তরে, ঈষৎ বিব্রতভাবে তাকালো রত্নার দিকে। রত্না শংকিত হোলো, 'কিছু হয়েছে না কী?'

'হবে আর কি! ওই পুরোনো—পাঁচ ছ বছর ধরে যা দেখে আসছি তাই। একদিনও শান্তিতে থাকতে দিলো না কাউকে—তারা তো এক ফোঁটা মেয়ে। কেন যে বার বার চলে আসে এখানে—এখন বুঝি। তারার আর দোষ কী!'

রত্না বলে উঠলো, 'বুঝেছি—তর্কাতর্কি করে এসেছো। কিন্তু এই রকম যদি প্রায়ই তুমি তর্কাতর্কি করো তাহ'লে তো মেয়েটার ওখানে থাকাটাই যে দায় হয়ে পড়বে—সে খেয়াল আছে?'

'আরে আমি কী মিছিমিছি তর্কাতর্কি করছি না কী? চিমমা ছোটো বড়ো কথা শোনালো আমাকে।'

রত্না লম্বা ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'যাবার সময়ে রাস্তায় তোমার কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

মল্ল একটু ভেবে জবাব দিলো, একটা ভিখিরির সঙ্গে।'

'সর্বনাশ! ওটা কোথ থেকে এলো?

'তা কী ক'রে বলবো! রাস্তায় ভিখিরি থাকবে না—এটা কী একটা কথা হল? আমি ভাবছি মেয়ের কথা—'

দিন দুয়েক কেটে গেল। তিন দিনের দিন সকালবেলায় চিমমা পাড়ার একটি বউকে বললো তারা যে লাড্ডু এনেছিলো—সেগুলো রত্নাকে ফেরৎ দিয়ে আসতে। তারা অনিচ্ছা প্রকাশ করতে চিমমা বলে উঠলো, 'কে খাবে তোদের ওই লাড্ডু? এই লাড্ডু খাইয়ে তোরা এবার কাকে মারবার ফন্দি এঁটেছিস, কে জানে! তা না হলে—সবার জন্যে এক লাড্ডু হ'লে এ রকম আলাদাভাবে

বাঁধা-ছাঁদা কেন ?' স্বভাবতই তারা চুপ করে রইলো।

ভরমা কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিলো। তারা এক ফাঁকে ভরমার দিকে তাকালো। ভরমা-ও তাকালো। কিন্তু ওই তাকানোই সার—ভরমা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সঙ্গে সঙ্গে অনন্তর কথা মনে পড়লো তারার। অনন্তর কথা মনে আসতে তারা সহসা আনন্দিত হয়ে উঠলো, শরীরটা চকচক ক'রে উঠলো।

প্রতিবেশিনী মিষ্টির বোঝা নিয়ে রত্নার কাছে আসতে, রত্না একবার ভাবলো ফেরত দিই, তারপর মল্লর কথা মনে পড়তে ভাবলো, না ফেরত দিয়ে কাজ নেই—অশান্তি বাড়বে। কাজেই সে মিষ্টিগুলো ফেরত নিলো। কিন্তু, মনে-মনে রত্না নিজেকে ঠিক সংযত রাখতে পারলো না। দুপুরের দিকে গ্রামে, চিমমার এক আত্মীয়ার সঙ্গে দেখা হ'তে সে বলেই ফেললো, 'নিজেদের জানা-শোনা ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলুম—কী না করেছি এজন্যে—তবুও মেয়েটা আমাদের একরত্তি শান্তি পেলো না। সকালে উঠেই লাথি ঝাঁটা গালিগালাজ খায়। প্রথমে ভেবেছিলুম দু দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন দেখছি যতো দিন যাচ্ছে ততো বাড়ছে ব্যাপারটা। ভাবে, বোধ হয় মেয়ের হয়ে কথা বলার কেউ নেই! আজ আসুক মেয়ের বাপ বাড়িতে—তা ছাড়া আমার ভাই কুলকার্নি আছে—ওকে ব'লে চিমমার মজা দেখাবো আমি! নইলে, শুনেছো কখনো মেয়ের বাড়ির মিষ্টি ফেরত দিতে?' রত্না বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিলো।

রত্না যে গাঁয়ে ঢুকেছে—এটা চিমমাও কিভাবে যেন দেখে ফেলেছিলো। যার জন্যে রত্নাকে অনুসরণ ক'রে এসে, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে রত্নার সব কথাই সে শুনে নিয়েছিলো। ব্যাস, আর যায় কোথায়—চিমমাও এবার কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে লেগে গেলো। ওদের ঝগড়া শুনে পাড়া শুদ্ধু সবাই ছুটে এলো। কিন্তু কে কাকে থামাবে? শেষ অবধি চিমমা সগর্জনে বললো, 'আমার ছেলের আবার বিয়ে দেবো আমি—তোর মেয়েকে বাড়ি থেকে যদি তাড়িয়ে না দিই তো আমার নাম চিমমা নয়—দেখবো তুই কী করিস!'

সেইদিনই ভীমাপ্পার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে চিমমা ওর সব মনের কথা খুলে বললো। ভীমাপ্পাও সুযোগ বুঝে চিমমাকে উত্তেজিত করে দিলো। চিমমা অবশেষে বললো, 'এখন বাপু তুমি যা পারো করো, উনি মারা যাবার পর ছেলের ভালো-মন্দ এখন তোমার হাতে। আমি বলি কী তুমি ভরমুর আর একটা বিয়ে দাও এইবেলা—আমি একা, তার ওপর মেয়েছেলে—মল্ল যদি কোনো কারসাজি করে কিছু করতে পারবো না—বাড়িঘর দোর সব ওর দখলে চলে যাবে।' মেয়েকে দিয়ে চা করিয়ে ভীমাপ্পাকে দিতে-দিতে চিমমা আসল কথাটা বললো।

চা খাওয়া শেষ ক'রে, ভীমাপ্পা উঠলো, বললো, 'গাঁয়ে বসে' মল্ল এইসব করবে, হুঁ! আমরা রইছি কী করতে? আর বিয়ে? আরে, মেয়ের কী অভাব আছে? টাকা দিলে বাঘের চোখ পাওয়া যায়—বর্ষাটা যাক, তুলসার বিয়ের পরই একটা মেয়ে যোগাড় ক'রে আমরা ভরমুর বিয়ে দেবো—'

দরজা অবধি এগিয়ে দিতে দিতে চিমমা জানালো, 'সবই তোমার হাতে ছেড়ে দিলুম। টাকাকড়ির জন্য কোনো চিন্তা কোরো না।'

কালি পুজোর পরই ভীমাপ্পা পাঁচ ছ জায়গায় খোঁজ নিলো। চিমমাও খোঁজ খবর নিলো দু চার জায়গায়। যেখানেই যাক, ওদের একটা প্রশ্ন শুনতে হোলো সব জায়গায়; ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছি কেন? —ওরাও জবাব দিতে লাগলো সব জায়গায়; কী করবে।—পাঁচ ছ বছর হোলো ছেলেপুলে হোলো না। একটি মাত্র ছেলে। বাড়িতে খাওয়া পরার অভাব নেই। দুইবউ থাকলে কোনো অসুবিধে হবে না।—এইভাবে ওরা দু একজনকে পছন্দ ক'রেও এলো। পরে কিন্তু এদের কারুর কাছ থেকেই কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। ভীমা যাদের সঙ্গে কথা বলেছিলো, তাদের মধ্যে দু একজন এলেও, সব দেখেশুনে 'না' করে দিলো। গাঁয়ের কেউ না কেউ ভাংচি দিচ্ছে বা দিয়েছে এটা স্পষ্ট বোঝা গেলো। অবশ্য ভাংচি দেবার মতো কিছু ছিলো না। মেয়ে পক্ষ খোঁজ নিতে সবাই বললো,

'এখানে কেন মেয়ে দিচ্ছ বাপু? দু দিনও টিকতে পারবে না—আর যদি একান্তই মেয়েকে রাখতে না পারো তাহলে দড়ি কলসি কিনে দাও—মেয়ে অন্তত সুখে মারা যাবে!'

এদিকে, চিমমাও ব্যাপার দেখে একটু চিন্তায় পড়লো। ভাবলো, তারকা যদ্দিন এ বাড়িতে থাকবে—তদ্দিন কেউ মেয়ে দেবে না। অতএব, তারাকে তাড়াবার জন্যে চিমমা আরো বেশি করে ওর পেছনে লাগলো।

ভামাপপাও নানা জায়গা থেকে বিফল মনোরথে ফিরে এলো। এবং অবশেষে ভগবান ভরসা এই সান্ত্বনায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। লোকে এইসব দেখেশুনে বলাবলি করলো, 'লোকটা পাগোল হয়ে গেছে—একটা বউ আছে এই দেখে কোন লোক সেই বাড়িতে নিজের মেয়ে দেবে? মেয়ে কী কুমোরখানায় তৈরি হয় যে—এতো শস্তা? ভগবানের কী চোখ কান নেই না কী?'

এইসব কথা ভামাপপার কানে যেতে তার জেদ চেপে বসলো। ঠিক করলো যেভাবে হোক, এবিয়ে সে দেবেই। এইজন্যে সে এবার নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজতে ব্যস্ত হোলো।

চিমমার ছেলেকে দ্বিতীয়বার কেউ বিয়ে করবে না, এটা বুঝেই একজন পাড়াপড়শি বউ ঈষৎ ব্যাঙ্গের হাসি হেসে জিজ্ঞেস ক'রে ফেললো, 'বিয়েটা কবে হচ্ছে চিমমি? চিমমা মনে-মনে রেগে গেলেও মুখে বললো, 'হবে নিশ্চয়ই। আরে বিয়ে দেবার জন্যে সবাই তো পা বাড়িয়ে আছে—কিন্তু আমাকেও তো একটু ভেবে দেখতে হবে। বংশ-টংশ দেখতে হবে তো—তাছাড়া আমাকেও একটা মেয়ে পার করতে হবে—' চিমমার জবাব শুনে সেই বউটি ফোড়ন কাটলো, 'নিজের মেয়ের কথাও ভাবছো তাহ'লে?' ব'লে সে আর দাঁড়ালো না। চিমমার রাগে গা জ্বালা করে উঠলো, যেভাবেই হোক ছেলের বিয়েটা দিতে হবে।

গাঁয়ের সবাই যখন ব্যাপারটা জেনে গেছে—তারার মা বাবার কানেও কথাটা উঠবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? রত্না

ভীমাপপাকে উঠতে বসতে অভিশাপ দিলো, মাঝে-মাঝে বললো, 'ওরও তো মেয়ে আছে—আমার দুঃখ্যু বুঝলো না? ভরমুকে আবার বিয়ে দেবে বাচ্চা হচ্ছে না ব'লে—এতে আমার মেয়ের দোষ কী'? মেয়ের মুখ দেখলেই বাচ্চা পয়দা হয় না কী? মাথার চুল পেকে শাদা হয়ে গেলো—আহাম্মকটা এটুকু বুঝতে পারছে না?' মল্ল রত্নাকে শান্ত করতো, 'গালাগাল দিয়ে লাভ কী? মেয়ের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। বিধিলিপি খণ্ডাবে কে?' মল্ল আকারে-ইঙ্গিতে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতো এই বিয়ে হবে না। রত্না জবাব দিতো, 'তুমি পাগোল হয়ে গেছো! দেখো এই বিয়ে দিয়ে চিমমা ছাড়বে। আমার মেয়ের আর কেউ নেই—ওর অবস্থা পালক ছেঁড়া পাখির মতো।' মল্ল বোঝাবার চেষ্টা করতো, 'বললেই হোলো! বলি, আমার কী আত্মীয় স্বজন নেই—দেখি কে এই বিয়ে দেয়! আগুন জ্বালিয়ে দেবো বিয়ে বাড়ির ম্যারাপে—দেখবো কে মেয়ে নিয়ে যায় ওখানে!' মল্লর কথা শুনে রত্না ঠাণ্ডা হোতো, বলতো, 'যা করার এখন থেকেই করতে শুরু করো। চুপচাপ ব'সে থাকাটা ঠিক হবে না। একবার যদি বিয়েটা হয়ে যায়—পরে কিছু করতে পারবে না। দানা-না-থাকা ঘুঙুরের মতো চুপ ক'রে যেতে হবে।' মল্ল জানাতো, 'এতো তাড়াহুড়ো ক'রে লাভ নেই—ঠাণ্ডা মাথায় সব করতে হবে'

একদিন বিকেল বেলায় মল্ল বাড়িতে বসে—এমন সময় সে ভীমাপপাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলো। ভাবলো, ভীমাপপার সঙ্গে একবার কথা ব'লে দেখলে কেমন হয়? এমনিতে কোনো ঝগড়াঝাটি হয়নি—চারাগাছ লোপাটের পর থেকে শুধু কথা বন্ধ। বয়েসে যথেষ্ট বড়ো ভীমার সঙ্গে যদি কথা বলি, আমার ছোটো হবার কী আছে? এই ভেবে সে ভীমাকে ডাকলো, 'এসো একটু তামাক খেয়ে যাও।'

'না ভাই—দেরি হয়ে গেছে।' এই ব'লে ভীমা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

তবুও মল্ল না-ছোড়-বান্দা, বললো, 'কতো আর দেরি হবে?

এখনও তো দিনটা প'ড়ে আছে।'

ফলে, ভীমাপপাকে আসতেই হোলো। কম্বল বিছিয়ে খুব খাতির ক'রে মল্ল তাকে বসালো। ভীমাপপা বললো, 'এখানো তুমি ঘরে ব'সে? কাজ শেষ হয়ে গেছে?'

'কাজ আর শেষ হবে কী ক'রে। তাছাড়া বর্ষাও এলো ব'লে।'

এ-কথা সে-কথার পর চিমমা প্রসঙ্গ এলো। যেন কিছু জানে না প্রথমটা এই রকম ভাব দেখিয়ে ভীমাপপা পরে বললো, 'চিমমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! ওকে অনেক বারণ করেছি, বুঝিয়েছি এ-সব না করার জন্যে, কিন্তু শোনে নি।' কাশতে-কাশতে ছিলিমটা মল্লর দিকে এগিয়ে দিলো সে।

'চিমমা একা আর কী করবে? তবে, দুনিয়ায় এমন লোকও তো আছে যে দু কাপ চায়ের জন্যে চিমমা যা বলবে তাই করতে রাজি হবে। আবার চিমমিও এদের কথায় নাচে—'

ভীমাপপা মাথা নাড়লো, 'ও ডাকে তাই যাই—মানে যেতে হয়।'

এই সময় রত্না এসে পড়লো, কাঁখে ক্ষেত-থেকে-নিয়ে-আসা দুধের হাঁড়ি। ঘরে ঢোকার মুখে একটি বউয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো ওর, 'এরকম বাড়িতে কেউ মেয়ে দেয় সখ ক'রে? তবু যদি তোর দশটা বাচ্চা থাকতো! সকালে উঠেই বেচারাকে গালাগাল খেতে হয়—আর তো দেখা যায় না। মেয়েটাকে ঘরে এনে রেখে দে—আর পাঠাস নি—' বলতে বলতে বউটি রত্নার সঙ্গে ঘরের দোর অবধি এসে ভীমাপপাকে দেখেই লজ্জায় জিভ কেটে চলে যাবার চেষ্টা করলো।

ভীমাপপাকে দেখে রত্না শুনিয়ে-শুনিয়ে জবাব দিলো, 'ওর-ও তো একটা মেয়ে আছে। ওর মেয়েরও হাল একদিন আমার মেয়ের মতো হবে—দেখে নিস। এই দুনিয়ায় জ্বালালে নিজেকে জ্বলতে হয়—আজ আমার মেয়েকে কষ্ট দেবে, কাল তোমার মেয়ে কষ্ট পাবে—' বউটি যে ততক্ষণে চলে গেছে রত্না টের পায়নি, সে বলে চললো, 'ভীম-ও আমার মেয়ের সংসার ভাঙাবার জন্যে—' আরো কিছু হয়তো সে বলতো, কিন্তু ভীম বলে উঠলো:

'এ কী কথা রত্না! আমি কেন তোমার মেয়ের সংসার ভাঙবো?'

'জানি—জানি সব জানি। শাউখুড়ি ক'রে আর ভালোমানুষ সাজতে হবে না! পরশুদিন মঙ্গশূলি-তে কী ক'রতে গিয়েছিলে?'

হাতে-নাতে চোর ধরার মতো অবস্থা হোলো ভীমের। সে হেসে ব্যাপারটা হালকা করার চেষ্টা করলো, 'দূর! গেলেই কী আর বিয়ে হয়ে যায় নাকী? আরে, আমার নিজেরও তো মেয়ে আছে। চিমমার সারা গাঁয়ে বদনাম—তারা ও-বাড়িতে সব মুখ বুজে সহ্য করছে—চিমমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—দু চার দিন এদিক-ওদিক ঘুরে—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বিয়েটা কী এতোই সোজা?'

রত্নার তখন মাথা গরম হয়ে গেছে, বললো, 'সোজা-শক্ত জানি না—দিক না নিজের ছেলের দশটা বিয়ে! আমার মেয়ের খাওয়া পরার অভাব হবে না—আমি ওকে এখানে এনে রাখবো!'

ভীম ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

পরের দিন সকালে, কাউকে কিছু না ব'লে ভীম আর চিমমা মঙ্গশূলি গেলো। পাঁচ কান হলে পাছে বিয়েটা ভেস্তে যায়—এইজন্যে যথেষ্ট সতর্ক হোলো ওরা। মেয়ে দেখে পাকা কথা ব'লে ওরা সন্ধ্যের দিকে ফিরে এলো। ভীম বললো, 'যাক—নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। আর কেউ আটকাতে পারবে না এখন।'

'সবাই তো হোলো—এখন শেষটা ভালোয় ভালোয় হ'লে বাঁচা যায়।' চিমমা জবাব দিলো।

'শেষটা মানে? খরচপত্তর?

'না, না—খরচপত্তরের কথা ভাবছি না। ভাবছি মেয়ের কথা—'

'এতো ভাবনার কী আছে? তা ছাড়া—এরা তো লোক খারাপ নয়। আককাতায়ীকে এখানে না দিলে তোমার ছেলের বিয়ে হোতো কখনো?' ভীম এইভাবে চিমমাকে পুরো ব্যাপারটা সরল ক'রে বুঝিয়ে দিলো। চিমমাও চুপ করে গেলো।

গাঁয়ের কাছে এসে ভীম বললো, 'আমাদের একসঙ্গে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমি ক্ষেত ঘুরে যাই—আর তুমি ওই দিক দিয়ে—'

তারপর কয়েক পা গিয়ে, 'খুশি মনে যাও। একসঙ্গে তুই বিয়ের বাজনা—হেঁ হেঁ !'

'গাঁয়ের কাউকে কথাটা বলো না এখন।'

'পাগল !'

15

গ্রীষ্মকালের ভোরবেলায় ঝিরঝিরে হাওয়া আসতে, সারা-রাত ধরে-জাগা অনন্ত ঘুমিয়ে পড়ে। দরজা পার হয়ে রোদের ঝলক মুখে এসে পড়লে, তবে ঘুম ভাঙে। সর্ব্বাঙ্গে একটা নিস্তেজ ভাব সব সময়েই থেকে যেতো। মুখটা চিন্তাক্লিষ্ট, বিমর্ষ—সামনে খোলা বইয়ের পাতার উপর চোখ রেখে কি যেন ভেবে যেতো এক নাগাড়ে। মা তাগাদা দিলে বই বন্ধ ক'রে উঠতো, যন্ত্রচালিতের মতো স্কুলে গিয়ে—আবার ফিরে আসতো। পড়াশোনায় মন নেই, মুখে হাসি নেই, সর্ব্বদাই ভীষণ এক দুঃখে জর্জ্জরিত হয়ে থাকতো সে। মনে হোতো, আজীবন দরিদ্রের হাতে সম্পত্তি এসে হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে গেছে—আর সে এক মনে দেখছে হাতছাড়া সেই সম্পত্তি। এইসব ভাবতে ভাবতে মনে হোতো পড়াশোনা ক'রে আর কী হবে ? বিছানায় শুয়ে এইসব ভাবনায় ছটফট করতো অনন্ত। প্রদীপ জ্বলে যেতো। সুন্দরা জিজ্ঞেস করতো, 'অনন্ত—পড়া হয়ে গেছে ?' অনন্ত 'হ্যাঁ' বলে বিছানা থেকে উঠে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তো আবার। অনন্তর বাবা ভাবতো, ছেলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা—তাই বুঝি দিনরাত পড়ছে।

সুন্দরা মাঝে মাঝে রামীপপাকে বলতো ছেলের বউ আনার জন্যে, 'মাঝে মাঝে যদি যাতায়াত করে তো ছেলে বোধহয় খুশি থাকে।' রামীপপা জবাব দিতো, 'এতো তাড়া কীসের ? একটু বড়ো হোক না—তারপর না হয় নিয়ে আসবো।' এই ব'লে কথাটাকে চাপা দিয়ে সে নিজের দোকান আর ব্যবসার চিন্তায় ডুবে যেতো।

একদিন সুন্দরা আর কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো না। রাম বাড়ি ফিরতেই জিজ্ঞেস করলো, 'অনন্ত দিন দিন ওই রকম হয়ে যাচ্ছে কেন ?

'কী রকম হয়ে যাচ্ছে ?

সুন্দরা এ-কথার কী জবাব দেবে! খেতে-খেতে রাম নিজেই বললো সুন্দরাকে, 'সামনে পরীক্ষা, বিস্তর পড়তে হচ্ছে—তাই বোধহয় ওই রকম হয়ে যাচ্ছে।'

'পড়া ব'লে কেউ ও-রকম হয় না কী? সব সময় কী যেন ভাবে—সবার সঙ্গে খিটখিট করে।'

'ওহ্। আসলে বেশি প'ড়ে বেচারা একটু খিটখিটে হয়ে গেছে।'

'কী যে বলো!' একটু প্রতিবাদের সুরে সুন্দরা জবাব দিলো, 'গরমের ছুটির পর থেকে ও এইরকম হয়ে গেছে। সেই যে রত্নাদের ওখানে গেলো—তারপর থেকেই এইরকম হয়ে গেছে অন্তু। আমি বলি কী—আমাদের বউও তো বেশ ডাগর হয়েছে—ওকে এবার নিয়ে এসো।'

রাসাপপা অবিশ্যি সুন্দরার সঙ্গে একমত হোলো না।

এর সাত আট দিন পরে রাম দোকানে গিয়ে—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এলো। সুন্দরা বিস্মিত হোলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার?'

'দিন দুয়েকের জন্যে চন্দুর যাচ্ছি। রত্না খবর পাঠিয়েছে।'

চন্দুরের নাম শুনে অনন্তও কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলো; রাম তখন বলছে, 'আগামী শুককুরবার চিমমি ভরমার বিয়ে দিচ্ছে আবার। তখনই বলেছিলাম তারার বিয়ে ওখানে না দিতে—তা মল্ল আমার কথা শুনলো না।'

'ভরমার আবার বিয়ে কেন দিচ্ছে?' ভয়ে, অস্বস্তিতে, উদ্বেগে উতলা হয়ে অনন্ত প্রশ্ন করলো।

'বনিবনা হোতো না শাশুড়ির সঙ্গে—'

'তারা কোথায়?' অনন্ত প্রশ্ন করলো আবার।

'আর তারা ! বেচারার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেলো।' সুন্দরার চোখ জলে চিকচিক করে উঠলো।

রামেরও চোখে জল। হাত দিয়ে চোখের জল মুছে জবাব দিলো, 'পরশুদিন রত্না ওকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। চিমমা ওর ওপর খুব অত্যাচার করতো, লাথি-ঝাঁটা মারতো—খেতে দিতো না, পাড়া-পড়শিরা লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াতো ওকে—' বলতে বলতে রামের গলা ধরে এলো।

'চিমমি তো চিরকালই ওই রকম। কিন্তু তুমি গিয়ে আর কী করবে ?' সুন্দরা জানতে চাইলো।

'দেখি—ওখানে গিয়ে কী করা যায়। তাছাড়া, এখন যদি না যাই —তাহলে মল্ল কী ভাববে ! চিমমার সঙ্গে কথা ব'লে দেখি—যদি ব্যাপারটা মেটানো যায়, রত্নাও ছেড়ে কথা বলছে না ব'লে শুনলাম—'

এইসব ব'লে রাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলো। সুন্দরা খেয়ে যাবার কথা ব'লতে 'না' করে দিলো, বললো, 'অনন্তকে দিয়ে সন্ধ্যের দিকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে দোকান খোলাবে।'

রাম বেরিয়ে যাবার পর অনন্ত সুন্দরার উদ্দেশ্যে বললো, 'এই অবস্থায় তারা ওখানে থাকবে কী ক'রে ? ওকে তারচেয়ে আমাদের এখানে এনে রেখে দাও ' কথাগুলো ব'লতে ব'লতে অনন্তর মুখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ব'লে সুন্দরার মনে হোলো।

দু তিন দিন পরে রাম ফিরে এলো। সঙ্গে তারা। সুন্দরা ব্যগ্রভাবে জানতে চাইলো, 'কী হোলো শেষ অবধি ?' রাম চোখের ইশারায় কথাটা উত্থাপন করতে বারণ করলো। শুধু বললো, 'তারাকে কয়েকদিন এখানে থাকার জন্যে নিয়ে এলাম।' তারার মুখ আরক্ত, চোখ কান্নায় লালচে। সুন্দরার মুখের দিকে তাকাতেই জল গড়িয়ে পড়লো ঝরঝর ক'রে।

সুন্দরার চোখেও জল এলো। সে তারাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলো। তারপর, এক সময় ভেতরে গিয়ে তারা নিশ্চুপ হ'য়ে ব'সে পড়লো।

বিকেলের দিকে সুন্দরাকে ধীরে ধীরে তারা জিজ্ঞেস করলো, 'ছেলে কোথায়?' যে কোনো কারণেই হোক সুন্দরার কাছে 'অনন্ত' বলতে সংকোচ বোধ হয়েছিলো তারার। সুন্দরা জানালো অনন্ত স্কুলে গেছে—রাতদিন এক নাগাড়ে পড়া ক'রে যেতে হচ্ছে বেচারাকে। একটা বস্তা বিছিয়ে তারা আর সুন্দরা বসে রইলো। সুন্দরা মাঝে-মাঝে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে—তারা হুঁ হাঁ ক'রে জবাব দিয়ে গেলো।

স্কুল থেকে ফিরে এসে তারাকে দেখে, অনন্ত হেসে জিগেস করলো, 'তারা যে! কখন এলে?' তারা বিশেষ উৎসাহ দেখালো না, শুধু ঝকঝকে চোখে অনন্তর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'দুপুরে।' অনন্ত হয়তো আরও কিছু জিজ্ঞেস করতো, কিন্তু মা রয়েছে দেখে আর করলো না। আগে অবিশ্যি মা'র সামনে কোনো কথাই আটকাতো না, কিন্তু এখন যেন কেমন বিব্রত বোধ করে অনন্ত।

অনন্ত নিজের কামরায় চলে গেলো, কিন্তু তারার উদাস চেহারাটা বার-বার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। 'ছেলেবেলায় খেলার সাথী তারা—আর আজকের তারা—কতো তফাৎ! এইসব অনন্ত অনেকক্ষণ ধ'রে ভেবে গেলো। সেদিন রাতেও, সুন্দরা আর রামের মধ্যেও অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা হোলো।

'তারা কী বললো?'

'কিছু বলেনি। চুপচাপ ছিলো সারাটা দিন। চা দিয়েছি, খায় নি। জল পর্যন্ত ছোঁয়নি। তা—ওখানে গিয়ে কী দেখলে?'

'কী আর দেখবো!'

'বাচ্চা মেয়ে। অন্তুর চেয়ে মাত্র দু বছরের বড়ো। তোমরা কী ফয়সালা করলে? একসঙ্গে দুই বউও তো থাকতে পারে লোকের।'

'কী ক'রে থাকবে? পণের টাকা অবধি ওরা ফেরত দিয়ে দিয়েছে!'

'কত টাকা?'

'তিনশো।'

'মাত্র ? রত্না ননদের ছেলে ব'লে আরো টাকা খরচ ক'রেছিলো '

'ও-সব ব'লে আর লাভ কী ? এখন বরং তারাকে আমরা আরো ভালো কোনো বাড়িতে বিয়ে দেবার চেষ্টা করবো—এইজন্যে ওকে নিয়ে এলাম এখানে।'

'চিমমির ওপর কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না— ?'

সুন্দরা রেগে গেলো।

'বলার কোনো উপায় ছিলো না। তবে মল্ল আর—আরও কয়েকজন বিয়ে পণ্ড ক'রে দেবে ব'লে ঠিক করেছিলো, আমি গিয়ে মানা করলাম। ওভাবে বিয়ে আটকালে কী হবে—ওরা বাইরে গিয়ে বিয়ে করতে পারে—কাজেই কোনো লাভ হোতো না। চিমামকে ডেকে পাঠাই—কিন্তু আসে না—ফলে, সন্ধ্যেবেলায়, বাধ্য হ'য়ে কিছু লোক নিয়ে আমিই ওর বাড়িতে গেলাম।'

'তুমিই আগ বাড়িয়ে গেলে ?

'না গিয়ে করি কী ? ····· একটা কিছু করা দরকার। এরা কোনো কথা শুনছে না···'

'কথা শুনবে কী আবার ? ভুবনা মারা যাবার পর ভরমার হাতে তো একটা জামা কেনারও টাকা কোনোদিন চিমমি দেয়নি···'

বউয়ের কথা শুনে রাম খুশি হোলো। সত্যিই মেয়েরা খুব সমঝদার। সুন্দরা এবার জানতে চাইলো, 'তারার কী হবে এখন ?'

'কী আর হবে—খোঁজখবর নিয়ে ওর একটা বিয়ে দিতে হবে। ঘরে তো আর জোয়ান মেয়েকে রেখে দেওয়া যায় না। ওখানে ভরমার, আককার বিয়ে একসঙ্গে হচ্ছে—তাই তারাকে এখানে নিয়ে এলাম।'

'আককার বিয়ে ?'

'আককার বিয়ে ওই ঘরে না দিলে কী আর ভরমার বিয়ে হোতো।'

সুন্দরা সহসা খুশি হোলো, 'ভালোই হয়েছে—বউকে কষ্ট দিলে এবার মেয়ে কষ্ট পাবে ! আমাদের সোনার মতো মেয়ের কী হাল

করলো ওই হতচ্ছাড়ি !'

'রত্না বেচারা রাত দিন কাঁদছে। কী সান্ত্বনা দেবো ওকে ?' বোনের মানসিক অবস্থা রাম বোঝাবার চেষ্টা করলো।

'আমি তাহলে কাল যাবো। তারা তোমাদের রান্না ক'রে খাওয়াবে। অনন্তকে ব'লে যাবো তারাকে দেখাশোনার জন্যে।'

16

কথাটা অনন্ত জানতো না। ওকে বলা হয়নি। বললে ওর মানসিক অবস্থা কী হোতো বলা শক্ত। তবুও তারা আসার পর থেকে মনে-মনে সে একটু খুশিতেই থাকতো। পরের দিনই ওর মা চন্দুরে গিয়েছিলো—রত্নার সঙ্গে দেখা করতে। রাম চ'লে গিয়েছিলো দোকানে। ঘরে ছিলো শুধু অনন্ত আর তারা। নাভিরাজকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো সুন্দরা। তবুও অনন্ত ঠিক খোলা মনে কথা বলতে পারলো না তারার সঙ্গে। মনে-মনে কেমন যেন বিব্রত হোলো। ভাবলো, বেশি ঘনিষ্ঠ হ'লে আবার বোধহয় আপশোস করতে হবে। সান্ত্বনার জন্যে যেটুকু বলার দরকার—অনন্ত ঠিক ততোটুকুই বললো।

তু একদিন পর তারা একটু সহজ হোলো। মামা নেই—বাড়ির সব কাজই তাকে করতে হোলো। তারা বোধ হয় ভেবে নিয়েছিলো, অসহায় অবস্থার জন্যে তাকে সবার সঙ্গেই মানিয়ে চলতে হবে। ফলে, সে খুব মন দিয়ে বাড়ির কাজ ক'রে গেলো, মামাকে সময়মতো চা, খাওয়া-দাওয়া করানো, অনন্তর জন্যেও নিয়মিত খাওয়া দাওয়া—এই-সব কাজ সে সুন্দরভাবে ক'রে গেলো। তবুও, অনন্তর সাম্প্রতিক ব্যবহারটা কিন্তু তার কাছে ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

একদিন তুপুরবেলায়, অনন্ত স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'তারা—তুমি শ্বশুরবাড়ি কবে যাচ্ছো আবার ?' প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বুঝলো কথাটা জিজ্ঞেস করা ঠিক হয়নি। তারা কী ভেবে

বসবে কে জানে—কিন্তু অবাক কাণ্ড! অনন্ত যা প্রত্যাশা করেছিলো তা হোলো না, তারা হেসেই উত্তর দিলো, 'শ্বশুরবাড়িতে আর কেন মরতে যাবো?' তারার অন্তরঙ্গ হাসিতে স্পষ্ট বোঝা গেলো অনন্তকেই সে এখন আশ্রয়দাতা হিসেবে, এই বাড়িকেই সে এখন নিজের বাড়ি ব'লে ভাবছে।

তারার কথা শুনে বিপন্ন-বিস্ময়ে হতবাক হোলো অনন্ত। গাঁয়ের মেয়ের মুখে এ কী কথা! সহসা সেদিনের কথাটা মনে পড়ে গেলো ওর। সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে হোলো, তবুও বসে রইলো সে। কোনো ক্রমে বললো, 'ওহ্-তাই না কী?'

তারা মাঝখানের কামরার দরজাটা দিয়ে বাইরেটা একবার উঁকি মেরে দেখে নিলো, তারপর চোখ-ভরা জল নিয়ে প্রশ্ন করলো, 'তুমিও আমাকে তাড়িয়ে দেবে?'

অনন্তর মনও আর্দ্র হোলো। কি উত্তর দেবে ঠিক ক'রে উঠতে না পেরে বোকার মতো জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু কী করা যায়—?

'তুমি কী দুই বউ নিয়ে থাকতে পারবে না?'

'একজনকে ভালোবাসা যায়—কিন্তু দুজনের মধ্যে সেই ভালোবাসা কী ভাগ করা যায়? তোমাকে যা দিয়েছি—আর একজনকে তা কেমন ক'রে দেবো? আমার বিয়ে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে কী বিয়ে বলে কেউ?'

তারা অনন্তর কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। চুপ করে রইলো। অনন্ত এবার জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু হঠাৎ এসব কথা কেন?'

'কেন? তুমিই বলো!'

'আমি আর কী বলবো। দুই বউ—একী সম্ভব?'

'অসম্ভব কেন?' তারা হেসে ফেললো।

'ব্যাটাছেলে দুই বউ রাখতে, বা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু কোনো মেয়েব দুজন বর—একথা কোনোদিন শুনিনি! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

'মেয়েরা অবশ্য দুই বিয়ে করতে পারে না—কিন্তু ছেলেরা তো

পারে !'

তারা মিনতি জানিয়ে সহসা অনন্তর হাত ধরলো। অনন্ত বললো, 'এ কথা তোমার স্বামী জানতে পারলে—'

'স্বামী? আমার? কে আমার স্বামী?'

'কেন? ভরমা?

'এমনভাবে কথা বলছো যেন কিছু জানো না। ভরমা তো আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আবার বিয়ে করেছে।'

অনন্ত খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো। কথাটা শুনে অবশ্য সে খুশিও হোলো, তবু যেন বিশ্বাস হোলো না। মাথা চুলকে সে ব'লে উঠলো, 'সে কী? আমি তো কিছুই জানি না।'

অনন্তর মুখের দিকে তাকালো তারা, 'আমি কী তাহলে তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলছি?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অনন্ত জবাব দিলো, 'বাবা চন্দুর যাওয়ার সময় বলেছিলো ভরমা আবার বিয়ে করার চেষ্টা করছে—বাবা ওকে বোঝাবার জন্যে যাচ্ছে—তারপর তো আর আমি কিছু শুনি নি।'

তারাও অবাক হোলো, কিচ্ছু শোনো নি আর?'

'না। তোমার দিব্যি।'

'শোনো তাহলে, মামা চন্দুরে এসে আমার শাশুড়িকে অনেক ক'রে বুঝিয়েছিলো—কিন্তু কোনো কাজ হয় নি।' তারা সংক্ষেপে সব কথাই অনন্তকে শুনিয়ে দিলো।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে অনন্ত খুব অবাক হয়ে গেলো। কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোলো না প্রথমটা, তাই বোধহয় আবার জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি বলছো তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এতো মনমরা হয়ে থাকো কেন?'

তারার মুখ কালচে হয়ে গেলো প্রশ্ন শুনে, বললো, 'যেতে দাও এ-সব কথা।'

তবুও অনন্ত মনে মনে ভীষণ খুশি হোলো। গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে

যাওয়া-নদী প্রথম বর্ষায় যেমন টলটল ক'রে ওঠে—ঠিক সেইভাবে ওদের দুটি মন অনুরাগে টলটল করে উঠলো।

মাঝে মল্ল দু একবার এসেছিলো মেয়েকে নিতে, কিন্তু সুন্দরা পাঠায় নি। বলেছে, 'থাক না এখানে—তোমার ওখানে গিয়ে ওদের দেখে হয়তো মন খারাপ হয়ে যাবে।' মল্লও, তারাকে খুশি-খুশি দেখে আর দ্বিমত করেনি, বলেছে, 'থাকুক তাহলে। তোমারও যখন মেয়ে নেই—বউ এলে না হয়...'

অনন্তর কামরাটা পরিষ্কার করার দায়িত্ব ছিলো তারার। অনন্তর বইপত্তর ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে দিতো ব'লে অনন্ত প্রশংসা করতো। অনেক সময় দুপুরের দিকে, পড়া ছেড়ে অনন্ত আসতে পারতো না, তারা ওর কামরায় গিয়ে চা দিয়ে আসতো। চা দেওয়ার সময় চোখা-চোখি হ'লে দু জনেই হেসে ফেলতো, কখনো চা ছলকে পড়তো, তারা হেসে উঠতো খিলখিল ক'রে। হাসি শুনে ভেতর থেকে সুন্দরা জিজ্ঞেস করতো ভেতর থেকে, 'কী হয়েছে রে?'

অনন্ত জবাব দিতো, 'দেখেছো মা—আমার জামার ওপর চা ফেলে দিয়ে কেমন হাসছে!'

'আমার কী দোষ? নিজের হাত লেগে চা প'ড়ে গেছে—' কপট রোষে তারা তাকাতো অনন্তর দিকে।

একদিন সকালে অনন্ত লিখছে, মা ঢুকলো। এমনিতে সুন্দরা অনন্তর কামরায় বড়ো একটা আসে না। মা'কে দেখে অনন্ত লেখা বন্ধ করলো। মনে হচ্ছে, মা যেন কী বলবে। সুন্দরা বসলো অনন্তর পাশে, তারপর বললো, 'আমাদের তারার মতো মেয়ে হয় না, কি চমৎকার কাজকর্ম করে—কিন্তু বেচারার কপালটাই খারাপ।'

অনন্ত লিখতে-লিখতে প্রশ্ন করলো, 'কেন?'

'এতো রূপ, এতো গুণ থাকতেও বেচারা একটা ভালো বর পেলো না—আমার মেয়েরও এতো গুণ নেই!

'তোমার মেয়ে!'

'আরে, ইন্দিরার কথা বলছি। ভাবছি ওকে এই বেলা এখানে

নিয়ে এসে কাজকর্ম শেখাই—নইলে বড়ো হয়ে এলে—'

'কী দরকার? ওকে ওখানেই থাকতে দাও না।' 'এখানে নিয়ে এসে আবার কেন ঝামেলা বাড়াবে?'

ছেলের কথা শুনে অসন্তুষ্ট হোলো সুন্দরা। অনন্ত একটু মোলায়েম ক'রে বললো, 'তাছাড়া—ও এলে তোমার সঙ্গে বনিবনা হবে না। বউ এলে শাশুড়িরা সব দারোগা ব'নে যায়!'

'ওমা! শোনো ছেলের কথা—তুই কী ভেবেছিস সবাই চিনমার মতো?'

অনন্ত চুপ করে রইলো। সুন্দরা নিজেই জবাব দিলো:

'এখন তারা বেচারা কী করে বল দেখি? ওর বাবা তো মনের মতো একটা ছেলের খোঁজে এখানে-ওখানে ছুটে বেড়িয়ে পাগল হয়ে যাবার দাখিল হয়েছে। আজ ছ সাত মাস ধরে চোখে ঘুম নেই—দিন-রাত শুধু চেষ্টা করে যাচ্ছে।'

অনন্ত একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলো, 'তারার কী আবার বিয়ে দেবে না কী?'

'তা ছাড়া উপায় কী?'

'ওর বরের তো বিয়ে হয়ে গেছে আবার।'

'তা হবে না কেন? হাজার হোক পুরুষ মানুষ—মেয়েদের জীবন মাটির ঘড়ার মতো—একবার ছুঁলেই-ব্যাস, শেষ।'

অনন্তর বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। বোধহয় তারার সঙ্গে ওর নিজস্ব সম্পর্কটার কথা মনে পড়লো। সহসা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো, 'তারার যদি আর না বিয়ে হয়—তাহলে অসুবিধেটা কী?'

'ছিঃ! ও কথা বলতে নেই। বর না থাকলে কোনো মেয়ে থাকতে পারে? ওর কোনো ভালো বিয়ে হওয়া দরকার।'

'কেন?

'তুই আর এ-সব কী বুঝবি! লেখাপড়া ছাড়া আর কী বুঝিস তুই?'

সুন্দরা ঈষৎ ভৎর্সনার সুরে কথা ব'লে উঠে গেলো।

ওইদিন সন্ধ্যেবেলায় মল্ল এলো এনাপুর। তারার জন্যে একটি ছেলে দেখতে গিয়েছিলো। এনাপুর থেকে মাইল দশ-বারো-হীরাগিরি গ্রামে। বাড়ি পছন্দ হয়েছে মল্লর। এনাপুরে এসে সে মেয়েকে বললো, 'অকিবাটে বংশের ছেলে মা আর তুই ছেলে—এই নিয়ে সংসার। মা একদম বুড়ি—চোখে বোধ হয় ভালো মতো দেখতে পায় না। ছেলের নাম অপ্যনা—জমিজিরেৎ ভালোই আছে, চার-কামরার বাড়ি। আর কী চাই?' বাবার কথা শুনে তারার মাথায় যেন বাজ পড়লো।

বাইরে থেকে এসে অনন্তও শুনলো খবরটা। দেঁতো হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'ছেলে কেমন?'

'দেখতে ভালো। বয়েস তিরিশ পঁয়তিরিশের মধ্যে—'

'আগে বিয়ে যা হয়েছিলো?'

'বছর দশেক আগে হয়েছিলো। বউ মারা গেছে। অবিশ্যি বাচ্চা-কাচ্চাও নেই।'

'তাহলে লোকটা আবার বিয়ে করছে কেন?' অনন্ত প্রশ্ন করলো।

মল্ল অবিশ্যি এই ব্যাপারে কোনো খোঁজ-টোজ নেয়নি। একটু থেমে সে জবাব দিলো, 'আরে, ছেলেটা একদম বিয়ে করতে চায় নি। নিহাৎ মা'র পিড়েপিড়িতে—'

'তবুও একবার খোঁজ খবর নিন। একবার তো বিয়ে দিয়ে ভালো শিক্ষা হয়েছে—'

'তা যা বলেছিস! প্রথমবার কারুর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা না ব'লে হুট ক'রে বিয়ে দিয়েছিলাম। এখন আর সে ভুল করছিনা—এখন সবাইকে ব'লে ক'য়ে, দেখিয়ে কাজটা করছি।' মল্ল এইভাবে নিজের দায়িত্ব অন্যান্যের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করলো।

'তাহলে আর এতো তাড়া-তাড়ি কেন?'

'এতে আর তাড়াতাড়ির কী আছে? আমি চন্দুর যাচ্ছি—ওরা আবার তারাকেও দেখতে চায় একটু।'

কথাবার্তা শুনে অনন্ত চুপ ক'রে গেলো। পাশে দাঁড়িয়ে তারা-ও

অনন্ত যাতে আর কিছু না বলে সেজন্যে ইশারা করলো। এমনিতেই কী বলবে আর অনন্ত বুঝতে পারছিলো না, তারার ইশারা যেন বুঝতে পেরেছে, এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে সে চুপ হয়ে গেলো। সেদিন সারা রাত ধরে সে জেগে রইলো, ভোরের দিকেও ঘুমোতে পারলো না।

সকালে তারা এসেছিলো 'চলে যাবে' বলতে, কিন্তু কিছু বলার আগেই সে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। অনন্ত-ও নিশ্চুপ হয়ে রইলো। ওর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল তারার মাথার ওপর গড়িয়ে পড়তে, তারা মুখ তুলে তাকালো। ওদিকে মল্লও বাইরে থেকে ডাকাডাকি শুরু করলো। তারা বেরিয়ে আসতে, মল্ল এক ছড় হার ওর হাতে দিলো, 'এটা তোর মাসীর, পরে নে—কাল ওরা তোকে দেখতে আসবে।'

অনন্তর বাবাও চন্দুরে গিয়েছিলো। দিন তিনেকের মধ্যে সব পাকাপাকি করে এসে অনন্তকে বললো, 'সামনের রোববার তারার বিয়ে —তুই শনিবার ওখানে মা'কে নিয়ে চলে যাস—'

'আমি যেতে পারবো না। আমার পরীক্ষা সামনে।'

'তোর তো খালি পরীক্ষা! হুঁ! আমি দোকান ছেড়ে যাই কী ক'রে?

রাম রেগে গেলো ছেলের ওপর। ফলে অনন্তকে যেতে হোলো। তারা ও অনন্ত এসেছে দেখে খুব খুশি হোলো। এক গাড়ীতে স্ত্রী, অন্য গাড়িতে পুরুষ—সব গেলো হারোগিরিতে। মেয়েদের গাড়িতে ছই ছিলো একটু পরে 'অনন্তর রোদ লাগবে, বলে তারা ওকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিলো। অন্য মেয়েরাও অনন্তর গল্প শুনবে ব'লে আগ্রহ দেখালো—কিন্তু অনন্ত বসে রইলো চুপ করে। রাত একটার সময় ওরা এসে পৌঁছলো হারোগিরি। আলাদা একটা ঘরে ওদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে।

ঘণ্টা দুই তিন পরে ওদের জন্যে জল আর গুড় এলো, কিন্তু অনন্ত কিছু না খেয়ে—ঘরের এক কোণে বিছানার ওপর শুয়ে রইলো।

কিছু পরে আহারের বন্দোবস্ত হতে—অনন্তকে একজন ডাকতে এলো, কিন্তু 'খিদে নেই' ব'লে সে পাশ ফিরে শুলো। রত্না একটু উদ্বিগ্ন হোলো, তারকাকে ডেকে বললো, 'প্যাঁটরা থেকে লাড্ডু বের ক'রে দে ওকে—'

সবাই খেতে চলে গেলো। তারার অবশ্য খাওয়া নিষেধ বিধি অনুসারে। অনন্ত ভাবছিলো, 'যদি বিয়ে না হোতো আমার—তাহলে তারাকে আজ অনায়াসেই বেছে নিতে পারতাম। কিন্তু জীবনের মতো এই সুযোগ হারালাম—উঃ ভগবান—'

বাইরেটা একবার চট করে দেখে এলো তারা। ওর চোখ ভরা জল। অনন্তকে বললো, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

অনন্তর চোখও জলে ভরা। সে এবার তারাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। তারা তখনও বললো, 'একটা কথা শুনবে?'

অনন্ত ঘাড় নাড়লো।

'আজ রাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার আর আমার সব সম্পর্ক চুকে যাবে, যদি আমরা এখনো কিছু না করি।'

'কী করতে হবে, বলো।'

'বলবো?'

'হ্যাঁ।'

'কাজটা অবশ্য খারাপ।'

'খারাপ?'

'হ্যাঁ। লোকে বদনাম দেবে।'

'তাহ'লে?'

'কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই।'

'কেন?'

'জানি না। তবে এইটুকু জানি—এটা না করলে না মরা অবধি আমরা শান্তি পাবো না।'

'করলে—শান্তি?'

'হুঁ।'

'তাহলে—করবো।'

'তাহ'লে চলো—আমরা এখান থেকে চলে যাই।'

'কোথায়?'

'যেদিকে দু চোখ যায়।'

'তার পর?'

'আমার গয়না বেচে খরচ চলে যাবে।'

দুজনে এরপর চুপ করে বসে কি যেন ভাবতে লাগলো। অনন্ত আস্তে আস্তে ডাকলো 'তারা।'

'বলো।'

'তারপর?'

'চলা।'

'কিন্তু তারও পর।'

'পরের কথা পরে।'

অনন্ত জবাব শুনে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো। তারা বলতে লাগলো: আমি কাজ করবো। খেতে যদি একান্তই না পাওয়া যায়—তাহলে আমরা দুজনেই 'নদীর জলে ঝাঁপ দেবো।'

'হুঁ।'

'তাহলে ওঠো। চলো।'

কিন্তু অনন্ত উঠতে পারলো না। সে পাথরের মতো বসে রইলো। এইভাবে আরো কিছু সময় কাটলো। তারা অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ ধরে, পলকহীন চোখে বাইরে পেট্রো-ম্যাকসের আলো দপ দপ ক'রে জ্বলে যেতে লাগলো। তারা বললো, 'কী অনন্ত—সব ভুলে গেলে? ভুলে গেলে আমি এখনো বেঁচে আছি—শুধু তোমারই জন্যে?' নিসর্গীয় অধিকারে তারা কথা বলতে লাগলো।

অনন্ত তবুও, চুপচাপ বসে রইলো।

17

ওই দিন রাত এগারোটার সময় তারাকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হোলো। চারজন বিধবা ওকে চান করিয়ে দিলো। শাদা একটা ধুতি পরিয়ে পূজো-পাঠ করা হোলো। অপন্যা আগেই বসে গিয়েছিলো। অপন্যার বয়েস চল্লিশের এপার-ওপার। গায়ের রং সাধারণ কালো, পান খেলে ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে হয়ে যায়। ঈষৎ সরু কাঁধ—কিন্তু দেহটি বেশ মোটা। সে-ও ধুতি প'রে ভগবানের মূর্তির সামনে একটা চৌকির ওপর বসে মনে মনে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। তারাকে তার পাশে বসিয়ে দেওয়া হোলো।

পরের দিন সকালে তারাকে এক-গা গয়নাপরা অবস্থায় দেখা গেলো। সেদিন সবার নেমন্তন্ন। অপন্যা দৌড়োদৌড়ি ক'রে, প্রায় একাই, সব কাজ করে যাচ্ছে। বেশ প্রফুল্ল মনে হোলো ওকে। তারাও ঘরের ভেতর কাজ কর্ম করে যাচ্ছে। এমন সময় ছেলে-কোলে এলো সুমতি। ওর পুরোনো বান্ধবী।

সুমতি হাসলো, 'দাঁড়া, ছেলেটাকে রাখি।'

তারাও হাসলো। বিষন্ন হাসি। বললো, 'শূলে চড়লুম কেমন—দেখলি ?'

'একথা বলছিস কেন ?'

'কেন বলছি ? বুঝতে পারছিস না ?'

অনন্তর সঙ্গে তারার ব্যাপার-স্যাপার সুমতি অবশ্য কিছু কিছু জানতো। কথা ঘোরাবার জন্যে সে বললো, 'অনন্ত আজ খেয়ে-দেয়ে চলে যাবে বলছিলো।'

তারা বিপন্ন বোধ করলো, 'কেন—আর একদিন তো থেকে গেলে পারতো। না কী এই পাপী ঘরে সে আর থাকতে চাইছে না ?'

সুমতি বিব্রত বোধ করলো। বললো, 'কেন এসব ভাবছিস ?'

'এঁটো ফুল দিয়ে কী আর ভগবানের পূজো হয় ?'

. তারার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো।

ঠিক এই সময় অম্বা—তারার নতুন শাশুড়ি ঘরে ঢুকলো।

'কী করছিস রে?'

'তেমন কিছু না—মা।' ব'লে তারা আর সুমতি তাড়াতাড়ি সরে গেল।

দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়া সেরে অনন্ত চ'লে গেল। রত্না আর মল্ল অবশ্য বলেছিলো, 'কাল যাস আমাদের সঙ্গে।' কিন্তু অনন্ত শোনে নি। ওর যাওয়ার সময়, তারা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। তারাকে দেখে, অনুশোচনায় অনন্ত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করলো। ভাবলো, দৌড়ে পালিয়ে যাই সবার সামনে দিয়ে। কিন্তু কোনোরকমে, নিজেকে সংযত রেখে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। ও যাবার পর একটি বউ বললো, 'কাল থেকে বেচারা মুষড়ে রয়েছে—খাওয়া দাওয়াও করেনি ভালোভাবে।'

সুমতি ভাবলো বিচিত্র পুরুষ।

অনন্ত কডডুচি স্টেসনে যাবার জন্যে বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লো বাস ধরার জন্যে। তারপর, কি মনে করে হঠাৎ হাঁটিতে শুরু করলো।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর একটা বাস পেলো। আনমনা হয়ে সে উঠে পড়লো বাসে-এ। চোখ দুটো কেমন যেন জ্বালা-জ্বালা ক'রে উঠলো। রাত দশটার সময় বাস এসে থামলো কডডুচি স্টেসনে। স্টেসনে ঢুকে একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়লো সে।

শারীরিক কোনো কষ্ট নয়, অথচ ভয়ানক এক যন্ত্রণায় সে কুঁকড়ে গেলো বারবার। মনে হোলো জীবনের যাবতীয় সুখ সে নিজের হাতেই খুন করে ফেলেছে। অলভ্য কোনো বস্তু হাতে পেয়ে মগ্ন হয়ে ওঠার সময় অন্য কেউ সেই বস্তুটি কেড়ে নিলে মনের অবস্থা যা হয়--অনন্তর তাই হোলো। তাই কোনো জিনিষ খোয়া না গেলে মানুষ তার মর্ম বোঝে না। তারার সঙ্গে সেই রাতের সংলাপ মনে পড়লো। কেন, কেন সে রাজি হোলা না, অনন্ত কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না। আর আসবে না এই সুযোগ।

এইভাবে ভাবতে-ভাবতে রাত ভোর হয়ে এলো। সহসা অনন্তর

মনে পড়লো বাড়ি যেতে হবে। আর কিছু না ভেবে—আবার হাঁটতে লাগলো সে এনাপুরের রাস্তা ধরে। পাগলের মতো হেঁটে চললো সে। রাত জাগার জন্যে চোখ দুটো জবা-লাল। গায়ের জামা কাপড় মলিন।

সন্ধ্যের দিকে, সে অবশেষে বাড়ি এসে পৌঁছলো।

সুন্দরা ছেলেকে দেখে বিস্মিত হোলো। যখন শুনলো অনন্ত পরশু-দিন রওনা হয়েছিলো, তখন জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে আজ সারাদিন কোথায় ছিলি?'

'কড়ুচি স্টেসনে।'

সুন্দরা আরো অবাক হোলো 'সব কাজ ঠিকঠাক হয়েছে তো?'

অনন্ত আর কোনো কথা না ব'লে বসে পড়লো। সুন্দরা শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করলো, 'কী রে—তোর শরীর খারাপ হোলো না কী? য্যাঁ—ধুতিটা ভিজে গেছে কেন? বুঝেছি—নদীপার হয়েছিস ধুতি ভিজিয়ে—ঠাণ্ডাটা বসে গেছে।'

ধুতিটা ভিজে গেজে অনন্ত এখনই টের পেলো।

ততক্ষণে অনন্তর বাবাও এসে গেছে, 'কী রে কখন এলি? সব ভালোভাবে চুকে গেছে তো? তারার বর কেমন লাগলো তোর?'

অনন্ত নিরুত্তর।

'হোটেলে খাওয়া দাওয়া করেছিস না কী?' সুন্দরা—রামের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে করতে অনন্তকে জিজ্ঞেস করলো।

রাম বললো, 'আরো দিন চারেক থেকে এলে পারতিস।'

সুন্দরা অন্য কথা ভাবছিলো 'বিয়ের পর এলে—হারটা নিয়ে আসতে পারতিস—'

রাম খাওয়া থামিয়ে বললো, 'কার হার?'

'তারার গলায় কিছু ছিলো না—মল্লপা বললো বিয়ের দিন চারেকের জন্য হারটা তারাকে দিতে—'

রাম বিরক্ত হোলো 'যত্তো সব। গাঁয়ের মেয়ে—হয়তো ভেঙে-ভুঙে ফেলে দেবে। এখন কবে আসবে কে জানে—এক একটা জিনিস আমি করি—আর তোমরা তার বারোটা বাজাও।' শেষের দিকে রাম

একটু রেগেই গেলো।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এক মত হোলো অনন্ত আরো দুদিন থেকে গেলে হারটা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতো। এখন, রত্না যদি মল্লর হাত দিয়ে ওটা ফেরত পাঠায়, তাহলে সমস্যার সমাধান হবে। তবুও, রাম বললো, 'তোমার উচিত ছিলো কথাটা তারাকে মনে করিয়ে দেওয়া—'

সুন্দরা জবাব দিলো, 'মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, মানে মল্লকে— কাজকর্মে বোধহয় ভুলে গেছে—'

'হয়েছে। হয়েছে। যা হবার তাই হবে—এখন আর ভেবে লাভ নেই।' রাম আর এ নিয়ে আলোচনা বাড়াতে চাইলো না।

এ-সব আলোচনা অনন্তর কানে ঢুকলো না।

অতঃপর, অনন্ত মন দিয়ে পড়াশোনা করার চেষ্টা করলো, কিন্তু শেষ অবধি পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেলো না। অকৃতকার্য হোলো। বিরক্ত হয়ে সে স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিলো। রাম ছেলেকে আবার পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে বললো। অনন্ত বললো, 'গরমের ছুটি পর স্কুলে যাবো।' গরমের ছুটির এলো, কেটে গেলো—কালী পুজোর ছুটি এলো, কেটে গেলো, তবুও অনন্ত স্কুলমুখো হোলো না। পড়াশোনায় মন বসাতে পারলো না। কখনো সখনো দোকানে গিয়ে দু এক ঘণ্টা বসতো, বাকি সময়টা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতো এখানে-ওখানে। অথবা, কোনো বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাস পিটাতো সারাক্ষণ। রামনবমী উপলক্ষে লাগাতার তাস খেলার পরিকল্পনা নিয়েছিলো ওর বন্ধুবান্ধবরা। রাত বারোটার সময় তাস খেলে ফিরে এসে অনন্ত শুয়ে পড়েছিলো। শরৎকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায়, ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যেতে—অনন্ত আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিলো চাদর মুড়ি দিয়ে—এমন সময় ছোটো ভাই নাভিরাজ এসে ওকে ডেকে তুললো, 'দাদা— বউদির—'

'পালা! এখান থেকে।' বিরক্ত হয়ে অনন্ত এক ধাককা দিলো ভাইকে, 'ইয়ার্কি করার জায়গা পাসনি!'

সুন্দরা দরোজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলো, বললো, 'কীরে—বউয়ের

খবর শুনে মিষ্টি খাওয়াবি—না, তার বদলে, রাগ দেখাচ্ছিস!'

অনন্ত আর কিছু না ব'লে উঠে পড়লো, তারপর মুখ ধুতে চলে গেলো। সুন্দরা নাভিরাজকে, বাবাকে দোকান থেকে ডেকে আনার জন্যে বললো, 'বলিস—তেরদালের পণ্ডিতমশাই এসেছেন মিষ্টি নিয়ে।' তারপর পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলো, 'কখন হোলো—দিনক্ষণ ভালো ছিলো তো?'

'গতকাল সকালেই হয়েছে। দিনক্ষণ ভালোই ছিলো। দুই বোন জঙ্গলে গিয়েছিলো, ফেরার পথে ইন্দিরা রজঃশীলা হয়ে যায়। পণ্ডিতমশাই পান চিবোতে চিবোতে ইন্দিরা রজঃশীলা হওয়ার বিবরণ দিতে লাগলেন।

রামও এসে পড়লো একটু পরে। কুশল বিনিময়ের পর, রাম পণ্ডিতমশাইকে চা খেতে অনুরোধ জানালো। পণ্ডিতমশাই জানালেন, 'না—না—এই তো এখুনি স্টেসন থেকে খেয়ে এলাম—'

'তাতে কী হয়েছে?'

অতঃপর, চা খেতে-খেতে পণ্ডিত মশাই রামকে আর একবার ইন্দিরা কখন কী অবস্থায় ঋতুমতী হোলো—দিনক্ষণপল অনুপলসহ সবিস্তারে জানিয়ে দিলেন। অনন্ত তখন দোকানে চলে গেছে। ইন্দিরাকে ঘরে আনার কথাবার্তা ব'লে রাম পণ্ডিতকে নিয়ে আবার দোকানে গেলো। অনন্ত ফিরে এসে, চান টান করে বেরিয়ে পড়লো বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশে। কিন্তু বেরোতেই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

বন্ধুর হাতে কিছু একটা ছিলো। অনন্তকে দেখে সে চট করে সেটা লুকিয়ে ফেলতে চাইল, কিন্তু অনন্ত ততক্ষণে দেখে ফেলেছে। 'তোর হাতে ওটা কী' অনন্ত বলতে যাবে, কিন্তু বন্ধু তার আগেই অতি দ্রুত তার কাছে এসে মুহূর্তের মধ্যে তাকে আবির মাখিয়ে দিলো! হাসতে হাসতে বললো, 'মিষ্টি খাওয়া এবার।'

অনন্ত একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল, বন্ধু বলছে, 'মিষ্টি খাওয়া আমাকে—ঘরে বউ আসবে তোর।'

'ভারী বউ আসবে আমার।'

'গোড়ায় সবাই ওই কথা বলে। তারপর সব মিঞাঁকেই দেখা যায়—বউ-এর কাছ থেকে আর নড়ছে না। হুঁ! চল-চল—'

'এই রং-লাগা কাপড়টা ছেড়ে আসি।'

'কেন? বোকা-লোকে ঠিক জানতে পারবে, তোর অন্য কাপড়েও রং লাগবে!'

দুই বন্ধু একসঙ্গে এগিয়ে গেলো। সুন্দরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খুশি মনে এই দুই বন্ধুর রঙ আর রঙ্গ দেখছিলো। সে অনন্তর উদ্দেশে বললো, অন্ত—তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস, আমিও পণ্ডিতজীর সঙ্গে তেরদাল যেতে পারি। চটপট চলে আসিস—'

18

তারার শ্বশুরবাড়ির পারিবারিক উপাধি অকিবাটে। অপন্নার বিয়ে উপলক্ষে অকিবাটেরা তিন দিনের জন্যে এসে, বিয়ে চুকে যাবার পর যে যার নিজের বাড়িতে চলে গেলো। হারোগিরিতে, রত্নাও মেয়ের সঙ্গে দিন চারেক থাকার পর চলে গেলো। নতুন জামাইয়ের ঘর-দোর রত্নার বেশ ভালোই লেগেছিলো, অম্বার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করার ফাঁকে চিমমার নিন্দে-টিন্দে ক'রে, জামাইয়ের সঙ্গে কুশল আদান প্রদান করেই রত্না গাঁয়ে ফিরেছিলো।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় অম্বা বউকে কাছে ডেকে এনে বসালো। বললো, 'বউ—এবার থেকে তুই-ই এ ঘরের মালকিন। সব তোকেই বুঝে-সুঝে করতে হবে। আমি তো চোখে দেখতে পাই না—তুই-ই সব দেখা শোনা করবি। আর একটা কথা, অন্য কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা-টথা বলিস নি —আমার ছেলে আবার ওটা ঠিক ভালো চোখে দেখে না। এ বাড়িতে তোর খাওয়া-পরার অভাব হবে না—'

তারা নিরুত্তরে শাশুড়ির কথা শুনে গেলো :

'আগের বউটা সর্বনাশ ক'রে গেছে। এইজন্যে আমার ছেলে

এ্যদ্দিন বিয়ে করে নি, নইলে চার পাঁচ ছেলের বাপ হয়ে যেতো ···'

শাশুড়ি যেন সব কিছু বলেও বলছে না ব'লে মনে হ'লো তারার। ফলে ওর কৌতূহল বেড়ে গেলো। শাশুড়ির আরও কাছে সরে এসে সে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলো, 'কী হয়েছিলো মা—উনি মারা গেছেন কতদিন ?'

অম্বা অকপটে বললো, 'মারা গেলে তো চুকে যেতো—পয়মানতি গাঁয়ের মেয়ে, ভেবেছিলুম ভালো মেয়ে—চার পাঁচ বছর খোঁজ খবর নিয়ে ওকে আমরা এখানে এনেছিলুম—সত্যা ছেলের কাছে যাতায়াতও করতো —আমি তো ওদের বিয়ে দিয়ে দিলুম। ছেলে বেশ আছে। হঠাৎ কী হোলো, চোখে দেখতে পাই না তো, ভগবানই জানে—একদিন সন্ধ্যে-বেলায়, ছেলে কুড়ুল নিয়ে চিককুর দিয়ে উঠলো, 'ওকে মেরেই ফেলবো'—চার পাঁচজন মিলে তো ওকে থামিয়ে ফেললো। কি হয়েছে—কিছুতেই বললো না। সত্যাকে ওর মা'র কাছে পাঠিয়ে দিলুম। ঠিক এক বছর পর সত্যার মা বাবা এসে যৌতুক ফেরত চাইলো—কুরুদবাহ'তে এখন না কী কার সঙ্গে আছে ও—'

তারা জানতে চাইলো, 'ছেলে পুলে ?'

'ছেলে-পুলে হবার আর সুযোগ হোলো কোথায় ? ব্যাটাকে আবার বিয়ে করতে বললুম, রাজি হ'লো না। বড্ড জেদি ছেলে—আমার শ্বশুর-শাশুড়ির ভাগ্যে তোমাকে পাওয়া গেলো—আমার আপনজন সব শত্তুর—যখনই ব্যাটার আবার বে' দেবার চেষ্টা করেছি, ওরা গিয়ে ভাংচি দিয়ে এসেছে। এবার আর পারে নি। চার দিনের মধ্যে আমি সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলুম।'

তারা এই প্রথম কথাটা শুনলো। অবিশ্যি শ্বশুরবাড়িতে এসে সব মেয়েই অনেক নতুন কথা শোনে, নতুন খবর জানতে পায়। ফলে, নানা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, আড়বুঝো হ'লে জীবনটাই নষ্ট করে ফেলে অনেক সময়। ঘরে বউ এলে, যে বড় তার উচিৎ বউকে সব কিছু বুঝিয়ে বলা, রীতি নীতি রেওয়াজ জানিয়ে দেওয়া। এই ভাবেই বছর পাঁচ ছয় কেটে যায়।

এমনিতে তারা ঠিক আড়বুঝো নয়। বরং বুদ্ধিবৃত্তিটা, চিমমার কাছে থাকার জন্যই বোধ হয়, একটু বেশী শানানো। নতুন পতিদেবতাটি সম্বন্ধে আরো কিছু জানার জন্যে সে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো, 'মা, আপনি চোখে এতো কম দেখেন, রান্নাবান্না কে করতো?'

'আন্দাজ, কোনো রকমে আমিই করতুম। পাড়ার কেউ কেউ এসে রুটী বানিয়ে দিতো। তা ছাড়া অপন্যা এখানে থাকতো কতক্ষণ?

'কোথায় থাকতো তাহ'লে?'

'ওর কথা আর বলিস নি। টই টই করে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতো, দিন চারেক হয়তো এলোই না—হঠাৎ একদিন হুট করে চলে এলো!'

তারা স্পষ্ট বুঝতে পারলো শাশুড়ি কিছু একটা যেন লুকোতে চাইছে। স্বচ্ছ দিঘির জলে ঢিল মারলে তরঙ্গ ওঠে, এবং সেই তরঙ্গে জলের নীচে কতটা পাঁক আছে তা বোঝা যায়। তারা এই রকম একটা ঢিল ছোড়ার ইচ্ছে নিয়ে প্রশ্ন করলো, বাঃ! তা খাওয়া দাওয়া করতো কোথায়?'

'ওরে—ওকে খেতে দেওয়ার লোকের অভাব আছে?' বলেই অম্বা জিভ কাটলো। তারা শাশুড়ির জিভ কাটাটা অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলে না। কথা আর এগোলো না।

নতুন বিয়ের পর অপন্যা বাগানের কাজ করে গেলো মহা উৎসাহে। বাগানের কাজে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে গাঁয়ের দিকে একেবারেই যেতো না। যে লোকটা বাগানের কাজ করতো, তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে সে নিজেই কাজ করতে লাগলো। সংসারের জিনিসপত্র লোকজনকে দিয়ে আনিয়ে নিতো গাঁ-এর হাটবাজার থেকে। নিজে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলো, কিন্তু তারার জন্যে চা-চিনি আনিয়ে দিতো ঘরে। খাওয়ার জন্যে সময়মত আসতো, আবার মাঝে-মাঝে এমনি বাড়িতে এসে বউয়ের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে কাজে চলে যেতো। তারারও ভালো লাগতো বেশ।

অপ্যনা কখনো মা'কে বলতো' কেন উনুনের কাছে যাচ্ছো? ওখানে গিয়ে জিনিসপত্তর না ফেলে, এক জায়গায় চুপচাপ বসে দেখো

বউ কেমন কাজ করে !

'তা যা বলেছিস।' মা জবাব দিতো, 'এতদিনে একটা বউয়ের মতো বউ পাওয়া গেছে বটে। তিন তিনবার আমাকে খাওয়ায় রোজ !'

ঘরে দুই চাকরও আছে। বছরের বারোটা মাসই বাগানের কাজ থাকে। কাজের বিরাম নেই। তারাকে অন্তত পাঁচ ছ জনের জন্যে রান্না চড়াতে হয়। আগে, ওবা নিজেদের বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসতো— অপ্যনাকে এজন্যে পারিশ্রমিক বেশী দিতে হতো। খাওয়ার জন্যে বাড়ী গেলে, কাজ বন্ধ হয়ে যেতো। এখন আর অপ্যনাকে সে-সব হাঙ্গামা পোহাতে হয় না। সবার রান্না, গোরু-মোষ দেখা শোনা—সবই এখন তারা করে। এখানে এসে সে মোষের দুধ দোওয়াও শিখে গেছে। তারা এটাও জেনে গেছে অপ্যনা বাড়ীর ভাই বা জ্ঞাতিদের একেবারেই দেখতে পারে না। যার জন্যে ওদের সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই করতে চায় না। কাজ কবা লোকজন খেতে আসে উঠোনে। অপ্যনা খায় ভেতরে। প্রথম দিকে অপ্যনা ওদের বলতো, 'বাইরে কেন ? ভেতরে এসে খাও।'

ওরা নিজেদের মুখ দেখাদেখি ক'রে মনে মনে হাসতো, মুখে বলতো, এইখানেই ঠিক আছে।'

ওদের চোরা হাসি যেন টের পেতো অম্বা। জিজ্ঞেস করতো, 'তোমরা হাসছো কেন ?'

একজন হেসেই জবাব দিতো, 'কোথায় হাসলাম ? আপনি দেখতে পেলেন কী ক'রে ?'

নিজেদের মধ্যে ওরা বলাবলি কবতো, 'শাশুড়ি চোখে দেখে না। বউ যদি তেমন কিছু ক'রে বসে ?'

একজন জবাব দিতো, 'চুপ কর দেখি—সব বউ একরকম হয় না কী ?'

তারা যে ওদের হাবভাব দেখে আলোচনার বিষয়বস্তু বুঝতো না, তা নয়। বুঝেও, কিছু বোঝেনি—এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে, মিষ্টি হেসে, ওদের পরিবেশন ক'রে যেতো।

তারা নিজেদের জন্যে আলাদা খাবার-দাবার করতো না। সবার জন্যে একই রান্না বসাতো। অপ্যনা ব্যাপারটা একদিন লক্ষ করলো, বললো, ওদের খাওয়া আর আমার খাওয়া এক হ'লে কী ক'রে চলবে? মেহনত ক'রে আসে—মোটা রুটি দেবে ওদের, চালে কী পেট ভ'রে ওদের? তবুও, তারা আলাদা রান্না বসালো না এই ভেবে যে মনিবের আলাদা, চাকরের আলাদা রান্না, পৃথক পংক্তি এতে পাপ হয়। সবাইকে সমান চোখে দেখা উচিত। ভালো কাজে পুণ্যি আছে। তারা অপ্যনার কথায় কান দেয়নি ব'লে অপ্যনাও তেমন কিছু মনে করলো না। পাছে তারা দুঃখ পায় এই ধরণের কথায়—তাই সে আর কিছু বললোও না।

একদিন সকালে তারা রান্না চড়িয়েছে। চাকর সিন্দা তকলিতে সুতো কাটছে। পাঁচ ছ বছরের একটি বাচ্চা সেখানে এলো। ওকে কে যেন বলছিলো, 'ভেতরে তোর বাবা নেই রে—কথাটা কানে যেতে তারা তাকাতেই বাচ্চাটাকে দেখতে পেলো।

বাচ্চাটি আদুরে গলায় প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশে বললো, 'বাবা কোথায় গেছে?'

'ক্ষেতে গেছে। তুই এখানে এলি কেন? তোর মা'ও এসেছে না কী?

সিন্দা বলে উঠলো, 'ওর মা আসবে কোথথেকে? বোধ হয়, ছোটো কারুর সঙ্গে এখানে এসে গেছে।'

হঠাৎ তারার খুড় শাশুড়ি বেড়িয়ে এলো। রসিকতার সুরে বলে উঠলো, 'তারা—তোর মেয়ে এসেছে, দেখছিস?

খুড় শাশুড়ির রসিকতা খুব সরল ব'লে মনে হলো না তারার। সে একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, 'আমার মেয়ে?'

'হ্যাঁ রে! মনে হচ্ছে কিছু শুনিস নি এখনো!' তারা চুপ করে রইলো। স্বামী সম্বন্ধে সে রোজই নতুন কিছু জানতে পারছে। ফলে, সে সব কিছুই নির্বিকার হয়ে, কিন্তু হাসি মুখে শুনে নেয়। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিলো না ওর।

খুড় শাশুড়িও তারা কিছু জানে না বুঝতে পেরে বললো, 'আমি তো

স্বপ্নেও ভাবিনি অপুর আবার বিয়ে হবে। ওর মাও আশা ছেড়ে দিয়েছিলো।'

'কেন?' এই 'কেন'র জবাবই তারা এতদিন ধরে খুঁজছিলো।

খুড় শাশুড়ি জানালো, 'গাঁয়ে সোনা নামে এক ছুঁড়িকে অপু রেখে দিয়েছে—ওর জন্যেই তো যতো সর্বনাশ হয়েছে। এইজন্যে, গাঁয়ের কেউ—বাড়ির কেউ, অপুকে দেখতে পারে না। যা কিছু রোজগার করে—সোনাকে দিয়ে আসে। সেইজন্যে তো এাদ্দিন বিয়ে করে নি। তোকে দেখে বোধ হয় বিয়ে করতে রাজি হয়।'…কিন্তু, এখন তো সোনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ওর উচিত নয়।'

তারা সব শুনে বললে, 'উচিত-অনুচিত ভেবে কী হবে? কপালে যা লেখা আছে, তা কী কেউ খণ্ডাতে পারবে?'

তারার জবাব শুনে খুড়শাশুড়ি থ' মেরে গেলো। ভেবেছিলো, তারা বোধ হয় রেগে যাবে, ঝগড়া অশান্তি করবে। ঈষৎ ব্যঙ্গ ক'রে বললো, 'তুই তো ওই কালমুখীর দৌরাত্ম্যি দেখিস নি। পুরো বাগানটাই ছিলো ওর রাজ্য—কখন কার মাথা খসে ঠিক ছিলো না। এখন ঘাপটি মেরে কোথায় আছে মাগীটা।

'এখানে আর আসে না কেন? এলেই পারে।' তারা জবাব দিলো।

'তোর কী মাথা খারাপ না কী রে—তারা? ও আর আসবে কেন—এখন অপুই যায় ওখানে। অপুকে কায়দা ক'রে ঠিক এক বিঘে চাষের জমি আদায় ক'রে নেবে—দেখিস।'

'নিলে আর অন্যায় কী করবে? সাত আট বছর বেচারা এতো করেছে ওনার জন্যে—বিয়ে থা না করেই—তার জন্যেও তো সোনাকে কিছু দেওয়া দরকার।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। খুড়শাশুড়ি বলেই চললো, 'আমি সব জানি। কাকে দিয়ে যেন অপুকে ডাকতে পাঠিয়েছিলো মাগীটা—অপু যায়নি। বিয়ে হবার পর থেকেই অপু আর গাঁয়ে যায় না। তোকে দেখে আসার পর দু জনে বেজায় ঝগড়া হয়েছিলো। অপু চেঁচিয়ে বলেছিলো, তোমার চেয়ে সুন্দরী বউ আনবো—'

দূরে অম্বাকে আসতে দেখা গেলো। খুড়শাশুড়ি সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

সিন্দা শুধু বললো, 'কোথায় আমাদের মা-এর রূপ আর কোথায়—'

খুড়শাশুড়ি তবুও বললো, 'যখন অপুর কাছে থাকতো—তখন মোটামুটি ভালোই ছিলো—তাছাড়া এখন বয়েসও হয়েছে। কিছুদিন আগে পুনায় গেছলো, সেখানে আরো কয়েক জনের সর্বনাশ ক'রে এসেছে।···কী ক'রে এই মেয়েটা হোলো কে জানে!'

'মেয়েটা তাহলে ওনার?'

সিন্দা খুড়িকে ইশারা করলো আর কিছু না বলতে, তারাকে বললো, 'মালিকের? না—না তা কী ক'রে হবে?'—কিন্তু ততক্ষণে তারার যা জানার ছিলো, তা জানা হয়ে গেছে।

একটু দূরে, অম্বার হাত ধরে বাচ্চা মেয়েটাকে এগিয়ে যেতে দেখা গেলো।

'দাদার হাত ধরে' যাচ্ছে।' সিন্দা বলে উঠলো।

এতো কথা শুনে, সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপর রেগে গেলেও, তারার মুখে কোনো ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা গেলো না। সেইদিনই ওর বাবা, মল্ল এলো ওকে নিয়ে যেতো। জামাইকে বললো, 'দিন চারেকের জন্যে ওকে একটু নিয়ে যাবো?' অপু জবাব দিলো, বেশ তো—তারাকে জিজ্ঞেস করুন। ও যেতে চায়—যাবে।' তারা অপুর মনোভাব বুঝে বাবাকে বললো, 'বাড়ির কাজ আছে, তাছাড়া ওঁর (অম্বার) শরীরটা ভালো নয়—তিনজন চাকরকে খাওয়াতে হয়—'

মল্ল মেয়ের কথাবার্তা শুনে হেসে ফেললো, একেবারে পাকা গিন্নী! বাড়িতে এসে মল্ল রত্নাকে কথাটা বললো, 'ঘরে যতো রাজ্যের কাজ—বেটি একেবারে পাকা গিন্নী হয়ে গেছে এখন—আসবে কখন?'

রত্নাও খুশি হোলো। মেয়ে তাহলে ভালোই আছে।

কয়েকদিন পর চম্পা, সেই বাচ্চা মেয়েটিকে, আবার বাগানে দেখা গেলো। তারা তাকে ডেকে এনে বাবার চন্দুর-থেকে-আনা মিষ্টি

খাওয়াতে চাইলো ওকে—কিন্তু সে খেলো না। মিষ্টি হাতে দাঁড়িয়েই রইলো। বললো, বাড়ি গিয়ে খাবো।'

'তাহলে তোকে আরও কিছু দিই—বাড়ির জন্যে! এগুলো এখানে খেয়ে নে।'

কিন্তু চম্পা তবুও খেলো না। অম্বা পাশেই বসেছিলো, বললো, 'ওর মা বোধ হয় বাইরে খেতে বারণ করে দিয়েছে—না রে?'

চম্পা ঘাড় নাড়লো, 'না।'

'তাহলে খাচ্ছিস না কেন?' তারা জিজ্ঞেস করলো।

চম্পা তবুও নিশ্চুপ। তারা এবার বললো, 'আমি কিছু দিলে খাবি না—মা বলে দিয়েছে—না?'

'হুঁ।' চম্পা অস্ফুটভাবে বললো।

চম্পার জবাব শুনে তারা বিষণ্ণ হোলো। চোখে জল এলো প্রায়। ভাবলো, এর চেয়ে বিষ খেয়ে মারা গেলে ভালো হোতো। সমস্ত যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাওয়া যেতো। কয়েকদিন ধরেই তারা আত্মহত্যার কথা পৌনপুনিকভাবে ভাবছিলো।

আজকাল অপ্যনা বাগানের কাজ সেরে চটপট ফিরে আসে। ওর খাওয়াদাওয়া শেষ হতে-হতে তারা বিছানা পেতে দেয়। অম্বার বিছানাটা অবশ্য উঠোনে—একটা খাটের ওপর—আগে করে রাখে। সব কাজ সেরে তারা শোয়ার ঘরে ঢুকতো, অপুর পাশে শুয়ে পড়তো। যেদিন বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়তো সেদিন আর অপ্যনাকে জাগাতো না। কোনো কোনোদিন অপ্যনা জেগে থাকতো ওর জন্যে—দাম্পত্য রাগ—অনুরাগে তারাকে বলতো পা টিপে দিতে। তবুও, তারার সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হতে কেমন যেন বিব্রত, সংকুচিত হোতো। তারা যখন পা টিপে দিতো, তখন হয়তো নিজের মনেই বলতো, ছ আট বছর অপেক্ষা করার পর তবে তোমাকে পেয়েছি।' এই ছিলো অপ্যনার প্রেম নিবেদনের একমাত্র অভিব্যক্তি।

কখনো বা বলতো, 'যখন তুমি ছিলে না—বাগানে এক ঘণ্টা থাকা আমার কাছে এক বছর ব'লে মনে হোতো।'

মনে-মনে স্বামীকে ঘৃণা করলেও, তারার ঠোঁট থেকে হাসিটা কোনোদিন মিলিয়ে যেতো না। তারার এই হাসি লক্ষ করে অপ্যনা একদিন বললো, 'চম্পা মেয়েটা কেমন মিষ্টি দেখতে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে হয়। ওর মা বারণ করে—তবুও ঠিক পালিয়ে আসে এখানে—'

অপ্যনা হয়তো আরও কিছু বলতো, কিন্তু সহসা সংকোচ বোধ করে থেমে গেলো।

তারা সংকোচটা লক্ষ করে, সহজ সুরেই বলে উঠলো, 'আমি জানি চম্পা তোমারই মেয়ে!'

'একদিন না একদিন জানতে পারতেই। ঘড়ার মুখ বন্ধ করা যায় কিন্তু লোকের মুখ তো বন্ধ করা যায় না—' অপ্যনা জবাব দিলো একটু থেমে, 'সোনিয়াকেও দেখতে ভালো, তাই চম্পা ওই রকম ফুটফুটে হয়েছে।'

তারা আর একটু কাছে সরে এসে অপ্যনার কালো সাপের মতো হাতটি ধরলো, 'তাহলে সোনিয়াকে এখানে আসতে বলো না কেন? যাতায়াত যদি করে কী ক্ষতি হয়?'

'এ তুমি কী বলছো! সোনা এখানে এলে তোমার ভালো লাগবে?' প্রচণ্ড বিস্ময়ে অপ্যনা প্রশ্ন করলো।

'কেন ভালো লাগবে না? তোমার যাকে ভালো লাগে—আমারও তাকে ভালো লাগবে।'

'বেশ—ডেকে পাঠাবো কালই। শুনি—বেচারা খুব কান্নাকাটি করে।'

অপ্যনা তারাকে আরো কাছে টেনে নিলো, 'তোমার মতো মন আমি কারুরই দেখি নি। ভাগ্যের জোরে তোমাকে বউ হিসেবে পেয়েছি।' এইটুকু ব'লেই কি ভেবে সে সরে গেলো তারার কাছ থেকে, বললো, 'চম্পার মা কিন্তু তোমার মতো ভালো মেয়ে নয়।' অপ্যনা মনে মনে খুব বিচলিত হয়ে উঠলো, কোথায় সোনা—আর কোথায় তারা। বিয়ের কথা শুনেই সোনা রেগে উঠেছিলো। ঝগড়া

করেছিলো। আর তারা? ভাবাবেগে অপ্যনা তারাকে চেপে ধরলো। সোনাকে আনাটা কখনোই ঠিক হবে না।

তারা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এতোদিন বিয়ে করোনি কেন?'

'ইচ্ছে হয় নি। মেয়েদের বিশ্বাস করা খুব শক্ত। যাকে প্রথম বিয়ে করেছিলুম—তাকে কত যত্ন ক'রে রেখেছিলুম। দশ তোলা সোনায় গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলুম, পাছে রোদ লাগে তাই বাইরে যেতে দিতুম না—কিন্তু তবুও মেয়েদের বিশ্বাস করা যায় না।'

তারা কথাগুলো শুনে হেসে উঠলো, যেন পৃথিবীর তাবৎ পুরুষকে সে ব্যঙ্গ করে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, 'পৃথিবীর সব মেয়েই এক রকমের হয় না কী?'

'না, তুমিও ওই রকম—এমন কথা তো আমি বলছি না।' আত্মবিস্মৃত হয়ে অপ্যনা উঠে বসে, সহসা তারাকে চুমু খেলো, তারপর বললো, 'আমি কিন্তু সোনাকে এ বাড়িতে আনবো না।'

'কেন? কী হয়েছে আনলে? আমরা দু জনে একসঙ্গে থাকবো।'

পরের দিন, তারা অপ্যনাকে মনে করিয়ে দিলো সোনার কথা। অপ্যনা তারার মুখটা একবার দেখে নিয়ে, নিজের কাজে চলে গেলো। হ্যাঁ—না কিছুই বললো না। কিছুক্ষণ পর চম্পা এলো গাঁ থেকে। তারা চম্পাকে বললো, 'তুই একদিন তোর মাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।' চম্পা, তারার কথা শুনে, অবাক চোখে তাকালো। মা এখানে আসবে না ও জানে। বললো, 'আমি ডাকতে পারবো না।'

'ছিঃ। ও কথা বলে না।' তারা চম্পার গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে করতে বললো, মা'কে 'বলবি—যে বাবা ডাকছে। তোকে একটা নতুন ফ্রক বানিয়ে দেবো।'

'সত্যি? বাবা তো মেলার সময় ফ্রক দেবে বলেছে—,

'কালই তোকে ফ্রক সেলাই করে দেবো—কিন্তু মা'কে ডেকে আনতে হবে।'

পরের দিন অধীর আগ্রহে তারা সোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু, সোনা এলো না। এমন কি অপ্যনা খবর দেবার

পর পাঁচ ছ দিনের মধ্যেও এলো না। ব'লে পাঠালো, 'কেন যাবো? পাঁচ ছ মাস ওরা কোনো খবর নিয়েছে আমার? মুখ অবধি দেখায় নি! আমার ভগবান আছে—ভগবান ঠিক আমাকে দেখবে। আমি কুত্তির মতো ওদের দরজায় যাবো না।'

সব শুনে অপ্যনা বললো, 'আসে আসবে—না আসে না আসবে! আমার মেয়ে যাতায়াত করছে—এই যথেষ্ট।'

পরের সপ্তাহে, একজন চেনা লোকের হাত দিয়ে তারা দুটো শাড়ি আর একটা ফ্রকের কাপড় আনালো তেরদাল থেকে। তারপর সিন্দার হাত দিয়ে ও দুটো পাঠিয়ে দিলো সোনার কাছে। কিন্তু সোনা কাপড় ফেরত দিলো। তলোয়ারের ঘা খেলে যেমন অবস্থা হয়, তারার সেই রকম অবস্থা হোলো। মুখে বললো, 'সত্যি, ওর পক্ষে শাড়ি নেওয়া কঠিন। পুরুষরা বড়ো নিষ্ঠুর।' যেন তারাও সোনার মতো একজন। মন্তব্যটা করতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো ওর।

দুপুরে, চম্পাকে বাগানে দেখতে পেয়ে তারা জিজ্ঞেস করলো, 'কীরে ফ্রকের কাপড় ফেরত দিলি যে বড়ো?

'কোথায় ফ্রকের কাপড়? তুমি মিছিমিছি বলছো!' প্রত্যাশায় চম্পার মুখ উজ্জ্বল। তারা জবাব দিলো, 'সকালে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তোর মা ফেরত দিয়ে দিয়েছে।'

চম্পা চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো:

'এই জন্যেই আমার ওপর মা রেগে আছে সারাদিন।'

'কেন? এতে রাগের কী আছে? আমার কথা নিশ্চয়ই মা কিছু বলেছে, না রে?'

'ন্ ন তো। বাবার কথা বলেছে।'

এই সময় অপ্যনা এসে পড়লো ওখানে। মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোর মা শাড়ি ফেরত দিয়েছে—তোকেও এখানে আসতে বারণ করে না কী? তুইই বা মা'র কথা শুনে ওখানে থাকিস না কেন?'

জবাব দিলো বুড়ি অম্বা, 'নাতনি এখানে হাজার বার আসবে—'

তারা ঈষৎ হেসে জবাব দিলো, 'মিছিমিছি সোনার ওপর রেগে

কী হবে ? তুমিও তো ওখানে একবার গেলে পারো !'

তারার কথা শুনে অম্বা বিস্মিত, আশ্চর্য হোলো। ছেলের উদ্দেশে 'দেখেছিস আমাদের বউয়ের মন !'

অপ্যনা নিশ্চুপ থেকে চলে গেলো। তারা শাশুড়িকে বললো :

'কপালের লেখা কে খণ্ডাবে মা ? আমরা কে ! ...আরে, 'চিপপি' কোথায় গেলো ?'

'ও কী আর এখানে থাকে ? বাপের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই বাগানে চলে গেছে !'

অম্বা আরো বললো. 'পুরুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। পথ চলতে যদি শনিকে ঘরে ডেকে আনে, তাহলে অমঙ্গল হবেই। সোনা যদ্দিন বাইরে থাকে, তদ্দিন তোরা ভালো থাকবি। তোদেরও ছেলেপুলে হবে—সংসার ভরে উঠবে—সুখে থাকবি।'

অম্বা হয়তো আরো বকবক করতো কিন্তু তারা বাধা দিলো, 'সুখ ভগবানের হাতে মা। সবাই-তো সুখ চায়, কিন্তু পায় কোথায় ?'

কয়েকদিন পরেই, তারার মামা—রাম এসে হাজির হোলো। হাতে মিষ্টি। অপ্যনা কোন কাজে যেন বেরিয়েছিলো। তারা ছিলো বাগানে। মামা এসেছে শুনেই সে ছুটে এলো, তাড়াতাড়ি হাত পা ধোয়ার জল দিয়ে বসবার বন্দোবস্ত করে দিলো। তারা বললো, 'সেই আমার বিয়ের সময় এসেছিলো, তারপর এই এক বছরের মধ্যে আর আমার কথা মনে পড়লো না—না ?' তারার গলা অভিমানে ভারী হয়ে উঠলো।

'দ্যুর পাগলী ! অসেতে কী চাইনি, ভেবেছিস ? কিন্তু দোকান ছেড়ে আসবো কী ক'রে বল দেখি ?' রাম আমতা আমতা করলো।

'কেন, অনন্তকে দোকানে বসিয়ে একদিনের জন্যেও কী আসা যেতো না ?' রাগ-অভিমানে তারার ঠোঁট কুঞ্চিত হোলো। অনন্তর নামটা হঠাৎ মনে পড়লো ব'লে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেলো ওর।

'অনন্ত ! বলেছিস বটে একটা কথা !' রাম হতাশার এক গভীর শ্বাস নিলো, 'অনন্তর বারোটা বেজে গেছে ! বদ ছেলেদের পাল্লায়

পড়ে—যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ওর ভরসায় দোকান ছেড়ে আসা যায় না। লেখাপড়া করে না, ঘরের কাজও করে না, কারুর কথাও শোনে না—সবই কপাল রে তারা, কপাল।'

তারা খুব দুঃখিত হোলো কথাটা শুনে। জিজ্ঞেস করলো, ওর শরীর ভালো আছে তো?'

'শরীর ভালো খারাপ ব'লে ও কী কখনো কিছু পরোয়া করে না কী? মেজাজ ভালো থাকবে ঘরে থাকে কিংবা ক্ষেতে যায়—নইলে কিছু করে না। মাসে দুদিন যে কোথায় বেপাত্তা হোলো কেউ জানে না—জিজ্ঞেস করলে জবাব অবধি দেয় না! ঘরের কোণে গিয়ে সেই যে বসলো—ঠায় দুঘণ্টা গুম হয়ে বসে রইলো। বুঝতে পারছি না রেগে গিয়ে এরকম করছে—না, ওর স্বভাবটাই ওই রকম হয়ে গেছে।'

তারা চুপ ক'রে থেকে জানতে চাইলো, 'হঠাৎ এমন হোলো কেন?'

'ভগবান জানে। লেখাপড়া শেখার জন্যে ইস্কুলে পাঠালাম ছেলেকে—তার এখন এই হাল।

'আমাকে তো কেউ কিছু বলে নি।'

এতে আর বলার কী আছে? অসুখ-বিসুখ হ'লে না হয় তোকে বলতুম, খবর দিতুম। ওই তো বললুম, মাঝে-মাঝে বেশ কথা বলে, তারপর, হঠাৎ চুপ করে যায় বোবার মতো। এখন যদি বউ এলে—'

রাম মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে রেখে দিলো।

তারা বললো, 'ইন্দিরাও তো এখন ডাগর হয়ে গেছে?' কথাটা বলতে বলতে তারার মনে হোলো কেউ যেন ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে বের ক'রে আনার উপক্রম করছে। সে ধপ ক'রে বসে পড়লো। রাম ভাবলো, তারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো, এবার বোধ হয় ব'সে বসে কথা বলতে চায়। অনন্তর কথা শুনে মনে-মনে সে কেঁপে উঠলো, অনন্তর কেন এমন অবস্থা হয়েছে সে যেন এক নিমিষে বুঝতে পারলো।

রাম পুঁটলি থেকে মিষ্টি বের করে তারার হাতে দিলো, 'পরশুদিন থেকে ইন্দিরার—হয়েছে, তাই মিষ্টি আনলুম।'

'তাই বলো!' তারা উল্লাস প্রকাশ করার চেষ্টা করলো হেসে উঠে,

'তা মেয়ে কোথায় আছে ?'

'এখনো তেরদালেই আছে। কাল ওখানে গিয়ে কথাবার্তা ব'লে এলুম। ফেরার পথে ভাবলুম রত্নার সঙ্গে দেখা করে আসি।' রাম অবশ্য এটা বললো না সুন্দরার হারের খোঁজেও সে রত্নার সঙ্গে দেখা করেছিলো। তারা মা বাবার খবর জিজ্ঞেস করাতে রাম জবাব দিলো, সব ভালোই আছে। কাল রত্নার এনাপুর আসবে। বলছিলো আমার ওখানে কাজ চুকে গেলে তোর এখানে একদিন থেকে বাড়ি যাবে। তুই আসবি তো ?'

'ও এলে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।'

'আপপা কোথায় ?'

'ক্ষেতে গেছে।'

'কখন আসবে ? আমাকে আবার সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে যেতে হবে।'

'আজকের দিনটা থেকে যান না। সন্ধ্যেবেলায় ও ঠিক ফিরে আসবে।'

'না রে—অনেক কাজ আছে। আমার থাকা হবে না।'

অম্বা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এসে বললো, 'একদিন থেকে গেলে কী হয় ? তুমি তো এসেই যাই-যাই করছো। এটাও তোমার ঘর।'

'থাকতে আপত্তি ছিলো না—কিন্তু হাতে এক গাদা কাজ। আপনিও আসুন না আমাদের ওখানে—বউয়ের সঙ্গেই না হয় ফিরবেন।'

'বুড়ো হয়ে গেছি। চোখে দেখতে পাই না। আমার কী আর যাতায়াত পোষায়। তা এরা যাবে মিঞাঁ বিবি।' কাজটা কোথায় হবে ?'

'তেরদালে হবে : শুক্রবার। তেরদালে করছি কেননা ওখানেই—'

'শুককুর বার ? এসেই গেলো।'

'সেইজন্যেই তো তাড়াহুড়ো করছি। আপপার সঙ্গে দেখা হোলো না।'

'তুমি তো বাপু পায়ে ঘুঙুর বেঁধে এসেছো—ওর সঙ্গে কী ক'রে

দেখা হবে।'

অম্বা তারার উদ্দেশ্যে বললো, 'চটপট রান্না চাপা—মামাকে খবর্দার না খাইয়ে ছাড়িস নি।'

তারা উনুনের দিকে চলে গেলো।

অম্বাও একটু পরে বাইরে এসে বললো, 'আমি বলতুম না, দেখলুম ও চলে যাবার তাল করছে—তুই কিছু বলতে না পেরে চুপ মেরে গেছিস, তাই বললুল—যা পাশের বাড়ি থেকে মিষ্টি নিয়ে আয়, ঘরে লোক এলে বিনা মিষ্টিতে খেতে দিতে নেই—চা বানা।'

রাম চা জল খাবার খেয়ে তারার পাশের বাড়ির আত্মীয়র ওখানে গেলো—এবং যথারীতি নেমতন্ন করে এলো। ওরাও জোর ক'রে চা খাওয়ালো রামকে। এই দুই বাড়ির মধ্যে—এক উঠোনে হলেও—কোনো যাতায়াত কোনোদিন ছিলো না। তারাও কখনো যায় নি। অম্বা উঠোনে কান খাড়া ক'রে বসেছিলো। যাই হোক, রাম একথা-সেকথা বলে চলে এলো একটু পরে। তারা খেতে দিলো। খাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে কথাবার্তাও চললো। পরিপাটি ক'র খাওয়ার পর রাম তারাকে সেই হারের কথা তুললো। তারা হারটা এনে দিলো তাড়াতাড়ি। রাম পান নিয়ে উঠে পড়লো—রামের সঙ্গে সঙ্গে তারা এলো ইঁদারা অবধি। রাম অম্বার উদ্দেশে আর একবার স-রব নিমন্তন জানালো। বললো, 'পাশের রাস্তা—মানে বাগানের পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে, আপপা যেন যায়, শুক্রবার দুপুরে···

সন্ধ্যেবেলায় আপপা এলো। তারাকে বললো, 'আমি না আসা অবধি তুমি আটকে রাখতে পারলে না?'

'থাকতে চাইলো না, কাজের তাড়া ছিলো।'

'হুঁ।' আমাদেরও কাজ আছে তাহলে—আমরাও যাবো না!'

কথাটা আপপা হয়তো রসিকতা করেই বলেছিলো, কিন্তু তারার মুখ ভার হয়ে গেলো। অম্বা তাড়াতাড়ি ছেলেকে বোঝালো, 'যাবি না কেন? সে বেচারা এত কষ্ট ক'রে বলতে এলো—'

'আরে—আমি কী যেতে বারণ করেছি নাকি কাউকে? কালই

তেরদাল থেকে ধুতি পাগড়ি আনিয়ে দিচ্ছি—বিয়ের সময় ওদের কিছু দেওয়া হয় নি—এবার দেবো।'

পরের দিনই উপহারের দান সামগ্রী এসে গেলো।

তার পরের দিন, তারা সকাল থেকে উদগ্রীব হয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কখন গাড়ি আসে! জনৈক প্রতিবেশীর জলের গাড়ি আসছে দেখে সে ছুটে বেরিয়ে এলো, বলা যায় না— মামার গাড়ি হতে পারে। কিন্তু বেচারাকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হোলো। এইভাবে বেলা গড়িয়ে গেলো, কিন্তু গাড়ি এলো না। তেরদাল এখান থেকে দু তিন ঘণ্টার পথ—হুট করে গাড়ি এসে যেতে পারে। এইভাবে দুপুর গড়ালো বিকেলে, তারা হতোদ্যম, হতাশ হয়ে বসে পড়লো। অম্বাও অধৈর্য হয়ে পড়েছিলো, 'এদের গাড়ি কখন আসবে? যদি আসে—তাহলে তো ওদের আপ্যায়নের সময়ও পাওয়া যাবে না··· চটপট শুধু চা খাইয়ে দিস না হয়—কুটুম মানুষ।' তারা আবার আশা নিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো, যতদূর চোখ যায় দেখার চেষ্টা করলো। দূর থেকে উড়ে-যাওয়া-ধুলোর কুণ্ডলী চোখে পড়লো ওর। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। গাড়ি বোধ হয় আর আসবে না—অম্বাকে এই কথা ব'লে সে ভেতরে চলে গেলো।

অম্বাও সায় দিলো, 'গাড়ি এলে আমরা এতক্ষণে তেরদালে পৌঁছে যেতুম। গাড়িটা কী তাহলে অন্য পথে চলে গেলো? নাকি—কোনো কারণে আজ ওদের কাজ আটকে গেলো?'

তারার মনে হোলো অম্বার ধারণা ঠিক হলেও হতে পারে।

'হতে পারে।' সে জবাব দিলো।

19

গাড়ি তেরদালের পুকুরের কাছে এসে যখন পৌঁছলো তখন রাত আটটা বেজে গেছে। গাড়ি থামতে সবাই নিচে নেমে পড়লো। সকাল

থেকে ঠায় বসে থেকে সবার কোমর ধরে গেছে। মেয়েরা পুকুরে গেলো হাত পা ধুতে। সুন্দরা দৌড়ে এলো পুরুত মশায়ের কাছে। রত্নাকে বললো, 'ও বাড়িতে নেই—এতো কোরে থাকতে বললাম, সব কাজ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে—'

রত্না বুঝলো সুন্দরা সবার কাছে তার দায়িত্বশীলতা সাতকাহন ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করছে। রত্না একটু গম্ভীর স্বরে জবাব দিলো, 'তাতে কী হয়েছে—একজনকে তো এসব করতে হতই।'

রত্নার অভিমত শুনে সুন্দরার দায়িত্ব যেন আরো বেড়ে গেলো। কাছেই দাঁড়িয়েছিলো এক আত্মীয়, সে সুন্দরার কাছে গাইয়ে-বাজিয়েদের বন্দোবস্তের কথা বললো।

গাড়িতে বসে রইল কিছু বাচ্চা। বাকি সব গাড়ির পেছনে-পেছনে গাঁয়ের রাস্তা ধরে হাঁটা দিলো। গাড়ির সামনে এনাপুরের এক তুরিবাদক মাঝে মাঝে তুরি বাজাতে লাগলো। লোকজন, তাকে পুরো এক বাণ্ডিল চিঠি দেবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে উৎসাহিত করতে লাগলো। চাঁদের আলোয় গাড়ি ঝকঝক করতে লাগলো।

মেয়েদের দলে, রত্না একান্তে সুন্দরাকে জিজ্ঞেস করলো অনন্তর কথা। বললো, মুখটা কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে—'

কথাটা পুরুত মশাইয়ের কানে গেলো কীভাবে। তিনি ওদের পেছনেই ছিলেন। রসিকতা ক'রে জবাব দিলেন, 'কাল বাছাধনের মুখ আবার চকচক ক'রে উঠবে—ভাববার কিছু নেই।'

পণ্ডিত মশাইয়ের মন্তব্যে অন্য মেয়েরা হেসে উঠলো।

সুন্দরা পুরুতমশাইকে বললো, 'অনন্ত দেনা-পাওনার কথা বলতে একদম আনাড়ি। আপনি বরং ওর শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে সোনা-দানা কী দেবে জেনে আসবেন।'

'জিজ্ঞেস করার কী কিছু বাকি আছে? রামু এসে সব কথা বলে গেছে।' পণ্ডিত জবাব দিলেন।

'শ্বশুর-শাশুড়ি যাই দিক—তাই খুশি মনে নিতে হয়। কোনো

জেদাজিদি করাটা ঠিক নয়।' রত্না মন্তব্য করলো।

'সবই বুঝলাম—কিন্তু জামাই কী পাবে?' সুন্দরা পাল্টা প্রশ্ন করলো।

'জামাই কী পাবে না পাবে—ভেবে কী হবে? যিনি দেওয়ার তিনি ঠিকই দেবেন। তারাকে দেখো না—'রত্না বলে উঠলো।

অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এলো। অনন্ত পুরুতমশাইকে বললো, 'আমি অতক্ষণ ধ'রে ব'সে থাকতে পারবো না, আপনার কাজ হয়ে গেলে—আমাকে ডাকবেন।'

'ধুতি আর পাগড়িটা তো পরবি—নাকি তাও পরবি না?' পুরুত জিজ্ঞেস করলেন।

সুন্দরা শুনে বললো, 'কেন এরকম করছিস? কি সুন্দর মণ্ডপ বানিয়েছে ওরা—ঘণ্টাখানেক অন্তত বস—' সুন্দরা ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

রত্না মাঝখান থেকে ব'লে উঠলো, 'ছেড়ে দাও—ওতো কাপড় পরে তৈরি রয়েছে—কাল তো তাও ছিলো না, আজকালকার ছেলে, তার ওপর লেখাপড়া জানা, যা মন চায় করুক।'

ইন্দিরাকে প্রথমে বসানো হয়েছিলো। তারপর অনন্ত গিয়ে বসেছিলো। পুরুতমশাই কথামতো চট ক'রে কাজ চুকিয়ে দিতে, অনন্ত উঠে পড়ছিলো। কিন্তু পুরুতমশাই বাধা দিলেন, আর একটু বস, আরো চার পাঁচজন আসবে উপহার দিতে।' ফলে, অনীহা সত্ত্বেও অনন্তকে বসতে হোলো। সবার দেয়া-থোয়া চুকে যাবার পর অনন্ত আবার উঠতে যাবে, এমন সময় ইন্দিরার বান্ধবীরা ওকে ধরলো—'বউয়ের' নাম বলার জন্যে। অনন্ত বেজায় রেগে গেলো। রেগে-মেগে দরজা অবধি গেছে, এমন সময় একজন লোক পথ আটকালো, 'দাঁড়াও ভাই—আর একটা জিনিস পাবে।'

হাতে-হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলি এলো অনন্তর কাছে। সুন্দরা মনে-মনে বললো, শ্বশুর-শাশুড়ির তরফ থেকে শুধু এক জোড়া কাপড়! মুখে বললো, 'জোড়াটা পরে নে অনন্ত, ভালো

কাপড়।'

'না, না, পরতে হবে না। ছুঁয়ে দিলেই হবে।' পাশ থেকে অনন্তর শাশুড়ি রুককা বলে উঠলো।

রত্না গর্বিতভাবে বলে উঠলো, হীরাগিরি থেকে পাঠিয়েছে—'

অনন্ত চমকে উঠলো, 'হীরাগিরি? তারা আসে নি?'

দরজার-কাছে-দাঁড়ানো সিন্দা জবাব দিলো, 'কেমন ক'রে আসবে? আপনাদের গাড়ির জন্যে সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করেছিলো—তারপর নাচার হয়ে আমার হাত দিয়ে এই কাপড় পাঠিয়েছে, পরে যাতে বদনাম কেউ না দেয়।'

সুন্দরা জবাব দিলো, 'গাড়ি ওদিকে যেতে পারে নি, রাস্তা খারাপ ছিলো, তাই এদিকে এসেছে।'

'কিন্তু রাম তো ওই পথ দিয়েই গাড়ি আনার কথা বলেছিলো, আমিও তাই বলেছিলুম—কিন্তু তোমরা তো না ক'রে দিলে, ভাবলে বোধ হয় মেয়ের জন্যে আমি ওই পথে যেতে বলছি।' রত্না বেশ রেগেই কথাগুলো বললো।

'কী বলছো দিদি—তুমি যদি আর একবার বলতে আমি কী 'না' করতুম? ভগবান জানে, এখন তারা কী ভাববে।' সুন্দরা ক্ষুব্ধ—এই রকম একটা ভাব দেখালো। অনন্ত ততক্ষণে নতুন ধুতি পরে ফেলেছে। তাই দেখে একটি মেয়ে বললো, শ্বশুরের জোড়ের চেয়ে এই জোড় অনেক ভালো দেখতে—পুজো অবধি এইটা পরে' থাকো।'

ইন্দিরার মা পাশেই ছিলো। সে জবাব দিলো, 'আমি কী করবো বোন—যা পেয়েছি তাই দিয়েছি। তাছাড়া মেয়ের বাবাই বললো ভালো কাপড় দিয়ে দরকার কী—বাকসোর মধ্যে পড়ে থাকবে, তার চেয়ে নগদ টাকা দিয়ে দিও। এখন দেখো তো কার বদনাম—' এই ব'লে তার স্বামীর মুখের দিকে তাকালো রুককা।

'এতে বদনামের কী আছে?' রুককার স্বামী জবাব দিলো, 'যাই দিই—কিছু তো লুকিয়ে দিচ্ছি না! সবই ওদের বাড়িতে পৌঁছবে।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। কাপড়ের সঙ্গে দুশো টাকাও তো তোমরা দিয়েছো।' সুন্দরা সবাইকে শুনিয়ে ব্যাপারটা ইতি করার চেষ্টা করলো।

শুভদিন। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ভালোবাসার প্রথম সহবাসের দিন। নতুন জীবন শুরুর দিন। কিন্তু পাগল অনন্ত তখনও উদাসীন। লোক-জন একে একে চলে গেলে'; রাত গভীর হোলো; মেয়েরা ওদের এক কামরার মধ্যে রেখে অর্থপূর্ণ রসিকতার হাসি হেসে চলে গেলো। সুরভিত কামরার মধ্যে দীপ জ্বলে যেতে লাগলো—আর অনন্ত চুপ ক'রে বসে রইলো।

একবার বোধ হয় চোখ তুলে সে ইন্দিরাকে দেখলো; জীবনের সর্বাধিক বিব্রত মুহূর্তটির মুখোমুখি হোলো। ইন্দিরাও অপ্রস্তুত, বিব্রত —এই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারলো না। একবার ভাবলো বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসে—তারপর কি ভেবে আর গেলো না। স্থাণুবৎ 'বসে' রইলো। অনন্ত ভাবলো, একবার কথা বলি—কিন্তু শেষ অবধি বলতে পারলো না; উঠে দাঁড়ালো; দরজার কাছ থেকে বাইরেটা দেখে এসে—দাঁড়িয়ে পড়লো। বারো-তেরো বছরের মেয়ে ইন্দিরার পক্ষে বোঝা সম্ভব হোলো না অনন্তর মনের মধ্যে কী ঝড় চলছে। বিচলিত, বিব্রত অনন্তকে দেখে সে নির্বাক হয়ে বসে রইলো। বাইরে থেকে মাঝে-মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক এলো। চাঁদের আলোয় নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো অনন্ত। ইন্দিরাও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো—বিছানা পার হয়ে কয়েক পা হাঁটলো। অনন্তর কাছে এসে দাঁড়ালো। পুরো ব্যাপারটা অসহ্য লাগলো অনন্তর। সমস্ত মুখে ঘাম দেখা দিলো। ইন্দিরার গায়ের রং শ্যামলা, ঠোঁট ঈষৎ পুরু, নাকটা সামনের দিকে সামান্য চাপা; ছোটোবেলায় পড়ে' যাওয়ার চিহ্ন। অনন্ত ওর দিকে তাকিয়েই মুখটা ফিরিয়ে নিলো। আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ইন্দিরা তখনও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। অনন্ত ভদ্রতা করে' বললো। মাথা ধরেছে।

কখন যেন অনন্ত এসে বিছানার ওপর বসে পড়লো। কাঁপা-কাঁপা হাতে পান নিলো। জানালার দিকে তাকাতে চোখে পড়লো এক টুকরো মেঘ চাঁদের আলোটাকে ঢেকে দিচ্ছে। নিস্তেজ চাঁদের আলোয় অনন্তর মনে পড়লো আর একদিনের কথা। সহসা সে ইন্দিরার উদ্দেশে বললো, 'বললাম না—আমার মাথা ধরেছে!' কথাটা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠলো। এইভাবে, অনেকক্ষণ কেটে গেলো। রাত আরো নীরব, নিথর। শুধু দু জনের নিঃশ্বাস পতনের শব্দ। দুটি কম্পমান হৃদয়। অনন্ত শুয়ে পড়লো। ইন্দিরাও কুঁকড়ে গিয়ে অনন্তর পাশে শুলো, আর অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। ওর লাল ঠোঁট কেঁপে উঠলো থিরথির ক'রে—অনন্ত চাদর দিয়ে নিজের মুখটাকে ঢেকে নিলো। এইভাবে, কখন সে ঘুমিয়ে পড়লো নিজেই টের পেলো না। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখলো, ইন্দিরা নেই। মাথাটা দপদপ করতে লাগলো অনন্তর। ইন্দিরার জন্যে দুঃখিত হোলো সে।

অনন্ত কামরার বাইরে আসতে ওকে চান করানো হোলো। ইন্দিরার চান আগেই হয়ে গেছে। পাশাপাশি আসন ক'রে ওদের খেতে দেওয়া হোলো। কোনোক্রমে খাওয়া সেরে অনন্ত উঠে গেলো। সেই দিনটা সারাদিন ধরেই খাওয়া দাওয়ার পালা চললো। ওপরের একটা কামরায় অনন্ত চুপচাপ শুয়েছিলো। দু একজন বন্ধু হাসি-ঠাট্টা করার জন্যে এসেছিলো, কিন্তু অনন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ক'রে চলে গেলো। তারপর, আর কেউ আর আসে নি। খাওয়া-দাওয়ার হই হট্টগোলে ইন্দিরাকেও কোথাও দেখা গেলো না। দুপুরের দিকে এক বান্ধবী ওকে খুঁজে বের ক'রে হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'বল—প্রথম কী বললো?'

'ভাগ্—এখান থেকে!' ইন্দিরা একটু তিরিক্ষিভাবে জবাব দিলো।

বান্ধবী জবাব শুনে ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বললো, 'ঠিক আছে—তোকে বলতে হবে না। দরোজার আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি।' ইন্দিরা ভাববার চেষ্টা করলো বান্ধবী আড়ি পেতে কি শুনতে পারে।

আচার-অনুষ্ঠান শেষ ক'রে ওরা গাঁয়ে ফিরে এলো। নতুন ঘর—মেয়ের সঙ্গে মা-ও এলো। দু একদিন এমনিই কেটে গেলো। অনন্ত দিন দুয়েক খুব গম্ভীরভাবে কাটালো। তারপর ওকে হঠাৎ একটু সহজ দেখালো। মা মেয়েকে, একদিন দুপুরে, কাছে ডেকে পরামর্শ দিলো, 'তুই গিয়ে বিছানা-টিছানা ঠিক ক'রে দে। ওর কাছে শো। জোয়ান ছেলে...'

'হুঁ! আমার সঙ্গে কথা অবধি বলে না!' ইন্দিরা জবাব দিলো।

'ঠিক কথা বলবে। কদ্দিন ওই ভাবে থাকবে? ওকে চান করার জল এগিয়ে দে, কাপড় এগিয়ে দে—তোর সঙ্গে কথা না বললেও তুই ওর সঙ্গে কথা বল, মারতে তো আসবে না আর!' রুককা মনে মনে রেগে গেলেও ইন্দিরাকে ভালো কথায় বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো। আর, ইন্দিরা হাঁ হুঁ ক'রে জবাব দিয়ে গেলো।

ফিরে যাবার সময় রুককা সুন্দরাকে বললো, 'মেয়েকে রেখে গেলাম বোন—তোমরা দেখো। এখনো বয়স কম, অনেক কিছু বোঝে না—' তারপর, একটু কিন্তু-কিন্তু ক'রে, 'যদি বাইরে শোয়ার চেষ্টা করে—ভেতরে পাঠিয়ে দেবে। নাতি নাতনি তো চাই—'

সুন্দরা আশ্চর্য হয়ে জবাব দিলো, এসব কথা কেন? ওরা নিজেরাই সব ঠিক ক'রে নেবে।'

রুককা আর কোনো কথা না ব'লে এবার জামাইয়ের কাছে গেলো। অনন্ত কোথাও যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো। রুককা বললো, 'কাল আমি চলে যাচ্ছি—সামনের সোমবার আমাদের গাঁয়ে মেলা আছে। তুমি এসো। এ কদিন তো ঘোড়দৌড় ক'রে কেটে গেলো, বসে একটু কথা বলারও সুযোগ পেলুম না—'

'কিন্তু মেলার হট্টগোলে কী কথা হবে?' অন্যমনস্ক হয়ে অনন্ত প্রশ্ন করলো।

রুককা জামাইয়ের প্রশ্নের মর্ম উদ্ধার করতে না পেরে ভাবলো মেলায় আসাটা বোধ হয় সে পছন্দ করছে না। তাই তাড়াতাড়ি জবাব দিলো, 'মেলার হট্টগোলে আর কী এসে যাবে? তুমি আসবে

আমার বাড়িতে। কাজের বাড়িতে হয়তো কুছু গোলমাল হয়েছে—এবার আমরা নিজেরা কথা ব'লে সব ঠিক ক'রে নেবো। তোমার আর কী কী চাই—বলবে, তুমি তো আমার পর নও।'

অনন্ত কিছুটা শুনলো, কিছুটা শুনলো না কপালে টিপ প'রে বেরিয়ে গেলো। ফলে, রুককা আরো চিন্তিত হয়ে উঠলো।

বউ আসার পর থেকেই অনন্ত ঘরে আর বেশিক্ষণ থাকতো না। দোকানে এসে বসতো। রাম অবিশ্যি খুশিই হোলো, এদ্দিনে ছেলের মতি হয়েছে ব্যবসাপত্তর দেখার। রাম ভাবলো ছেলের হাতে দোকান তুলে দিয়ে সে এবার ক্ষেত-খামারের কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারবে। ঘরে বউ আসায় সুন্দরাও একটু অবকাশ পেলো। সে পাড়াপড়শির বাড়ি গিয়ে গল্প-স্বল্প ক'রে সময় কাটাতে লাগলো, বাড়িতে সব কাজ করতে লাগলো ইন্দিরা। এইভাবেই দিনগুলো গড়িয়ে গেলো। দোকানে বসা ছাড়া অনন্তর উপায় নেই, কেননা বেশির ভাগ ইয়ারদোস্তই কাজে ব্যস্ত। প্রায় সবাই কিস্তুরের কারখানায় শ্রমিক। সকালে যায়, সন্ধ্যেতে ফেরে। রাম আজকাল দোকানে গিয়ে ছেলেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এক বাণ্ডিল বিড়ি, আরো গোটা দশেক সুপুরি পকেটে ফেলে অনন্ত দোকান থেকে বেরিয়ে পড়তো। ফেরার সময় বালাপ্‌পার দোকানে একবার বসলেই—ব্যস, অনন্তর বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রাত এগারোটা বারোটা বেজে যেতো। বালাপ্‌পার দোকানেই অনন্তর পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা। বালা দোকানে একাই থাকতো। ফলে, দোকান খোলা-বন্ধ করাটা ছিলো নিজস্ব ব্যাপার। অনেক রাত অবধি তাস পিটে অনন্ত শুয়ে পড়তো বারোটা একটায়। ইন্দিরা আলো জ্বেলে জেগে বসে থাকতো; খুব ইচ্ছে করতো অনন্তর সঙ্গে কথা বলার। কখনো কখনো অনন্ত দু একটা কথা বলতো, আবার কখনো কিছু না ব'লে চুপচাপ শুয়ে পড়তো। এই-ভাবেই, ধীরে ধীরে, অনন্তর জন্যে অপেক্ষা করার অভ্যেসটা ইন্দিরার চলে' গেলো। আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়তো। অনন্ত এসে দরোজায় কড়া নাড়লে, দরোজা খুলে দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়তো।

এইভাবেই অনন্ত আর ইন্দিরার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বেশি হ'তে লাগলো। কাছে যেতে ইচ্ছে হ'লেও সেই ইচ্ছেটা আর বেশিক্ষণ থাকতো না। তবুও—

একই শয্যায় যুগলবন্দী হয়ে কোনো স্বামী স্ত্রী শারীরিক সম্পর্কহীন হয়ে থাকতে পারে? কিছুদিন পর, অনীহা সত্ত্বেও অনন্ত তার দৈহিক তাগিদ ইন্দিরার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে লাগলো। দাম্পত্য জীবন অস্বাভাবিক হ'লেও, ইন্দিরা এতেই খুশি হোলো খুব। দেখতে সুন্দরী না হলেও ঘরের কাজকর্মে ইন্দিরা ছিলো অতুলনীয়, কিন্তু ভীষণ অভিমানী। স্বল্পবাক, অভিমানী ইন্দিরার সঙ্গে অনন্তর সম্পর্ক এক নতুন খাতে বইতে শুরু করলো। চন্দুরে তারার সঙ্গে যে শেষ কথা হয়, অনন্তর তা প্রায়ই মনে পড়তো। আরো অনেক কথা, অসংলগ্ন পরিচিত দৃশ্যরা ভিড় ক'রে আসতো—অনন্তর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো দরদর ক'রে, মনে হোতো, সব হারিয়ে আজ সে নিঃসম্বল হ'য়ে গেছে। এই প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বে অনন্ত এক বিচিত্র মানুষে রূপান্তরিত হতে লাগলো দিনের পর দিন।

প্রথম দিকে সুন্দরা ইন্দিরাকে নানা পরামর্শ দিতো। ভুল-চুক হ'লে ইন্দিরাকে নরম সুরে বুঝিয়ে দিতো। কিন্তু যতো দিন যেতে লাগলো, ইন্দিরার ভুল-চুক ক্রমশ বাড়তে লাগলো। কাউকে গ্রাহ্য না করার মনোভাব প্রকট হয়ে উঠলো।

সুন্দরা একদিন জিজ্ঞেস করলো, 'ইন্দিরা তুই আজকাল এই রকম হয়ে যাচ্ছিস কেন?'

'কী রকম?'

'তুই তো আগের মতো থাকিস না।'

'আগে কী রকম থাকতাম?'

'সব কাজ মন দিয়ে করতিস। আমাকে কিছু করতে হোতো না।'

'তাই না কী?'

'লোককে ব'লে বেড়াতুম আমার বউয়ের মতো বউ হয় না—কিন্তু আজকাল তুই এমনভাব দেখাস যে যেন তুই এ বাড়ির কেউ ন'স।

জিনিসপত্তর ছত্রাখান ক'রে রাখিস, উনুনে কিছু উঁদলে তা উঁদলেই যায়—তুই দেখিসও না, শ্বশুর এলে গেরাহ্যি করিস না—'

'আমার যা খুশি তাই করবো! আমি খারাপ মেয়ে, আমার মাথা খারাপ—কেন তোমরা আমাকে এ বাড়িতে এনেছো?'

ছিঃ! ছিঃ! এসব কী বলছিস ইন্দু!' সুন্দরা সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিতো।

নিসর্গের নিয়ম নিজস্ব। শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া, কেউ কোনো কাজ করলো কি করলো না—নিসর্গ বিধানের কাছে এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। গর্ভবতী ইন্দিরা যথাসময়ে বাপের বাড়ি চলে গেলো। অনন্ত কখনো কখনো দোকান থেকে ঘরে ফিরতো, কখনো ফিরতো না। বালাপপার দোকানে ব'সে তাস পিটে ওখানেই শেষ অবধি শুয়ে পড়তো। সকালে চা খাবার জন্যে বাড়ি আসতো, নইলে অন্য কোথাও খেয়ে নিতো।

একদিন দুপুরে, কাজকর্ম সেরে সুন্দরা উঠোনে এসে বসেছে, এমন সময় এক বুড়ি এলো, 'কী করছিস রে সুন্দরা?' সুন্দরা জবাব দিলো। তারপর একথা সেকথার পর বুড়ি জানতে চাইলো, 'আজকাল কী অনন্ত ঘুমোবার জন্যেও ঘরে আসে না?

'কেন? আসে তো—'

'উঁহু! রোজ সকালে ওকে বালাপপার দোকানে দেখা যায়—'

'ওইটা তো ওদের আড্ডাখানা। দু চার জন এক হোলো তো তাস পিটতে বসে যায়—তাই বোধয়' কোনো কোনোদিন ফেরে না। তাছাড়া বাড়িতে বউও নেই!'

বুড়ি এবার কথাটা ঘুরিয়ে বললো, 'তা বুঝলুম, তবে কিনা—এখন জোয়ান বয়েস, একটু সামলে চলা ভালো, আশপাশে দু একটা সোমত্থ মেয়ে থাকলে—বুঝলে না?'

সুন্দরা বুঝলো। কিছুদিন ধ'রে অনন্তর চালচলন দেখে সুন্দরারও একটা সন্দেহ হচ্ছিলো। তবুও, বুড়ির সামনে একটু তেজী ভঙ্গিতে

বললো, 'আশপাশে সোমত্থ মেয়ে আছে তো কী হয়েছে? গাঁয়ে কী সোমত্থ মেয়ে থাকে না?'

বুড়ি চুপ ক'রে গেলো, 'না—না, তা বলছি না। তোর ছেলের কথা বলছি না। বলছি, আজকালকার ছুঁড়িদের কথা—'

'কার কথা বলছো? একটু খুলেই বলো না!'

'ওই যে সন্ধ্যা—আমাদের সাতওয়ার মেয়ে, ওর কথা বলছি। দেখলে মনে হবে বামুনের মেয়ে। গায়ের চামড়াটা একটু ফর্সা, তার ওপর একটু লেখাপড়া জানে। কান অবধি চুলের কেআরি—কে বলবে ছুঁড়িটা একটা মজুরের মেয়ে! ওর মা বাপ বোধহয় বিয়ে দেওয়ার কথাও ভাবে না। সর্বক্ষণ বসিয়ে রাখে বাড়িতে —'

'বসিয়ে রাখে তো কি হয়েছে?'

'হয়নি কিছুই—মাঝখান থেকে মেয়েটা বিগড়ে যাচ্ছে। আমার তো মনে হয় একদিন ওকে নিয়ে গাঁয়ের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করে বসবে!'

কথাটা শুনে সুন্দরা অস্বস্তি বোধ করলেও, মুখে সে ভাব প্রকাশ করলো না, বললো, 'মারপিট করলেই হোলো মুখের কথা নাকী?'

20

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। আপপা ক্ষেত থেকে ফিরে এলো। মাথার ওপর চারার বোঝা। বোঝাটা নামাতে-নামাতে সে মা'কে জিজ্ঞেস করলো, এখনও খাওনি?'

'না। তোর সঙ্গে খাবো বলে বসে আছি।'

'দাঁড়াও তাহলে দুধটা দুয়ে আনি।...ও কখন গেলো?'

'যায় নি তো! ঘরেই আছে।'

'কেন?'

'গাড়ি এলে তবে তো যাবি। গাড়িই আসে নি। বেচারা

অনেকক্ষণ ব'সে থেকে, সন্ধ্যেবেলায় সিন্দার হাত দিয়ে কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'কী দরকার ছিলো কাপড় পাঠাবার? আমাদের যখন ওরা গেরাহ্যি করলো না—'

'তাতে কী হয়েছে? পরে আমাদের কেউ দোষ দিতে পারবে না। তাছাড়া রত্নার কথাটাও ভেবে দেখা উচিত।'

'কিন্তু এই রকম যেচে মান কেঁদে শোক ক'রে লাভ কী? দায়সারা গোছে, চলতি পথে এখান থেকে ঘুরে গেছে—যদি সত্যিই চাইতো আমি বা আমরা যাই, তাহ'লে ঠিক সন্ধ্যে অবধি আমার জন্যে অপেক্ষা করতো। তারা পাগল—তাই ওখানে যাবার জন্যে ছটফট করেছে—এক বছর হোলো বিয়ে হয়েছে, একবারও তো এসে জিজ্ঞস করেনি 'তোমরা কেমন আছো'—আপপা এমনিতেই রেগে ছিলো, তার ওপর তারা কাপড় পাঠিয়েছে শুনে আরো রেগে গেলো। ভেতরে এসে তারাকে বিদ্রূপ করলো, 'কী কেমন খাওয়া-দাওয়া হোলো?'

তারা উনুনের আঁচ ঠিক করছিলো জল গরম করার জন্যে। কেন যে গাড়িটা এলো না—মামা তো এ রকম করেন না কখনো। অনন্তর কিছু—মানে অসুখ-বিসুখ করলো না তো? নাকি মেয়েকে নিতে রাজি হোলো না? ...তারা এইসব ভাবছিলো সজল চোখে, ফলে আপপার প্রশ্ন সে শুনতে পেলো না।'

'কথা বলছো না যে?' আপপা আবার বললো, 'ওরা তোমাকে নিতে আসেনি ব'লে আমার ওপর ঝাল ঝাড়ছো না কী?'

তারা সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠলো। যেন ঘুম থেকে জেগে চোখ মুছলো, মৃদুস্বরে জবাব দিলো, 'না—না তোমার ওপর রাগ করবো কেন তুমি আমার কে...?' এইভাবে নিজের দোষ স্বীকার করায় ভালোই হোলো। ওর চোখের জল আপপার নজরে পড়লো না, কিন্তু আপপা রেগে গেলো ওর কথা শুনে।

'বটে! আমি তাহ'লে তোমার কেউ নই?'

তারা সঙ্গে-সঙ্গে টের পেলো মুখ ফসকে কি ভয়ানক কথা বেরিয়ে

গেছে।

সে চেষ্টা করলো কথাটার মোড় ফিড়িয়ে দিতে, 'ঈস! কী বলতে কি বলে ফেলেছি! আসলে গাড়িটা আসেনি—তাতে তোমার কী দোষ এই কথা বলতে গিয়ে একেবারে উলটো কথা বেরিয়ে গেছে—আমাকে মাপ ক'রে দাও, ছিঃ ছিঃ, আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, ওদের ওপর রেগে তোমাকে কি যাতা কথা বলে ফেললাম!'

আপপার রাগ জল হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। সে-ও বউয়ের সঙ্গে সায় দিলো:

'ছেড়ে দাও ও-সব মামা-টামার কথা, কে কার আত্মীয়! কে কার সম্পর্কের ধার ধারে? আমারও কিছু কমতি আছে না কী? নিতে আসেনি তো ভারি বয়েই গেলো!'

এইভাবে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হোলো। অম্বা শুধু বললো, 'এ রকম করাটা ওদের, যাই বলো বাপু, ঠিক হয় নি। আসলে, হারটা নেবার জন্যে ওরা বউকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল।'

'হার?' আপপা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার বিয়ের সময় পরতে দিয়েছিলো। ফেরত দেওয়া হয় নি। কত দিন আর ফেলে রাখা যায়—তাই নিতে এসেছিলো।' উনুনের আঁচ বেড়ে যাওয়ায়, জলের ঝাপটা দিয়ে আঁচ কমাতে-কমাতে তারা জবাব দিলো।

'ওহ্—তাই হারটা দেখতে পাচ্ছিলুম না বটে। আমি ভাবলুম ভেঙে টেঙে গেছে, তাই তুলে রেখেছো।'

অম্বা বললো, 'পরশু থেকেই তো ও খালি গলায় আছে।'

আপপা আবার রেগে গেলো, 'তোমার মা-ই বা কী—অন্য লোকের গলার হার তোমার গলায় দিলো।'

'মা কি আর নিজের-পরের ব'লে ভেবেছিলো। এ্যাদ্দিনে হয়তো আমার জন্যে নতুন হার গড়িয়ে ফেলেছে।'

'মা বানাক, না বানাক—আমি বানিয়ে দেবো। কিন্তু তোমার মামা কী ব'লে হারটা খুলে নিয়ে গেলো তোমার গলা থেকে?'

অম্বাও কথাগুলো শুনেছিলো। আপপা মাকে শুনিয়ে বললো, 'দেখা হোক আর একবার—মজা বুঝিয়ে দেবো তোমার মামাকে।'

দুপুর-থেকে-চেপে-রাখা ক্ষোভ এবার অম্বা প্রকাশ করলো, 'না—না, তোকে কিছু করতে হবে না আর। নেমন্তন্ন ক'রে গাড়ি পাঠায় নি, আমাদের কী কোনো ইজ্জত নেই? ওদের সঙ্গে আমরা আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না।'

শাশুড়ির রায় শুনে তারা স্তম্ভিত হোলো। রাতে খেতে অবধি পারলো না। মনে-মনে গাঁয়ের দেবী লগম্বার কাছে কাতর প্রার্থনা জানালো: অনন্তর মুখ যেন দেখতে পাই মা।

এর ঠিক কয়েকদিন পরেই রত্না এলো। বললো, 'ভেবেছিলুম তুই অনন্তদের 'কাজে' আসবি—শুনলুম রাস্তা গোলমালের জন্যে নাকি গাড়ি তোদের এখানে আসতে পারে নি—'

'তুমি কদ্দিন ছিলে ওখানে? অনন্ত কী কী পেলো? বাবা কেমন আছে?' তারা পর পর অনেকগুলো প্রশ্ন করে গেলো।

রত্না জবাব দিলো, 'অনন্তর বাবা আগে-ভাগেই নগদ টাকা নিয়েছে—যার জন্যে জিনিসপত্র তেমন কিছু পায় নি। তোর জিনিসপত্তর অনেক বেশি দামী ছিলো। আট দিন ওখানে ছিলুম...'

গাড়ি না পাঠাবার কারণ শুনে তারা সক্ষোভে মন্তব্য করলো, রাস্তার লোককে যেভাবে ডাকা হয়—সেইভাবে ডাকা, হয়েছিলো আমাকে। কী দরকার ছিলো আমাকে এমন ঘটা ক'রে নেমন্তন্ন করার?' তারা বেশ রেগে মা'কে দু চার কথা শুনিয়ে দিলো।

রত্না প্রবোধ দিলো, 'যেতে দে এসব কথা? জনে জনে তো আর গাড়ি পাঠানো সম্ভব নয়। আমার জন্যে একটা গাড়ি পাঠিয়েছিলো—ভেবেছিলুম ওই গাড়িতে তোকে নিয়ে যাবো এখান থেকে, কিন্তু মেয়েদের কথা কে শোনে? সামনের গাড়ি দুটো হু-হু করে এগিয়ে গেলো, আমরা ছিলুম পেছনে। অনন্ত নাকি বার-বার বলেছিলো... .'

অম্বাও শুনলো সব। তারপর রত্নাকে বললো, 'অনেকদিন পর

এলে—তোমরা মা মেয়ে গল্প করো, আমি একটু কাজ সেরে আসি।'

রত্না জবাব দিলো, 'আরে—তুমিও বসো না, সবাই গল্প করি।'

তারা বললো, 'আমার শাশুড়ি ওই রকম। আমার জন্যে যেই আসুক, তাকে বসিয়ে খাতির করে 'কাজ আছে' ব'লে বেরিয়ে যায়। যখন বাবা এসেছিলো···হাঁ, বাবা কেমন আছে? বাবাকে রান্না ক'রে দিচ্ছে কে এখন?'

'পাড়াপড়শিরা ব্যবস্থা করছে। আমি ব'লে ক'য়ে এসেছি সব। তুই কেমন আছিস বল, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয় না তো?' অম্বার হঠাৎ চলে-যাওয়াটা রত্নাকে একটু অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।

মা'র জন্যে চা করতে ব্যস্ত, তারা প্রশ্নটা শুনলো। মা'কে অভয় দিলো, না, তেমন কোনো গণ্ডগোল নেই। মনের সমস্ত ক্ষোভ সে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলো। তবুও, রত্নার স্পষ্ট মনে হোলো কোথায় যেন বিরাট একটা গরমিল রয়েছে, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না।

রত্না এসেছে ব'লে আপপাও খুব খুশি হোলো। বউকে ঢালাও হুকুম দিলো ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে। এই উপলক্ষে, কৌড়বলে, চাকলি জাতীয় মিষ্টি পাঠালো আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। সবাইকে মিষ্টি দিয়েও—মিষ্টি শেষ হেলো না। শাশুড়ির কথামতো রত্নার জন্যে যেসব খাবার করা হয়েছিলো, তাও বেশি হওয়ায় আশ-পাশের সবাইকে ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে দেওয়া হোলো। আপপা রত্নাকে আরো দিন চারেক থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ জানালো। অগত্যা রত্না থেকে যেতে রাজি হোলো। কিন্তু, রত্না চুপচাপ বসে থাকার পাত্রী নয়—সেও মেয়ের সঙ্গে ঘরের কাজে হাত লাগালো। মেয়েকে চান করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হোলো, এখনে নিশ্চয়ই ওর ভালো ক'রে চান হয় নি বহুদিন—পিঠ রগড়ে ঘসে পরিষ্কার ক'রে দেবার মতো এখানে তো কেউ নেই। অম্বা রত্নাকেও চান ক'রে নিতে বললো তারার হাতে, 'ওখানে কে বাপু তোমার পিঠ ঘসে দেয়?'—রত্না জবাব দিলো, 'আমার কথা ছেড়ে দাও বোন!'

অম্বার সঙ্গে রত্নার গল্প ভালোই জমলো। অম্বা সহসা কৌতুহলী

হয়ে জানতে চাইলো, 'রত্না—তোমার ননদের বউ কেমন হয়েছে, বললে না তো? নতুন সংসার কেমন চলছে?'

রত্না জবাব দিলো, 'সে আর শুনে কাজ নেই। প্রথম চার মাস ঠিক ছিলো সব, তারপর আবার সেই ফ্যাসাদ শুরু হয়ে গেলো।'

'কেন?'

'কী ক'রে বলি দিদি—চিম্মি তো ছেলে ছাড়া আর কিছু বোঝে না।'

'ছেলের বিয়ে দিতে গেলো কেন, তাহলে?'

'তা আর বলে কে! চিম্মির সঙ্গে নতুন বউয়ের এমন ঝগড়া হোলো খাওয়া-দাওয়া নিয়ে যে, বউ যে সেই বাপের বাড়ি গেলো, এখনো ফেরার নাম নেই। পাড়ার লোক তিন তিনবার গেলো বউকে ডাকার জন্যে, কিন্তু সে এলো না। এখন চিম্মির মেয়ের ওপর শোধ তুলছে বউয়ের বাপের বাড়ির লোক!'

'ভীম কোথায় এখন?' মাঝখান থেকে তারা ফোড়ন কাটলো।

'লোকে তো এখন ওর মুখে থুথু দেয়! চিম্মার সঙ্গেও হয়ে গেছে একচোট। কেউ কারুর সঙ্গে আর কথা বলে না।'

'বউয়ের বাপের বাড়ি কী বলছে?' অম্বা জানতে চাইলো।

'জামাইয়ের আলাদা থাকার বন্দোবস্ত করো—তবে মেয়েকে পাঠাবো। নইলে চিম্মা ওখানে গিয়ে থাকুক।'

'জামাইয়ের বয়েস তো কম?'

'কম? হুঁ! মা-ব্যাটা একসঙ্গে থাকলে বউয়ের সঙ্গে খিটিমিটি হবে—এটা বোঝার মতো বয়েস নিশ্চয়ই ওর হয়েছে।'

রত্নার মন্তব্য অম্বার ভালো লাগলো না। ভাবলো, কাল তো আমার সম্বন্ধেও রত্না একথা বলতে পারে।

'তোমারও গা ধুইয়ে দিই?' রত্না প্রসঙ্গান্তরে এলো।

'না—না।' অম্বা সংকোচ বোধ করলো, 'তুমি একেবারেই আসো না। অনেকদিন পর এসেছো, ভালো ক'রে চান করে নাও।'

'আসতে তো বার বার চাই দিদি—কিন্তু যতো রাজ্যের কাজ…'

'আমি তো তারাকে নাইয়ে দিতে পারি—' পুরোনো দিনের বুড়ি অম্বা তারাকে কীভাবে স্নান করাতে পারে, পিঠ ঘষে ঘষে, তারই একটা আভাস দিলো সরল মনে।

'তাতো দিতে পারো—তারা তোমার বাড়ির বউ, আবার মেয়েও!' তারপর মেয়েকে, 'তুই তো এঁকে মাসে সাত আটবার নাইয়ে দিতে পারিস। বড়োদের সেবা করলে পুণ্যি হয়—উনি আশীর্বাদ করলে তোর চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে হতে পারে।'

অম্বা আকাশের দিকে হাত দেখালো, 'আমিও তো ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা করি ভাই। গত মাসে 'আটকে' গেলো—আমি ভাবলুম 'হোলো' বুঝি—তারপর দেখি সব সাফ হয়ে গেলো। সবই ভগবানের দয়া। তারা—দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে এ বাড়িতে আসা অবধি—অথচ এ-বাড়িতে তো ভাত-কাপড়ের কোনো অভাব নেই।'

'কিছু ভেবো না দিদি—ভগবানের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সেইদিন ভালো ক'রে তেল মাখিয়ে রত্না মেয়েকে চান করিয়ে দিলো। পরের দিন, মেয়ে মাকে। শাশুড়ি আসার পর থেকেই আপপা বাইরে শুতো। রাতে, মা মেয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলতো। বাইরে থেকে, অম্বা ওদের কথা স্পষ্ট শুনতে পেতো না। ভাবতো, অনেকদিন পর মা মেয়ের দেখা হয়েছে, তাই এতো কথা। একদিন, প্রায় ভোরবেলা অবধি মা মেয়ের মধ্যে কথাবার্তা চললো।

'আপপা এখনো গাঁয়ে যায় না কী মাঝে মধ্যে?'

'তা—সুযোগ পেলেই যায়। ওকে ঠিক ছাড়তে পারে না।'

'এসব কিছুই জানতুম না', রত্না বললো, 'তা না হলে···'

'সবই আমার কপাল!'

তারার আক্ষেপ শুনে রত্নার হৃৎপিণ্ড উপড়ে যাওয়ার অবস্থা হোলো। দু জনে অনেকক্ষণ ধ'রে চুপ করে রইলো। বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা তারার চোখ দিয়ে গালের ওপর গড়িয়ে পড়লো। রত্না ওর চোখের জল মুছে সান্ত্বনা দিলো: তোর সঙ্গে যখন ভালো ব্যবহার করছে···পুরুষকে আটকায় এমন সাধ্যি কোন মেয়ের আছে, বল?

সবদিক দিয়ে সামলে চল—'

'আমি সোনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আসে নি। বাচ্চাটা—চম্পা আসে। তা সে-ও দিন চারেক আসে নি, বোধ হয় গাঁয়ে চলে গিয়েছিলো।'

'বাচ্চাটা দেখতে কেমন—সুন্দর?'

'হ্যাঁ। আবার খুব চালাক। একরত্তি বাচ্চা হ'লে কি হবে—ভীষণ বুদ্ধি! আগে কিছু দিলে নিতো না, এখন কিছু দরকার হ'লে আমার কাছে সোজাসুজি চেয়ে বসে—না পেলে ছাড়ে না! আমাকে খুব ভালোবাসে, আবার ও না এলে আমারও খুব খারাপ লাগে। আমার কপালে বাচ্চা নেই।'

'রেখে দে বাচ্চা! বাচ্চা হ'লে এমন কী হাতি-ঘোড়া হবে?' মেয়ের দুঃখে রত্না প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করলো, 'তুই আমার একমাত্র মেয়ে, ভেবেছিলুম দ্বিতীয়বার বিয়ে হোলো—তোর ঠিক বাচ্চা-কাচ্চা হবে। কিন্তু তোর বাচ্চা হচ্ছে না কেন—একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখিস।'

'জিজ্ঞেস করার কী আছে? সব ঠিক আছে।'

রত্না তারার মুখের দিকে তাকালো, 'কী ঠিক আছে?'

'এবার—মানে—'বন্দ' হয়ে গেছে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

রত্না খুব খুশি হোলো কথাটা শুনে। মেয়েকে বললো, 'তা কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল কেন? দিনক্ষণ ঠিক রেখেছিস তো?'

তারা চুপ ক'রে রইলো অনেকক্ষণ।

'তারা?'

'কী?'

'তুই তো ভালো ক'রে কিছু বলছিস না। তোর ছেলে হবে ব'লে আমি দিন রাত্তির ভগবানকে ডাকছি—অথচ তুই কিছু খুলে বলছিস না!'

'কী বলবো?'

'তুই ঠিক বুঝতে পেরেছিস?'

'হুঁ। কিন্তু···ঠিক বলতে পারছি না।'

তারা পাশ ফিরে শুলো। রত্না মনে হোলো তারা যেন কিছু একটা লুকোতে চাইছে। রত্না ওকে ঠিক দোষী ব'লে মনে করলো না, বেচারা সারাজীবন বহু দুঃখ ভোগ করেছে।

পরের দিন রত্না আপপাকে বললো, 'এবার আমি যাই।'

'আরো দু চারদিন থেকে যান।'

'না গেলেই—ঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে। গাই দোয়া, ক্ষেতে যাওয়া—সব কাজই করতে হয়। তাছাড়া, ফসল কাটার সময় হয়েছে—' রত্না জামাইকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

'তাহলে চলুন—আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো। গোরুর গাড়ি তৈরি ক'রে নিই।'

রত্না খুব আশ্চর্য হোলো। আপপা এ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি যাওযার কোনো আগ্রহ দেখায় নি। জামাই-আপ্যায়নের জন্যে খরচের কথা ভেবে রত্না মনে-মনে একটু আশংকিত হোলো। আপপা যেচে বলছে—ওকে বারণ করা অসম্ভব। কাজেই হাসি মুখে সে বললো, 'বেশ তো চলো—দিন দুই থেকে আসবে। কিন্তু তোমার এখানকার কাজের কোনো ক্ষতি হবে না তো?'

'না,নী এখন আর হাতে ততো কাজ নেই। ক্ষেতের কাজ সিন্দা চালিয়ে নেবে—তাছাড়া আমি তো ফিরে আসবো চটপট।'

গাঁয়ের লোককে দেখিয়ে দেবে, চিমমাও দেখবে তারার বর কেমন কাজের লোক। রত্না বললো, 'চলো তাহ'লে আজই যাই।'

খাওয়া-দাওয়ার পর আপপা বাকসো থেকে একটা নতুন শাড়ি বের করলো। অম্মা রত্নাকে বললো, 'বাজার যেতে পারে নি—এখান থেকে বাজারটা অনেক দূরে। গাঁয়েও কাপড়ের দোকান নেই—এই শাড়িটা ছিলো ঘরে—তুমি পরে নাও।'

'এখন কেন? পরে এলে না হয়···'

'পরে এলে আবার একটা শাড়ি দেবো। এটা এখন পরে' নাও।' অম্বা একটু জোর করলো, 'বিয়ের সময় তোমাকে দেওয়া হয় নি—এখন তো নাও।'

খুশি-মনে রত্না শাড়িটা পরে ফেললো। বাইরে সিন্দা গোরুর গাড়ি নিয়ে তৈরি। পরনে নতুন ধুতি, হাতে নতুন চাবুক—আপপাও বেরিয়ে এলো। তারা কাপড় চোপড়ের একটা গাঁট এনে গাড়ির মধ্যে রেখে দিলো। রত্না অম্বাকে নমস্কার করে, তারাকে আদর দিয়ে গাড়িতে উঠলো। মা মেয়ে—দু জনেরই চোখে জল। আপপা একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে বললো: দিন চারেকের মধ্যেই ফিরে আসবো। আপপার মুখে হাসি দেখে রত্না আরও খুশি হোলো। গোরুর গলায় টুং টুং করে ঘুঙুর বেজে উঠলো। যতদূর চোখ যায়—শাশুড়ি আর বউ চলন্ত গাড়িটা দেখতে লাগলো।

আপপা আসলে শ্বশুরবাড়িতে ঠিক বেড়াতে আসে নি। এসেছিলো ফসল কাটার কাজে শ্বশুরকে সাহায্য করার জন্যে। সারা চন্দুরের লোক নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো: 'দেখেছো কেমন জামাই—সারা দেশ খুঁজে বেড়ালেও এতো ভালো জামাই পাওয়া শক্ত।' কেউ কেউ বললো, 'মল্লর আর আছে কে? একদিন তো সবই আপপা পাবে।' এসব কথা আপপারও কানে এলো। তবুও সে খুব খুশি হয়ে দৌড়ঝাঁপ ক'রে সব কাজ শেষ করে ফেললো দিন চারেকের মধ্যে। তারপর, এক তোলা সোনার একটা আংটি, নতুন ধুতি, পাগড়ি, আরো কিছু কাপড় নিয়ে সে পাঁচ দিনের দিন ফিরে এলো নিজের গ্রামে। সে স্পষ্ট এই ধারণা নিয়েই ফিরলো যে শ্বশুর-শাশুড়ির সম্পত্তি একদিন তার হাতে আসবে। ফিরে এসে সে তারাকে বললো, 'গ্রামে পৌছতে তোমার ভরমার মা আমার গাড়ির ঘণ্টা শুনে বেরিয়ে এসেছিলো—তারপর আমার গাড়ি দেখে মাথা নিচু ক'রে চলে গিয়েছিলো।

তারকা খুশি হোলো, 'সত্যি? তোমরা কখন পৌছেছিলে?'

'তা তখন রাত একটা। তোমার মা যেদিক দিয়ে বললেন সেই

দিক দিয়ে গাড়ি চালালুম ধীরে ধীরে—তোমায় মা-ই চিনিয়ে দিলেন। বললেন, ওই চিমমা…'

'আগে ওনাকে কখনো দেখো নি?'

'ওই কালামুখীকে কেন দেখতে যাবো? তা ছাড়া বিয়ের পর এই প্রথম গেলুম তোমাদের গাঁয়ে। হ্যাঁ, ওদের বউ ফিরে আসছে।'

'ফিরে আসছে?'

হ্যাঁ। মা ব্যাটা ঝগড়াঝাটি ক'রে আলাদা হয়ে গেছে। মা সবার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করেছে—কিন্তু কেউ ওকে পাত্তা দেয় নি।'

তারপরই আপপা আর একটা কথা বললো: নদীর ধারে তোমাদের উঁচু জমিটায় দাঁড়িয়ে কাজ করতুম—নদীতে জল-আনতে-যাওয়া মেয়েরা আমাকে খুব দেখতো, একদিন তো একটা মেয়ে আমাকে দেখতে গিয়ে মাথা থেকে ঘড়াটাই ফেলে দিলো!

আপপার কথা শুনে তারা মনে-মনে হাসলো: দেখার মতোই সুপুরুষ বটে তুমি!

এইভাবেই পাঁচ ছ বছর কেটে গেলো। তারার কোনো ছেলেপুলে হোলো না। ফলে, মানসিক অশান্তি আরো বেড়ে গেলো। শরীর ভেঙে পড়তে লাগলো দিন দিন। মাঝে-মাঝে মাসিক হোতো বেশ দেরিতে। পেটে যন্ত্রণা হোতো। দু এক জায়গায় ডাক্তার দেখিয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করাতে—কিন্তু তা আর সম্ভব হয় নি। ঘরের সব কাজই সে খুব চমৎকারভাবে করতো, যার জন্যে বাড়ির সবাই খুব পছন্দ করতো ওকে। প্রতিবেশী, চাকর-বাকর—সবাই তারাকে খুব ভালোবাসতো।

আপপার চালচলন একটু বদলেছে। মাঝে-মাঝেই সে রত্নার সঙ্গে দেখা করতে শ্বশুরবাড়ি যায়। তারাকেও কখনো-সখনো নিয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে ওখানে গিয়ে ক্ষেতি-বাড়ির কাজ কর্ম করে আসে। ফসল কাটার সময় বউকে পাঠিয়ে দেয়—আবার কখনো বা রত্নাকে নিয়ে আসে। এইসবের জন্যে, মল্লও জামাইকে খুব পছন্দ করে। আপপার ভাব দেখে মনে হোতো, শ্বশুরবাড়িটা তার নিজের বাড়ির

মতোই। একবার, হীরাগিরিতে রত্না গেছে, কি কথার ফাঁকে অনন্তর কথা উঠতেই, আপপা ভীষণ রেগে গেলো। বললো, 'ওই ছোকরার নাম অবধি করবেন না আমার সামনে! আমাকে ভালো না লাগলে—আপনারা ওর ওখানে যেতে পারেন।' জামাইয়ের কথা শুনে রত্না শঙ্কা বোধ করলো। সে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, বাবা-বাছা ক'রে জামাইয়ের রাগ ভাঙালো।

ছেলেপুলে না হওয়ার জন্যে আপপাও মাঝে-মাঝে খুব হতোদ্যম হয়ে পড়তো। নিরুদ্বেগ নিরুত্তাপ জীবন যাপন করতে-করতে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে পড়েছিলো ওর কাছে। মাঝে-মাঝে ভাবতো সন্তানের জন্যে আর একটা বিয়ে করে। তারপরই ভাবতো, এই বয়সে কে আর ওকে মেয়ে দেবে। তার ওপর বউ থাকতে। সেইসঙ্গে, শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির কথাও সে ভেবে নিতো। আপপা যতই ওর মানসিকতা অপ্রকাশিত রাখার চেষ্টা করুক, তারা সবই বুঝতে পারতো। বিষণ্ণ তারা বলতো, 'আর একটা বিয়ে ক'রে ফেলো বাচ্চার জন্যে।'

'ধ্যুস, কী যে বলো! এইতো বেশ আছি। কি এমন হাতি ঘোড়া সম্পত্তি আমার যে—ছেলে না হ'লে চলছে না?' আপপা জবাব দিতো।

আপপার মনের কথা আঁচ করে তারা আর একটা কথা বলতো, 'বিয়েটা না'হয় যখন হোক কোরো কিন্তু ডাক্তার দেখাও একবার। ফোঁড়া-টোঁড়া হ'লে একেবারে সারতে চায় না তোমার—মা বলছিলো তোমার রক্ত খারাপ হয়ে গেছে।' নিজের বক্তব্য শাশুড়ির দোহাই দিয়ে তারা ব'লে ফেলতো।

আপপার এক খুড়তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে এনাপুরে পাকপাকি হোলো। বিয়ের তোড়জোর পড়ে গেলো বাড়িতে। তারার খুড়শাশুড়ি তারাকে ডেকে বললো, 'তোরাও চল।' ফলে, আপপাও এনাপুরে যাবার জন্যে তৈরি হোলো। তারার যেতে অতটা ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু আপপার আগ্রহে রাজি হতে হোলো।

তারা বললো, 'এই মূর্খ নিয়ে এনাপুর যাবো কেমন ক'রে?'

'কেন ? আমরা কী ওর বাপের অন্নে আছি ? স্রেফ—নেমতন্ন খাখতে যাচ্ছি '

'ওখানে গিয়ে যদি মামার বাড়ি না হয়ে আসি—তাহলে লোকে কী বলবে !'

'কী আবার বলবে !'

'মামার শ্রাদ্ধের সময় যেতে দাওনি।'

'কেন দেবো শুনি ?' আপপা রেগে গেলো। 'তোমার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে গিয়েছিলো মনে নেই ? বিয়ের সময় তো একটা শাড়িও দেয়নি তোমাকে—হুঁ, মামা হয়েছেন ! ওদের কথা, আমার সামনে তুমি মুখে এনো না '

আপপার অভিব্যক্তিতে তারা আহত হোলো। ইচ্ছে ছিলো এনাপুরে গিয়ে অন্তত অনন্তর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসবে। তারা প্রতিবাদ করলো, 'ভয় নেই—আমার মা বাবা জায়গা জমি ওদের দিয়ে যাবে না !'

ব্যাস, আগুনে ঘি পড়লো। প্রচণ্ড রাগে জ্বলে ওঠে আপপা নিজেকে সংযত ক'রে নিলো। কথা বাড়ালেই এখন ঝগড়া হবে। সে নিঃশব্দে, রাগে-লাল-চোখ নিয়ে তাকালো। তারপর বেরিয়ে গেলো।

পরের দিন এক প্রতিবেশী অনন্তকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাতে তারা এসেছিলো তোমাদের বাড়িতে ?'

'ন্‌না তো।' অনন্ত আশ্চর্য হোলো, 'কেন ?'

'বিয়ে বাড়িতে এসেছিলো। ভাবলাম তোমাদের বাড়িতেও গিয়েছিলো।'

'হয়তো রাতে এসেছিলো, আমি জানতে পারি নি···'

পাশের কামরায় সুন্দরার কানেও কথাটা গেলো, 'তারা আর এখানে আসবে কেন ? পায়া ভারি হয়ে গেছে। উনি মারা যেতেও আসেন নি। কী যে হয়েছে ওর—ছোটোবেলায় কতো যাতায়াত করেছে। ভালো বর জুটেছে, আমাদের এখন ক্ষুদ-কুড়ো ব'লে মনে

করে।' সুন্দরা ক্ষুব্ধভাবে কথাগুলো বললো।

অনন্ত নিশ্চুপ হয়ে বেরিয়ে গেলো। পথে, আপনা থেকেই ওর পা এগিয়ে গেলো বনকুন্দরেদের বিয়েবাড়িতে। বেশি রাতে কাজ শেষ হওয়ায় বর পক্ষের বেশির ভাগই ঘুমিয়ে। দু একজন সবে জেগে উঠেছে। একটা কামরার মধ্যে সাত আটজন মেয়ে-বউ ভাগাভাগি ক'রে শুয়ে। বাইরে বসা একটি লোককে অনন্ত জিজ্ঞেস করলো, 'তারা এসেছে নাকী ?'

অনন্তর গলা শুনে তারা বেরিয়ে এলো। অনন্ত তাকালো, একেবারে চেনা যায় না তারাকে। তারাও অনন্তর নিস্তেজ হৃতশ্রী চেহারাটা দেখে বিস্মিত হোলো। অনন্ত একটু গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কখন এলে তারা ?'

আচমকা পুরোনো দৃশ্য, পুরোনো কথাগুলো ঝাঁক বেঁধে এলো, তারা সেই পুরোনো দিনের মতোই মাথা নেড়ে জবাব দিলো, 'কাল রাতে।'

'অনেকদিন পর দেখা হোলো। কিন্তু শরীরের একী অবস্থা ?'

তারা জবাব দিলো না। মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'আপপু-ভাই কোথায় ?' অনন্ত জানতে চাইলো।

'যে বাড়িতে বিয়ে সেখানে গেছে। এসো, ভেতরে এসো-চা খেয়ে যাবে।' তারা আবার অনন্তর মুখের দিকে তাকালো কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারলো না তার শরীরের অবস্থা এমন হয়েছে কেন। অনন্ত ভেতরে যেতে চাইলোনা, কাজ আছে ব'লে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। বললো, 'তার চেয়ে তুমি আমাদের বাড়িতে এসো।'

'কখন যাবো ? সময় না পেলে ?'

'কেন, দুপুরে এসো।' ব'লে অনন্ত চলে গেলো।

বিয়ে ভালোভাবেই হোলো। কন্যা সম্প্রদান করলো তারা আর আপপা। ওদেরও গাঁটছড়া বেঁধে বসিয়ে, পুরুতমশাই তারাকে বললেন, 'স্বামীর নাম বললে গাঁট খুলবো। আপপা তোমার স্ত্রীর নাম কী ?' আপপা হাসতে হাসতে তারার নামটা বললো, আর তারা বিব্রতভাবে

জবাব দিলো, 'স্বামীর নাম নিতে নেই।' সমাগত মেয়ে-বউরা প্রস্তাব করলো, 'তাহ'লে তোমার বরের নামের সঙ্গে মিল আছে—এমনি কোনো ঠাকুরের নাম করো।' তারা, একটু ভেবে, জবাব দিলো, 'অনন্তনাথ ' সবাই ধরে নিলো মহাদেবের নাম।

একসময়, দুই চইয়ের ফাঁকে এক বুড়িকে তারা আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'রামু মামা মারা যাবার পর দোকানটা কে দেখে? ব্যবসা কেমন চলে?'

রামু মামা? তুমি কে বলো তো—ঠিক উত্তর করতে পারছি না।' বুড়ি জবাব দিলো।

'রামু মামা—আমার মামা–মা'র ভাই—'

'আরে! তুই তাহলে রত্নার মেয়ে? রামু তো আমার বড়দার ছেলে—তোকে একেবারে চিনতে পারে নি—।'

তারপরই বুড়ি বললো, 'রামুর কথা আর কী বলবো—ও-ও চোখ বুজোলো, সঙ্গে সঙ্গে সংসারটা ছারখার হয়ে গেলো! চার দিনের মধ্যেই দু ভাই আলাদা হয়ে গেলো—তা ছোটো জনের বউ খুব চালু—বড়ো, মানে, অনন্ত তো কিছুই খেয়াল করে না। কোনোদিকে মন নেই। সুন্দরা থাকে ছোটো জনের সঙ্গে। তেরভালের মেয়ে– অনন্তর বউ – রোজ রাত্তিরে কাওরা কিচকিচ ঝগড়া হয় দু জনের মধ্যে—ইন্দিরার দোষ কী, এমন বর, দোকানের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, নিজের ভাগে পাওয়া জমিজমা বেচে দিয়েছে—এদিকে দুটো বাচ্চা, তবুও অনন্তর আককেল নেই। ইন্দুকে তো ভালো মেয়ে বলতে হবে।'

'অহংকার করতে গিয়ে—' বুড়ি আরো বলে চললো, 'ওর সর্বনাশ হয়েছে। তারপর—' (গলা নামিয়ে) মেয়ের পাল্লায় পড়েছে। একটা মেয়েকে নিয়ে গয়া কোলহাপুর আর কোন কোন জায়গা থেকে নাকি ঘুরে এসেছে। এখন শুনছি, মেয়েটা নাকি এই গাঁয়েই আছে। মা বাপকে ছেড়ে মেয়েটা ভেগে এসেছিলো। মেয়েটার খরচ চালিয়ে, নিজের সংসার চালিয়ে ফতুর হয়ে যাবে না? বলো?'

বুড়ির কথা শুনে তারার চোখের সামনে অন্ধকার জমাট বাঁধলো।

মাথাটা ঘুরে উঠতে, মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়লো। বুড়ি ভাবলো রামু মামার দুঃখে তারা বোধহয় কাতর হয়ে পড়েছে। তারা কোনোক্রমে জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'দেখতে? ডাগর ডাগর চোখ—কপালে কুমকুম—অনেকটা তোরই মতো দেখতে। খালি তুই একটু শুকিয়ে গেছিস—ওই ছুঁড়িটা একটু গায়ে গতরে—' বুড়ি বললো, লেখাপড়াও জানে। কিন্তু লেখাপড়া জানা সুন্দরী হ'লে কী হ'বে—এই রকম একটা খারাপ কাজ করা কী ওর উচিত হয়েছে! ঝাঁটা মারো আবাগীর বেটিকে!'

তারা মনে মনে ভাবলো মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী।

বুড়ি তখনো ব'কে যাচ্ছে:

'এখন বল্—অনন্ত যদি অমনি করে কোন বউ তা সহ্য করবে? তার ওপর বউকে দেখাশোনা করাও ছেড়ে দিয়েছে—বাড়িতে তো আসেই না। খাওয়া-দাওয়া করে এখানে-ওখানে, চোখে ঘুম নেই—বাউণ্ডুলেদের মতো ঘুরে বেড়ায় এদিক-ওদিক। ফসল তোলার সময় ক্ষেতেই পড়ে থাকে—চাষীরাই বা কী করে! ঘরে ঢোকে—আবার চলে যায় সেই ছুঁড়িটার কাছে। শরীরটাও গেছে।'

'সেই জন্যেই—মানে শরীরটা এতো ভেঙে গেছে যে আমি চিনতেই পারি নি।'

'শরীর—কোনো রকমে ধুঁকে-ধুঁকে পথ চলে। আর কতদিন চলবে এইভাবে?'

সমস্ত বিবরণ শুনে তারার মুখ বিবর্ণ, সাদা হয়ে উঠলো। বুড়ির কাছে আরো জানা গেলো গত পরশু হাসপাতালে অনন্তর 'বুকের ভেতরের যে ছবি' তোলা হয়েছে—তাতে ওর ফুসফুসে একটা বিরাট ঝাঁঝরা পাওয়া গেছে। যক্ষ্মা। যার জন্যে, বাচ্চা দুটোকেও ওর কাছে যেতে দেওয়া হয় না। ঘরে এলে, বাইরের ঘরে শুয়ে থাকে।

তারা আর শুনতে পারলো না, সেখান থেকে চলে গেলো। সামনে যে বুড়ি তখনো বসে আছে, খেয়াল অবধি করলো না। কেন—অনন্তর কেন এমন হোলো, এই প্রশ্নে বিচলিত হয়ে উঠলো সে।

অনন্তর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো তারা। আপপাকে জিজ্ঞেস করলে যদি সটান 'না' ব'লে দেয়—তাহ'লে? তারা অস্থির হয়ে ভাবতে লাগলো কীভাবে অনন্তর দেখা করা যায়।

ঠিক এই সময় বিয়ে-বাড়িতে-আসা ওক ঝাঁক বউ গাঁয়ের মন্দির আর বাজার দেখে আসার জন্যে বেরোচ্ছিলো। নতুন গাঁ—তার ওপর নাম করা গাঁ—কাজেই অন্য গাঁয়ের বউদের বেড়িয়ে আসার কৌতূহলটা স্বাভাবিক। তারা এদের সঙ্গে ভিড়ে গেলো। ওরাও তারাকে পেয়ে খুশি হোলো, একজন তবু ঘুরিয়ে দেখাবার লোক পাওয়া গেছে।

ঠিক অনন্তদের বাড়ির সামনে এসে তারা দাঁড়ালো। বাইরের ঘরে অনন্ত বসেছিলো। তারা জানালো, একজন কাউকে এদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও মন্দির ঘুরিয়ে আনার জন্যে। বউদের একজন তারাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি যাবে না?'

'না। আমার দেখা। আমি বরং মামীর সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।'

অনন্ত গলি থেকে একটি ছেলেকে ডেকে আনলো ওদের পথ প্রদর্শকের কাজ করার জন্যে। ছেলেটিকে ব'লে দিলো, 'দেখানো হ'য়ে গেলে এখানে নিয়ে আসিস।'

অনন্ত কামরার মধ্যে ঢুকলো বউগুলো চলে যেতেই। তারা বসেই ছিলো। অনন্ত ম্লান কিন্তু সান্ত মুখখানার দিকে চোখ পড়তেই সে হেসে উঠলো ঝিরঝিরিয়ে। অনন্ত-ও হাসলো। হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলো, 'যাবে? যাবে নাকী আমার সঙ্গে?'

তারা সঙ্গে সঙ্গে আরক্ত মুখে মাথা হেঁট করলো। অনন্ত আরও কিছু কথা বললো—কিন্তু তারা আড়ষ্ট হয়ে রইলো, নিজে থেকে কোনো কথা বলতে পারলো না।

অনন্ত ব্যাপারটা লক্ষ করে বললো, 'কি—বদনামের ভয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছো না নাকী?'

তারপর:

'ভয় পাচ্ছো বুঝি? ···না, না—আমাকে আর ভয় করার কিছু

নেই—বাবা মারা গেলো, তার আগে তুমি আমার সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিলে—কিন্তু আমি যেতে পারিনি—কিন্তু আজ আমি সব ছেড়ে দিয়েছি···সব···'

পুরোনো দিনের সব কথা, সব স্বপ্ন—অনন্ত নতুন ক'রে ব'লে গেলো। তারপর হঠাৎ বললো, 'তুমি এখনো আমাকে ভালোবাসো—ভাবতে বড়ো আশ্চর্য লাগছে।'

দুজনেই চুপ করে রইলো। অনেকক্ষণ।

'অনন্ত।'

অনন্ত তারার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালো, 'কী?'

'কেন এমন হোলো অনন্ত?'

'কেন হোলো?

'বলতে হবে?' —তারার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো। অনন্তর মুখ লজ্জায় আরো মলিন হোলো, ভাবলো বোধ হয় অধিকার-বর্হিভূত কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে তারার দিকে ভীরু চোখে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তো ভালোই আছো—তারা?'

'হুঁ। কিন্তু কার কাছে আছি?'

'যার কাছেই থাকো– শরীরের এমন অবস্থা হোলো কেন?'

তারা কোনো কথা লুকোলো না। সরলভাবে জবাব দিলো:

'ওঁর শরীর রোগে বিষাক্ত। আমার শরীরেও ওই রোগে ঢুকেছে। তবুও, আমাকে ওঁর সঙ্গে থাকতে হবে—তোমার ছেলেরা কোথায় অনন্ত? বউ কোথায়? আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না?'

'বউ? হুঁ।'

'বউ-এর নামে এতো বিরক্ত কেন, অনন্ত?'

'তুমিই বলো।'

তারা ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলো। বাহিরে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। মন্দির থেকে বউয়ের দল ঘিরে আসতে লাগলো। বিব্রত

অনন্ত তারার চুলে বিলি কাটতে-কাটতে বললো, 'তোমার গাঁয়ের বউরা ফিরে আসবে এখনি—ওঠো। কেঁদো না। ওরা এসে পড়লো ব'লে।'

'আসতে দাও।'

'তুমি ওদের সঙ্গে যাবে না?'

'না। আমি এখানে থাকবো।'

'পাগল মেয়ে।'

অনন্তর চোখ দিয়ে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা তারার গালের ওপর গড়িয়ে পড়লো।

তারা উঠে দাঁড়ালো। ওর চোখ মুছে বললো, 'খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'জানি।'

'তাহলে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো কেন?'

অনন্ত-ও অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

'আমাকে ভুলে যাবে না তো?'

'আমি ভুলবো না—কিন্তু তুমি ভুলে যাবে।'

মেয়েরা ফিরে এলো। তারা চলে গেলো।

21

বিঘে দুই চাষের জমি ছাড়া অনন্তর সব জমিজমা, ক্ষেত বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো। ঘরে তরিতরকারি কিছুই ছিলো না। চৈত্র মাসের তখনো অনেক দেরি। দিনে দুবার ঘরের মধ্যে গিয়ে অনন্ত খেয়ে আসতো। তারপর, বাইরে এসে বসে থাকতো। জীবনে বীতশ্রদ্ধ—যেটুকু চাষের জমি ছিলো হাতে সেটুকুও সে বেচে দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু ইন্দিরার জন্যে পেরে ওঠেনি। তেরজাল থেকে মাঝে-মাঝে শালা আসতো, সঙ্গে বোনের জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসতো। এইভাবেই পুত্রপরিবারসহ অনন্তর দিনগুলো কেটে যাচ্ছিলো। বোনের

কষ্ট একেবারে সহ্য করতে পারতো না ভাই। এইজন্যেই বোধহয় সে মাঝে-মাঝে আসতো। একদিন ইন্দিরা জানালো ভায়ের সঙ্গে সে দিন চারেকের জন্যে বাপের বাড়ি যাবে—অনন্ত যেন মা'র কাছে খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নেয়। অনন্ত জবাব দিলো, হুঁ।'

ইন্দিরা যাবার পর অনন্ত ভাইয়ের কাছেই খেতে আসতো। ছোটো ভাইয়ের বউ দু চার কথা ঠেস মেরে ব'লে একটি রুটি দিতো। ফলে, ওখানে খেতে যাবার কথা ভাবলেই অনন্ত আতংকিত হয়ে উঠতো মনে-মনে। কিন্তু, নিরুপায় হয়ে যেতে হোতো। কোনোক্রমে রুটিটা দলা পাকিয়ে গলার মধ্যে ঢুকিয়ে—সে বেরিয়ে আসতো। সুন্দরা ছেলের সঙ্গে কোনো রকম কথাই বলতো না। হঠাৎ, একদিন দুপুর-বেলায় পোস্টম্যান একটা চিঠি দিয়ে গেলো ওকে। বেশ পরিচিত হাতের লেখা, কাঁপা-কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলে অনন্ত পড়লো :

কেমন আছো? ডাক্তার দেখিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসবে বলেছিলে—কিন্তু এখনো এলে না। তোমার শরীরের অবস্থার কথা ভেবে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। ডাক্তার দেখিয়েছিলে তো? ডাক্তার কী বললো? মিরজি হাসপাতালে যদি ভর্তি হও—তাহলে তোমাকে দেখাশোনা করার জন্যে আমি তৈরি আছি। যেভাবে হোক, শরীরটাকে সুস্থ করো আবার। দরকার পড়লে স্ত্রীকে আনাও। আমি অন্য কাজ সামলে নেবো। খরচের জন্যে ভেবো না। জানি, আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তুমি সংকোচ বোধ করো, তবুও বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে তুমি আমার টাকা নিতে অস্বীকৃত হবে—এটা আমি ভাবতে পারি না। তোমার দরকারে যদি আমি টাকা পয়সা না দিতে পারি—তাহলে সে টাকা পয়সার আমার দরকার কী? তুমি সেরে ওঠো—এইটাই আমি চাই।

প্রত্যেকদিন তোমার জন্যে অপেক্ষা করি। গাড়ির আওয়াজ পেলেই দৌড়ে যাই। মনে হচ্ছে, এইভাবে যেন আমার এক যুগ কেটে গেছে। চিঠিটা লিখতে-লিখতে মনে হচ্ছে হয়তো বিকেলের দিকে

তুমি এসে পড়বে।

আজ সকালে একটা ঘটনা ঘটেছে। হঠাৎ মনে হোলো তুমি বোধহয় এসে দোরগোড়ায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখি—দুধওয়ালা। মনে মনে বড়ো লজ্জা পেলাম। তোমাকে ছেড়ে আমি আর থাকতে পারছি না।···

ভঙ্গারি।

এই চিঠি পাওয়ার পর, তিন চার দিন, অনন্ত আর ভাইয়ের বাড়িতে খেতে গেলো না। প্রথমে ব্যাপারটা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় নি, তবুও মায়ের মন! সুন্দরা ছোটো বউকে জিজ্ঞেস করলো, 'অন্ত খেতে আসছে না কেন?'

ছোটো বউ অবজ্ঞাভরে জবাব দিলো, 'শ্বশুরবাড়ি গেছে হয়তো। চারদিন এখানে, চারদিন ওখানে—জীবনটাতো প্রায় কাটিয়েই আনলো!'

সুন্দরার ভালো লাগলো না ছোটো বউয়ের কথার ঢং। বললো, 'সুসময়ে ওখানে যায়নি—এখন যাবে? তার ওপর শরীর খারাপ—'

ছোটো বউ শাশুড়ির সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করলো না। মনে-মনে বললো, 'যাবে আর কোথায়—ভঙ্গারির কাছে গেছে নিশ্চয়ই।'

দুপুরবেলা এক প্রতিবেশিনীর কাছে অনন্তর খবর শুনে সুন্দরা চমকে উঠলো। অনন্ত নাকি ওর যেটুকু জমি ছিলো তা-ও বেচে দিয়েছে সাহুকরের কাছে—তিন হাজার টাকায়! বাচ্চাটার হাতে তো এবার ভিক্ষের টিন···

সুন্দরা মনে-মনে অভিসম্পাত দিলো ইন্দিরাকে। অলুক্ষণে ওই বউটার জন্যে ছেলের এমন হাল হয়েছে। মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যেতে ছোটো বউ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, 'ভঙ্গারির পেছনে পড়ে' তোমার ছেলের এই হাল হয়েছে—দিদির দোষ কী?'

সুন্দরা চুপ ক'রে গেলো।

অনন্ত ওর অবশিষ্ট জমি বিক্রি ক'রে যে টাকা পেলো তাই থেকে

কিছু টাকা ভঙ্গারিকে পাঠিয়ে চিঠি লিখলো :

'ডাক্তার, বলতে গেলে, আমাকে জবাব দিয়ে দিয়েছে। তোমার সঙ্গে থেকে, তোমাকে কষ্ট দিয়ে আর নিজের অপরাধ বাড়াতে চাই না…'

চিঠিটা লিখতে লিখতে অনন্তর চোখে জল এসে গেলো। চোখের জল চিঠির হরফের ওপর পড়ে' বেশ কিছু অংশ ভিজিয়ে একাকার ক'রে দিলো। এই চিঠির পর সে কোথাও আর গেলো না, এমন কি ছোটো ভাইয়ের বাড়িতে খেতে অবধি গেলো না। সুন্দরাও অবিশ্যি এজন্যে ডাকাডাকি করলো না। একদিন সন্ধ্যের দিকে, বাড়িতে এসে নাভিরাজ বললো, দাদা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম। এখানকার ডাক্তার বলেছে আরো ভালো কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে—সেইজন্যেই বোধহয় ক্ষেতটা বেচে দিলো— তা আমি দাদাকে বললুম এখানে খাবার জন্যে—দাদা এলো না।'

'ওই কেলে মুখ নিয়ে এখানে আসবে কোন লজ্জায় ?' সুন্দরা রূঢ়ভাবে জবাব দিলো। নাভিরাজের বউ বললো, 'যেটুকু ক্ষেত ছিলো বেচে দিয়েছে—এখন কার বাড়িতে গিয়ে মরবে কে জানে !'

নাভিরাজ দপ করে জ্বলে উঠলো বউয়ের কথায়, 'মুখ সামলে কথা বলো ! আমি কী মরে গেছি ? আমরা মা'র পেটের ভাই—সময় খারাপ ব'লে দাদাকে দেখবো না—নাকি ?'

সুন্দরা অনন্তর ওপর রেগে থাকলেও নাভিরাজের কথা শুনে মনে মনে খুব খুশি হোলো।

'অত কথার কী আছে ? ভাইকে এনে এখানে রেখে দাও—কে মানা করেছে ?' ছোটো বউ রাগে গরগরিয়ে ভেতরে চলে গেলো। সুন্দরা কিন্তু চুপচাপ বসে থাকতে পারলো না। অনন্তর ক্ষেত বেচে দেওয়ার খবরটা জানিয়ে একটা চিঠি দিলো তেরডালে। পত্রপাঠ অনন্তর শ্যালক, ইন্দিরা আর ইন্দিরার দুই বাচ্চাকে নিয়ে চলে এলো গাঁয়ে। অনন্ত ভেবে পেলো না এদের খবর পাঠিয়েছে কে। যাইহোক, ইন্দিরা সঙ্গে সাত আটদিনের মতো চাল ডাল আটা নিয়ে এসেছিলো।

অনন্তর শালা ছোটো ছোটো প্রশ্ন করে সব জেনে নিলো খুঁটিয়ে। সুন্দরার কাছ থেকেও অনেক কিছু জেনে নিলো। সাহুকর এখনো পুরো টাকা অনন্তকে দেয়নি। এখনো নশো টাকা বাকি। সুন্দরারা ভেবে পেলো না টাকা হাতে পেয়ে অনন্ত কী করেছে—ওদের ধারণা ছিলো তিন হাজার টাকার মধ্যে কিছু টাকা নিয়ে বাচ্চাটার জন্যে জমি কেনা যাবে। যাই হোক, অবশেষে শালা, অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সাহুকরের কাছ থেকে বাকি নশো টাকা আদায় করে নিলো। ইন্দিরাকে খরচ চালাবার জন্যে কিছু টাকা দিয়ে বাকিটা সে রেখে দিলো নিজের কাছে। যাবার সময় সুন্দরাকে বলে গেলো : এদের দেখবেন—আপনার ভরসায় রেখে গেলাম।

এইভাবে একমাস কাটলো। অনন্ত বাইরে থেকে ঘরে এসে দু মুঠো খেয়ে আবার বেরিয়ে যেতো। ছেলের কাছে যাবার অনুমতি ছিলো না। একদিন খেতে বসেছে, ইন্দিরা বললো, 'এইভাবে বসে' বসে' খেলে আর কতদিন চলবে? ঘরে তরিতরকারি কিছু নেই, বাচ্চাটার গায়ে জামা নেই।' অনন্তর কাছে টাকা আছে কি—নেই— ইন্দিরা সকৌশলে জেনে নেবার চেষ্টা করলো।

ইন্দিরার কথায় অনন্ত রেগে, 'সব টাকা তো তোমার ভাইয়ের হাতে—ভেবেছিলাম ওষুধপত্তর কিনে একটু সেরে উঠবো—তাতো আর তোমরা হতে দিলে না!'

ইন্দিরাও ছেড়ে কথা বললো না, 'বেশ! আগের টাকা কোথায় গেলো? ঘরে খেতে আসো—একবারও ভাবো না খাওয়াটা কোথ থেকে আসছে?'

অনন্ত সঙ্গে সঙ্গে থালাটা ছুড়ে ফেলে দিলো।

'কার পয়সায় খাওয়াচ্ছো আমাকে?'

কিছু গালিগালাজ করে অনন্ত বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। ইন্দিরাও আর খেলো না সেদিন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অনন্ত বাড়ি ফিরলো না। পরের দিন ইন্দিরা উঠে রান্না করতে বসলো। ছেলে ডাকতে অনন্ত খেতে এলো, নইলে হয়তো

আসতো না। এইভাবে আরো দিন চারেক গেলো। ঘরের সব বাড়ন্ত। ইন্দিরার হাতে একটা কপর্দকও নেই। তার ওপর, বেশ কয়েকদিন ধরে গায়ে জ্বর। মনে হোলো, অনন্তর রোগ বোধহয় ওকেও ধরেছে। নিরুপায় ইন্দিরা শুয়ে পড়লো চুপচাপ। সন্ধ্যেবেলায়, ইন্দিরাকে ওইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে অনন্ত জিজ্ঞেস করলো, 'শুয়ে আছো যে?'

'শরীর ভালো নেই', ইন্দিরা জবাব দিলো, 'বুকে ব্যথা।' ব'লেই সে কাসতে শুরু করলো।

বাচ্চা দুটো পাশেই ছিলো, ওরা বললো, 'সকাল থেকে মা কিছু খায় নি—বাবা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো অনন্ত। ভাবলো, ইন্দিরাকে একটু চা ক'রে খাওয়াবে। এই ভেবে সে রান্নাঘরে গেলো। সব কৌটো ফাঁকা। সকালে বাচ্চা দুটো এক পো দুধের সঙ্গে রুটি ভিজিয়ে খেয়েছিলো। সারা রান্নাঘর তন্ন তন্ন করেও সে কিছু পেলো না। পাগলের মতো সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো রান্নাঘরের মধ্যে। পশ্চিমের জানালা থেকে দমকা একটা হাওয়া এলো—সেইসঙ্গে অন্ধকারও যেন হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে হেঁটে এলো।

ক্ষেত থেকে ফেরার পথে নাভিরাজ উঠোনের কাছে এসে দাঁড়ালো। বাচ্চা দুটো তখনো খেলছিলো। নাভি জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে—বাবার খাওয়া হয়েছে?'

ওরা জবাব দিলো, 'আজ রান্না হয় নি। মা শুয়ে আছে।'

'মা শুয়ে আছে? কেন?' নাভিরাজ উঠোন থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। নাভিরাজের গলা শুনে অনন্ত বেরিয়ে এলো। তারপর, দু জনে, ইন্দিরা যে ঘরটায় শুয়েছিলো—সেখানে গেলো। মুখে চাদর ঢাকা—দেওর এসেছে টের পেয়ে চাদরটা মুখ থেকে সরিয়ে নিলো সে। নাভি গায়ে হাত দিয়ে দেখলো, বেশ জ্বর। বললো, 'কাল সিরজি হাসপাতালে গিয়ে একবার দেখিয়ে নেবে—দাদা, তুইতো হাসপাতালে যাবি বলিছিলি—গিয়েছিলি?'

'ন্না। হাতে টাকাকড়ি নেই—'

'বেচে থাকলে অমন বহু টাকা আসবে। টাকা আমি দেবো। চল কাল—'

নাভি অবিশ্যি আগেই টের পেয়েছিলো ওদের সেদিন খাওয়া হয়নি। তাই ওদের বাড়িতে আসতে বললো—কিন্তু অনন্ত কোনো জবাব দিলো না। ফলে, নাভি সঙ্গে করে বাচ্চা দুটোকে খাওয়াবার জন্যে নিয়ে গেলো—আর খাইয়ে-দাইয়ে তাদের হাত দিয়ে এক থালা ভাত—সঙ্গে কিছু রুটি আর তরকারি পাঠিয়ে দিলো। নাভি ওর বউকেও দেখে আসার জন্যে বললো, কিন্তু সে রাজি হোলো না। এমন কি সুন্দরাও ব্যাপারটা ভালো চোখে নিলো না।

পরের দিন নাভি দাদা-বউদিকে নিয়ে হাসপাতালে গেলো। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু নাভিকে একান্তে জানালেন, ইন্দিরাকেও রোগে ধ'রেছে ব'লে মনে হচ্ছে। ছবি নেওয়া দরকার। অনন্তকে এখন বেশ কিছুদিন বিছানায় শুইয়ে রাখো—তাতে যদি ভালো হয়। এমনি কিছু করার নেই।' সন্ধ্যেবেলায় নাভি ফিরে এলো। ইতিমধ্যেই সে তেরদালে একটা চিঠি লিখেছে। নাভির চোখে জল দেখে সুন্দরা বিস্মিত হোলো। 'দাদা আর বাঁচবে না—মা।' সুন্দরা নিশ্চুপ, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনে নিলো—তারপর আর পারলো না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

কথাটা গোপন থাকলো না। অনন্ত আর ইন্দিরাও শুনলো। গাঁয়ের লোক, পাছে সংক্রমণ হয়, এই ভয়ে ওদের এড়িয়ে যেতে লাগলো। এইসব দেখে ইন্দিরা ভাবলো : আর বেঁচে থেকে কী লাভ?

এই ভেবে সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করলো। অনন্তর এক অবস্থা। দু জনে বসে' বসে' শুধু কাঁদে। শুধু নাভিরাজ নিয়মিত এসে ওদের অভয় দিতো, খাওয়াবার চেষ্টা করতো। কিন্তু ইন্দিরাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেলো না। সুন্দরার অনুরোধেও ইন্দিরা খেলো না। গাঁয়ের লোকেরা এই সব দেখে-শুনে বলাবলি করলো : আর ওদের বাঁচানো যাবে না। তবুও তারা দেখতে এলো ওদের। ইন্দিরা ওদের

দেখে আরো কেঁদে উঠলো, 'আমার বাচ্চাদের কী হবে' ব'লে। অনন্তও শয্যাশায়ী, ভাই খাওয়াতে এলে কোনোক্রমে শুধু উঠে বসে।

দিন দুয়েক পরে তেরদাল থেকে অনন্তর শালা আর শাশুড়ি এলো। সঙ্গে এক কবিরাজ। কবিরাজ আশ্বাস দিলেন এক মাস ওঁর ওষুধ খেলেই এরা সুস্থ হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ডাক্তার মানেই পয়সা খাবার যম ইত্যাদি। কবিরাজের কথা অনন্ত বিশ্বাস না করলেও ইন্দিরা করালো, ভাবলো, 'আরো বছর চারেক যদি বেঁচে থাকতে পারি—তাহলে বাচ্চাদুটোকে অন্তত একটু বড়ো ক'রে যেতে পারবো।' ঠিক হোলো, অনন্ত আর ইন্দিরা অতঃপর তেরদালে গিয়ে কিছুদিন থাকবে চিকিৎসার জন্যে। বড়ো ছেলে পাঠশালায় যাতায়াত শুরু করেছে—কাজেই সে থাকবে সুন্দরার কাছে। ছোটো ছেলে ওদের সঙ্গে। নাভি অবিশ্যি আপত্তি করেছিলো, 'তেরদালে থাকার কোনো দরকার নেই।' কিন্তু নাভিরাজের কথা ওরা কেউ শুনলো না।

পরের দিন নাভিরাজের গোরুর গাড়িটায় ওরা উঠে বসলো। ছেলে বললো, 'আমিও কাকার সঙ্গে ষ্টেসন অবধি যাবো।'

ষ্টেশনে ইন্দিরা বড়ো ছেলেকে জড়িয়ে ধরে' খুব কান্নাকাটি করলো।

রুককা—অনন্তর শাশুড়ি, তারও চোখ ছলছলে হয়ে উঠলো। অনন্ত শূন্য চোখে একবার ছেলের, আর একবার শাশুড়ির মুখের দিকে তাকালো।

নাভিরাজ ইন্দিরাকে সান্ত্বনা দিলো, 'কেঁদো না বউদি—আমি তোমার ছেলেকে দেখবো তুমি না আসা অবধি। ওর কোনো কষ্ট হবে না।'

তেরদালে দু একদিন কাটলো। অনন্ত ভঙ্গারির কাছ থেকে দুখানা চিঠি পেলো। দুটো চিঠিরই সারমর্ম এক: যার জন্যে ঘর ছাড়লাম, সমাজ ছাড়লাম—সেই যদি দূরে সরে যায়—তার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কিছুতে নেই।

মাঝে মাঝে তারার কথাও মনে পড়তো। একবার তারা, একবার

ভঙ্গারি—অনন্তর মনের আয়নায় এই দু জনের মুখ ক্রমাগত ভেসে উঠলো। মাঝে-মাঝে, ওদের দুজনের মুখ-ই, একসঙ্গে। মনে হোতো, অনন্ত যেন দুজনের সঙ্গেই আছে। মনের মধ্যে অতৃপ্তি আর বিষাদ যত ঘন হোলো, অনন্ত ততো দুর্বল হয়ে গেলো।

ইন্দিরার অবস্থা একটু ভালোর দিকে। ইন্দিরার পাঁচ ছ ভাই, থাকতো আলাদা-আলাদা। প্রত্যেকদিন এসে ওরা বোনকে দেখে যেতো! রুককা স্বয়ং মেয়ের সেবা-যত্ন করতো। একজনের ওপর যাতে বেশি চাপ না পড়ে—ইন্দিরার ভাইয়েরা তাই পালা ক'রে ওদের নিজেদের বাড়িতে রেখে দিতে লাগলো। শাশুড়ি, স্ত্রী-স্বভাব অনুসারে অনন্তকে একটু অনাদরের চোখে দেখতো। ফলে, একটু হাঁটা-চলার মতো জোর ফিরতেই অনন্ত ইন্দিরাকে বললো, 'বাড়ি যাই চলো—যা পারি নিজের ঘরেই ফুটিয়ে খাবো।'

'কেন? এখানে কী কেউ আমাদের দেখছে না? আমার বউদিদের দেখো—আর তোমার ভাইয়ের কথা একবার ভাবো—'

'তোমার কাছে তোমার বউদিরা তো ভালো হবেই।'

অনন্ত যতই বোঝাবার চেষ্টা করলো নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাবার জন্যে, ইন্দিরা ততই পালটা যুক্তি দিতে লাগলো। যেতে রাজি হোলো না। বললো, 'ওখানে গেলে এক গেলাস জলও পাওয়া যাবে না দরকার মতো।' অথবা, 'তোমার পায়ে পড়ি—ওখানে যেও না। মরবার সময় আমরা যেন আলাদা না থাকি। ভগবান জানে কি পাপ করেছিলুম, তাই এই জন্মে আমাদের স্বামী স্ত্রী হতে হোলো। দোহাই তোমার—মরার সময় যেন…'

অনন্ত চুপ করে যেতো অতঃপর।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায়, ইন্দিরার কাছে এসে ওর ভাই আর রুককা এসে বসলো। রুকক্কা একথা-সেকথার পর ছেলেকে জানালো, 'দিনরাত্তির এদের খিটি-মিটি লেগেই আছে। পান থেকে চুন খসার যো নেই!…হুঁ! বাড়িতে তো ছোটো ভায়ের বউ চারদিন রুটি খাইয়ে দশবার মুখ ঝামটা দিয়েছে—কুকুরের মতো তু তু করেছে—সব ভুলে

গেলো বাবু এর মধ্যে ? আমার কথা ওনার না কী খারাপ লাগে—'

ইন্দিরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো, 'এরকম কথা আর বোলো না মা—যদি শোনে তো ও ভীষণ রেগে যাবে। যে লোক নিজের মা বাপকে অবধি পরোয়া করে না—সে তোমাকে পরোয়া করবে কেন ?'

'পরোয়া না করে তো ভারি বয়েই গেলো। রেখে দে ওসব কথা। অতো যদি মানী হোতো—'

'চুপ করো ! আর শুনতে চাই না—কালই আমরা চলে যাবো' —ইন্দিরা তীব্র প্রতিবাদ ক'রে ভাইয়ের উদ্দেশে জানালো, 'দাদা, আমাদের জন্যে যে টাকা খরচ হয়েছে, সেটা বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা আমাকে দিয়ে দিও।'

ইন্দিরার দাদা বিব্রত হয়ে মা'কে সরিয়ে দিলো ওখান থেকে। বোনকে বোঝালো, 'মা বুড়ি হয়েছে—মা'র কথায় কিছু মনে করতে নেই। আমরা কী তোদের কিছু বলেছি ?'

ইন্দিরা কাঁদতে লাগলো।

অন্যদিকে অনন্ত-ও যাবার জন্যে ক্রমাগত জেদ করছে দেখে, ইন্দিরার বড়দা রেগে গিয়ে অনন্তর হাতে টাকা দিয়ে বললো, 'এই নাও তোমার আটশো আশি টাকা—কুড়ি টাকা তোমার জন্যে খরচা হয়েছে। আমাদের বোনের কোনো খরচ নিচ্ছি না—আমাদের বোন—আমরাই খরচ করেছি, করবো। ভালো হ'লে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো, আর মারা গেলে আমরাই ওকে পুড়িয়ে দেবো—তুমি যাও, যেখানে খুশি যাও—'

অনন্ত ঠিক পাঁচটা টাকা নিয়ে বাকি টাকা ইন্দিরার হাতে দিয়ে, বেরোবার জন্যে তৈরি হোলো। ইন্দিরা অনুরোধ জানালো, 'আজকের দিনটা থেকে যাও, দিন পড়ে গেছে—কখন গাঁয়ে পৌঁছবে ঠিক নেই—অন্তত কিছু খেয়ে যাও—'

'দরকার নেই। খাওয়া দাওয়া করলে পেট ভার হয়ে যাবে। খালি পেটই ভালো।'

'কিন্তু—'

'হীরাগিরিতে তারার ওখানে যাবো একটু—'

'ওখানে কেন? তারার বর লোক ভালো নয়। তোমার বাবার শ্রাদ্ধের সময় আসে নি অবধি—এমন কি তারাকেও আসতে দেয় নি।

অনন্ত কোনো জবাব দিলো না। পা ঘসে ঘসে দরোজার দিকে এগোলো।

'চা খেয়ে যাও অনন্ত—' শালার বউ বললো।

'না, না—দরকার নেই।'

অনন্ত পা ঘসটে ঘসটে অনেকটা এগিয়ে গেছে ততক্ষণে।

'আরো কিছু টাকা নিয়ে যাও।' ইন্দিরা চেঁচিয়ে বললো।

কথাটা অনন্ত শুনতে পেলো কি না—কে জানে। সে একবারও ফিরে না তাকিয়ে এগিয়ে চললো।

ইন্দিরা অনেকক্ষণ ধরে' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে, নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো মুখ থুবড়ে।

22

এখনো অবধি তারা মা হ'তে পারে নি। এজন্যে অবিশ্যি সে আর এতোটুকু চিন্তিত নয়। শারীরিকভাবে দিনের পর দিন রুগ্ন হয়ে গেলেও, বাড়ির সব কাজই সে একনাগাড়ে ক'রে যেতো। স্বামীর খাওয়া পরা, তদারকি—তারা সবই করে যেতো এতোটুকু বিরক্ত না হয়ে। ইতিমধ্যে, গাঁয়ের কিছু লোকের সঙ্গে, মা-বাবা-শাশুড়িসহ তীর্থও করে এসেছে সে। তীর্থ থেকে ফিরে একটি ছোটো মন্দির বানিয়েছে গাঁয়ে। এখন তারার ধ্যান-জ্ঞান সবই ওই মন্দির। প্রতিদিন সকালে পুজো, সন্ধ্যেতে ছেলেবেলায় শেখা আরতি—এবং সব শেষে প্রার্থনা : 'ভগবান! আমাকে ছুটি দাও।' এইভাবেই, নিজস্ব একটা পৃথিবী তৈরি ক'রে তারা দিন কাটিয়ে যাচ্ছিলো। বাগানে-

কাজ-করা লোক, অতিথি আপ্যায়ন—এগুলো ছিলো তারার দৈনন্দিন কাজ। মাঝে-মাঝে পেটে ব্যথা উঠতো। বড়ো কষ্ট হোতো এই সময়টা, সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকতো। বাড়ি থেকে ডাক্তার-বদ্যি আনার চেষ্টাকে আমল দিতো না।

একদিন ভয়ানক পেট ব্যথায় সে শয্যাশায়ী হোলো। পাড়ার একটি মেয়েকে ডেকে রান্নার জন্যে অনুরোধ করলো—'আপপার আসার সময় হয়েছে।' আত্মীয় স্বজন, পাড়ার লোক—সবাই তারাকে ভালো-বাসতো। ফলে, তারার কাজ ক'রে দেবার জন্যে লোকের অভাব হোতো না। যাক, সেদিন পেট ব্যথায় তারা ছটফট করতে লাগলো কাটা ছাগলের মতো। অম্বা কাছেই ছিলো। বললো, 'দশ পনেরো দিন অন্তর-অন্তর তোর এমন পেট ব্যথা হচ্ছে—অথচ ডাক্তার দেখাবি না। ছাখ তো কী কষ্ট! একজন ডাক্তার দেখালে হয়তো ভালো হয়ে যেতিস। কবে বাচ্চা-কাচ্চা হবে জানতে পারতিস।'

তারা উঃ আঃ করতে লাগলো যন্ত্রণায়, বললো, 'বাচ্চা হলেই সব মিটে যেতো? কি যে বলো—বাচ্চা হওয়া না হওয়া কী আমার মর্জি?'

'না, না—তা বলছি না! সবই ভগবানের হাত—তবুও একজন ডাক্তার দেখালে তো জানা যেতো ব্যাপারটা। তা নয়—খালি পূজো! আরে—এখন কী তোর বুড়িদের মতো মন্দিরে যাওয়ার বয়েস হয়েছে? সবে তো কয়েক বছর হোলো—'

'এখন পুজো করবো না তো কখন করবো? যখন হাতে-পায়ে জোর থাকবে না—তখন?'

'তোর সঙ্গে কথায় পারা যায় না—বাপু! তুই তো কালকের মেয়ে, তোকে বোঝাই কী ক'রে—'

এমন সময় আপপা এলো। কাঁধ থেকে কোদালটা ঘরের এক কোণে রাখতে-রাখতে তারার খবর জিজ্ঞেস করলো। আর যায় কোথায়, মা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে উঠলো, 'তোর আর কি—শুধু ক্ষেত আর বাড়ি। বউটাকে একেবারে দেখিস না। বলি কী—ওকে

কয়েক দিনের জন্যে মা'র কাছে পাঠিয়ে দে—একজন ডাক্তার দেখিয়ে আসুক।'

'আহা—' আপপা জবাব দিলো, 'আমি কী যেতে মানা করেছি নাকী? দশ-পনেরোদিন থেকে ডাক্তার দেখিয়ে আসুক—টাকাকড়ি যা লাগে দিচ্ছি। ও গেলে তো আর আমার এমন কিছু কাজ আটকাবে না—'

তারা মনে-মনে বললো: আমার জন্যে দুনিয়ার কারুর কাজ আটকায় না। ভগবান যে কেন আমাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন!

আপপা ভেতরে এসে তারাকে বললো, 'কাল তোমার বাবাকে খবর পাঠাচ্ছি—কয়েক দিনের জন্যে ঘুরে এসো।'

তারা নিরুত্তর।

'কী হোলো? চুপ করে আছো যে? যাবে না?'

'ওখানে গিয়ে কী হবে?'

অম্মা জবাব দিলো, 'হয়েছে! ওইভাবে জিজ্ঞেস করলে কোনোদিন জবাব পাবি? তারা কোনোদিন নিজে থেকে নিজের কোনো কথা বলেছে?'

'না বললে আমিই বা জানবো কেমন ক'রে?' আপপা জবাব দিলো।

তারা বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, খবর পাঠাও বাবাকে। আমি যাবো।'

ওইদিন সন্ধ্যেবেলায় তারার মাসিক হোলো। পেট ব্যথা থেমে গেলো। কিছুকাল ধরেই এই রকম হচ্ছে। মাসিক হওয়ার আগে প্রচণ্ড পেট ব্যথা। এরই মধ্যে চম্পা এসেছিলো শ্বশুরবাড়ি থেকে। অন্যান্য বারে—চম্পা যখনই আসে, তারার কাছ থেকে শাড়ি নিয়ে যায়। এবার সে একজোড়া কানের দুল চেয়ে বসলো। তারা চম্পার কান লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোর কানে তো দুল আছে—আবার দুল নিয়ে কী করবি?'

'এটা আমার নয়। মাঙ্গীর। কান খালি ছিলো ব'লে আমাকে

চার দিনের জন্যে পরতে দিয়েছে।'

'কান খালি রাখা—লোকের কাছে চাওয়ার থেকে—বরং ভালো। আমার একজোড়া সোনার দুল আছে—চাস তো নিয়ে যা।'

সেদিন আপপার কাছে তারা কথাটা তুললো, 'চম্পার জন্যে একটা শাড়ি আনিয়ে দাও।'

'হুঁ। কেন? কদ্দিন এমনি ক'রে দিয়ে যাবো? বিয়ে দিয়ে দিয়েছি—ওর উচিত শ্বশুর বাড়িতে থাকা। যখন-তখন এসে এটা চাই, ওটা চাই—কেন?'

'তাতে কী হয়েছে? ও যদি আমার পেটের মেয়ে হোতো—না বলতে? হাজার হোক চম্পা আমাদেরই মেয়ে—'

'মেয়ে তো কী হয়েছে? ওর জন্যে যতোটা করার করেছি। যতোটা দেওয়ার দিয়েছি।'

তারা আর কথা বাড়ালো না। কানের দুলের কথা বলবে ভেবেছিলো, বললো না। দিন চারেক পর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে চম্পা দেখা করতে এলো। তারা জলভরা চোখে ওকে আদর দিয়ে, বাগানের এক কোণে নিয়ে গিয়ে বললো, 'ওনাকে বলেছিলুম তোর শাড়ির কথা, কিন্তু রাজি হয় নি'

'যেতে দাও—এবার বরং দিদার কাছ থেকে শাড়ি চেয়ে দাও।'

তারা চম্পার মুখের দিকে তাকালো এক নিমেষ, 'এতো চেয়েচিন্তে নিলে তোর শ্বশুরবাড়ির লোক কী বলবে?'—এই ব'লে সে শাড়ির খুঁট থেকে একজোড়া মতির দুল আর দশটা টাকা চম্পার দিকে এগিয়ে দিলো, 'এই নে—মাসী চাওয়ার আগেই দুল ফিরিয়ে দিস। টাকাটা রাখ। পরের বারে এসে শাড়ি নিয়ে যাস'

চম্পা দুল আর টাকা নিতে ইতস্তত করছে দেখে তারা একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে—নিবি না?'

'বাবা বকবে না তো?'

'না। আমি যে পঞ্চমীর দিন বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম—তখন মা আমাকে দিয়েছিলো এই দুল—'

'কিন্তু তোমার যে তুল থাকবে না—'

'হ্যাস্‌ পাগলি ! আমার কাছে তো পুরোনো আরো তিন চারটে আছে—আমি ঠিক চালিয়ে নেবো। নে—শ্বশুরবাড়ীতে ভালোভাবে থাকিস।'

চম্পার-ও চোখে জল ভরে' এলো। বললো, 'যদ্দিন তুমি আছো—ততোদিন আমাকে···পরে, তুমি না থাকলে আমাকে কে ভালোবাসবে এখানে ?'

'আরে পাগলি—যদ্দিন আমি আছি, তুই নিশ্চয়ই আসবি। তারপর, পরের কথা পরে ! তাছাড়া, তোর মা আছে—ভাবনা কী ! যা—আর কাঁদতে হবে না।'

হঠাৎ চম্পা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি দিন-দিন এতো রোগা হয়ে যাচ্ছো কেন ? কোনো ডাক্তার-বদ্যি দেখাও না—'

'দেখিয়ে আর কী হবে ? বেঁচে থেকে লাভ কী বল ?'

চম্পা কী বলবে ভেবে পেলো না। তারাকে প্রণাম ক'রে শ্লথ পায়ে এগিয়ে গেলো গাঁয়ের রাস্তার দিকে।

কয়েকদিন পরেই তারা চন্দুরে এলো। মল্ল জনা দুয়েক বদ্যির কাছে মেয়েকে নিয়ে গেলো। হপ্তা তিন-চার পরে, ওষুধপত্তর খাবার পর তারার স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হয়েছে দেখা গেলো। ফলে, তারাকে আরো দু তিন সপ্তাহের জন্যে চন্দুরে থেকে যেতে হোলো। কীভাবে যেন সে খবর পেয়েছিলো অনন্ত তেরদালে এসেছে। খবরটা পাওয়ার পর থেকেই অনন্তর সঙ্গে তার দেখা করার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলো। মা বাবার ভয়ে—তারা কথাটা তুললো না। সুন্দরাদের সঙ্গে রত্না আর মল্লর খুব ঝগড়াঝাটি হয়েছিলো সেই গাড়ি না পাঠানোর ব্যাপার। তবুও, অনন্তর কথা তার বার বার মনে পড়লো। কিছুতেই নিজেকে আর সে সংযত রাখতে পারলো না। তিনজনে বসে' বসে' গল্প চলছে—এই রকম এক ফাঁকে তারা হঠাৎ মল্লর উদ্দেশে বললো, 'অনন্তকে অনেকদিন দেখি নি। শুনলুম ও তেরদালে এসেছে—একবার দেখা ক'রে আসবো ?'

ওর সঙ্গে আর দেখা ক'রে কী হবে তোর? একেবারে উচ্ছন্নে গেছে ও—নিজের সর্বনাশ নিজে হাতে ক'রে এখন পরের বাড়িতে প'ড়ে আছে! না—না - তুই যাসনি।'

তারা চুপ ক'রে থেকে জবাব দিলো, 'তবুও, আমাদের লোক। মামার ছেলে— অসুখের সময় যদি দেখতে না যাই, লোকে কী বলবে?'

'কেন ওকে দেখে অশান্তি বাড়াবি? আপপা যদি শোনে মহা গণ্ডগোল হবে। মনে নেই?'

'ও শুনবে কেমন ক'রে?'

'তোকে কী বোঝাই বল দেখি? একবার তো আপপা তোকে বাড়ি থেকে প্রায় বের ক'রে দিয়েছিলো ওদের ঘরে গেছিস শুনে। এখন যদি আবার শোনে—তাহলে নির্ঘাৎ তোকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবে। একটা বউকে তো শুনেছি কুড়ুল দিয়ে কাটতে গিয়েছিলো—তার ওপর তোর ছেলেপুলে হয়নি এখনো, এরকম একটা সুযোগ যদি পায়—তাহলে আমরা কেউ কিছু করতে পারবো না। শুনি—সবার সামনেই নাকি বলে আর একটা বিয়ে করবে। তোর-ও প্রথম বিয়ের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে—' মল্ল নানা প্রসঙ্গের সবিস্তার ব্যাখ্যা ক'রে তারাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

তারা জবাব দিলো, 'যদি আর একবার বিয়ে করেই—তাহলে কী আমার বলায় কিছু আটকাবে? কাজেই—আমার এতো ভেবে লাভ কী?'

রত্না অনেকক্ষণ ধরে বাপ আর মেয়ের কথা শুনে এবার রেগে গেলো, 'তোর তো খালি মুখে মুখে চোপরা লেগেই আছে! একটা কথা যদি বুঝতে পারিস! এর আগে আপপাকে না ব'লে অনন্তদের ওখানে যাওয়ার জন্যে এতো গণ্ডগোল হোলো, তবুও তোর আককেল হোলো না। চার দিনের জন্যে তোকে তো বাড়ির বাইরে বের ক'রে দিয়েছিলো—তারপর লোকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোকে ঘরে নিতে রাজি করালো। আমাদের এই জমিজমা বাড়ি ঘরদোর—আপপার নামে লিখে দেবো শুনে ও ক্ষান্ত হোলো। ও বোধ হয় ভেবেছিলো

অনন্তদের সব দিয়ে যাবো আমরা—যার জন্যে এখানে এসে বার-বার বলেছে ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা চলবে না। ...তোর সুখশান্তির জন্যে আমরা সব ছেড়ে দিয়েছি, আর এখন তুই গোল মাল বাঁধাচ্ছিস?'

তারা অগত্যা চুপ ক'রে গেলো। ভাবলো, মা বাবা যখন আমার জন্যে সব ছেড়েছে—আমিই বা কেন অনন্তকে ছাড়বো না মা বাবার জন্যে?

আরো কয়েক দিন চন্দুরে থাকার পর তারা হীরাগিরিতে ফিরে এলো। ওষুধপত্র খাওয়ার জন্যে মাসিকের আর কোনো গোলমাল বা পেটে ব্যথা হোলো না। এইভাবে আরো কিছু কাটার পর সহসা তারার ঋতুবন্ধ হোলো। ক্রমশই গর্ভবতী হওয়ার চিহ্ন দেখা যেতে লাগলো। বিবর্ণ হলুদ শরীর, টক খাওয়ার ইচ্ছে—অম্বা বেজায় খুশি হয়ে চন্দুরে খবর পাঠিয়ে দিলো। তারার খবর শুনে সবাই খুশি: ভগবান প্রার্থনা শুনেছেন। ছেলে হোক, মেয়ে হোক—একটা কিছু হলেই হোলো অম্বা তাতেই খুশি হবে। অম্বা সারাদিনই বউয়ের তদারক করতে ব্যস্ত হোলো।

—মাথা ঘুরছে?

—না। বমি-বমি করছে। মাথায় ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। মুখ তেতো। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

—এই প্রথম তো! রোজ দই খা—শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। বাচ্চাটারও ভালো হবে।

তারা অন্তঃসত্ত্বা খবর পেয়ে রত্নার আর আনন্দের সীমা রইলো না। মল্ল যেন হাতে স্বর্গ পেলো। রত্না নানা রকম খাবার তৈরি করে হীরাগিরিতে পাঠাতে লাগলো নিয়মিত।

তারার তিন মাসে পড়তে, রত্না ওর জন্যে কয়েকটা হলুদ রঙের ব্লাউজ তৈরি ক'রে পাঠালো। রত্না অম্বাকে বললো, 'এসব কাউকে বোলো না কিন্তু! লোকের সামনে বলতে নেই।'

অম্বা মনে-মনে খুশি ছিলো, একটু হালকা চালে জবাব দিলো,

'না—না, কাকে আর বলতে যাবো। আপপা তো বাচ্চা হবে না ভেবে আর একটা বে' করার কথা ভাবছিলো।'

কথাটা শুনে রত্নার একটু খারাপ লাগলো। অম্বা নিজের মনেই বলতে লাগলো, 'ছেলে হোক, মেয়ে হোক—ঘরেতে একট বাচ্চা এলেই সংসারের জৌলুষ খুলে যায়···

'আমারও এই রকম হয়েছিলো দিদি', রত্না মন খুলে কথা বললো, তারার মাসিক পনেরো ষোলো বছর ধরে হচ্ছে—বারো বছরের বেশি হলেই ব্যাপারটা চিন্তার—এই তো ষোলো বছর পর তারার—আমি তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলুম '

'আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। ছেলে তো ভেতরে-ভেতরে গুমরে মরে।'

দু তিনদিন মেয়ের কাছে বেশ সুন্দরভাবে কাটলো রত্নার। সব সময়েই মেয়ের খুঁটি-নাটি লক্ষ করে যেতে-যেতে সহসা আবিষ্কার করলো তিন মাসের তুলনায় মেয়েকে যেন একটি বেশি স্ফীতোদরা ব'লে মনে হচ্ছে। কথাটা সে অম্বাকে বললো, 'পেটটা যেন একটু বেশী মোটা দেখাচ্ছে।'

'আরে—ওর শরীরে আছেটা কী। খাওয়াদাওয়া তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। রোগা শরীর ব'লে পেটটা ওই রকম বেশি-বেশি দেখাচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই এতে।' তারপর একটু হেসে বললো, 'আবার যমজ-ও হতে পারে। যমজ হ'লে খুব ভালো হয়—একটা তোমার কাছে থাকবে—একটা আমার কাছে!'

দুপুরে রত্না অম্বা আর আপপাকে জানালো, 'পাঁচ মাস হলেই আমি এই গ্রামের আমি সবাইকে মিষ্টি আর রুটি খাইয়ে যাবো, সাত মাসে পড়লেই 'সজ্জিগে হোটিগি* খাওয়াবো আত্মীয়-স্বজনকে···'

ওরাও রত্নার প্রস্তাবে সম্মত হোলো। যাওয়ার আগে রত্না মেয়েকে বলে গেলো, 'বড়ো চাকিতে আটা ভাঙাবি না, কুঁয়া থেকে

---

* কর্ণাটকের জনপ্রিয় খাদ্য।

জল আনতে যাবি না—'

তারা মৃতুস্বরে বললো, 'তাহলে কাজ চলবে কেমন ক'রে?'

জবাব দিলো অম্বা, 'ঠিক কাজ চলবে। আপপা জল তুলবে—কাউকে আটা দিয়ে আটা পিষিয়ে নেবো—হুঁ!'

অম্বা অভয় দিলেও রত্নার মনে একটা খটকা থেকে গেলো। তার ওপর চন্দুরে যাওয়ার পথে গাড়ির চাকার মধ্যে লাগানো কাঠিটা হঠাৎ ভেঙে গেলো। কয়েকদিন অম্বার সঙ্গে এইসব বিষয়ে কথা বলার সময় একটা গিরগিটি ডেকে উঠেছিলো। এইসব কারণে রত্নার ত্বশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেলো। অমঙ্গল হবে না তো? আর থাকতে না পেরে সে সিন্দাকে জিজ্ঞেস করলো, 'সিন্দা—এমনি সোজা রাস্তায় হঠাৎ চাকার কাঠিটা কেন ভেঙে গেলো রে?' সিন্দার মুখটা সেই সময় একটু অন্য রকম দেখাচ্ছিলো, আপপার বকুনি খেতে হবে। সে জবাব দিলো, 'ওটা পুরোনো হয়ে গিয়েছিলো—তাই—'

রত্না মনে-মনে দেবী লগম্ব্যার কাছে মানত করলো: দোহাই মা—তোমাকে একটা নতুন শাড়ি দেবো। আমার তারার যেন খারাপ কিছু না হয়।

একদিন তুপুরে একটি লোক আপপাদের কুঁয়ার কাছে এসে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলো, 'চন্দুর গাঁয়ের মেয়ে—এখানে কোথায় থাকে?'

তারা কথাটা শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলো। অপরিচিত লোক। সে একটু দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন গাঁ থেকে আসছেন? কাকে চাই?

'আমি তেরদাল থেকে আসছি। তারকা এখানে কোথায় থাকে?'

'আমার নাম তারকা। কী দরকার বলুন।' ঈষৎ লজ্জিত হয়ে তারা জবাব দিলো।

'তেমন কিছু দরকার নেই—মালকিন শুধু ওঁকে একটু দেখে আসতে বলেছেন।'

'মালকিন?' তারা বিস্মিত হোলো, 'কে মালকিন? কাকে দেখে যেতে বলেছেন? আসুন—ভেতরে আসুন—খুলে বলুন।'

তারা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না, একটু এগিয়ে এসে একটা পৈঠের ওপর বসে পড়লো।

আগন্তুকও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। তারাকে দেখতে-দেখতে সে জবাব দিলো, 'আমাকে পাঠিয়েছেন ইন্দিরা বোন—অনন্তর স্ত্রী। বলেছেন অনন্তকে একটু যেতে—আর উনি যদি যেতে রাজি থাকেন—তাহ'লে মোটরে করে নিয়ে যেতে।'

মনে হোলো কে যেন তারাকে চাবুক দিয়ে মারলো। ঈষৎ রেগে সে জবাব দিলো, 'অনন্ত? অনন্ত আবার এখানে কবে এলো?' (মনে-মনে ভাবলো: অনন্ত এখানে আসবে—এতো পুণ্য কী করেছি!)—'কে বলেছে অনন্ত এসেছে এখানে?'

আগন্তুকও আশ্চর্য হোলো, 'এখানে, তাহ'লে আসে নি?'

'না।'

'তাহলে গেলো কোথায়?' আগন্তুক এবার হতভম্ব হয়ে বসে পড়ে নিজের মনে কি যেন চিন্তা করতে লাগলো। মুখে-চোখে উদ্বেগের চিহ্ন আরও স্পষ্ট হোলো। তার চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে জল পড়তে লাগলো। সে বলতে লাগলো, 'ইন্দিরা যখন এইটুকু—তখন থেকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি। আমার মেয়ের মতো ও। কিন্তু—এ কী হোলো—হা ভগবান—ইন্দিরাকে ছেড়ে অনন্ত ভাই কোথায় গেলো!'

একটু পরে লোকটি জল খেতে চাইলো। তারার ওঠার শক্তি ছিলো না, তবুও সে কোনোক্রমে শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে ভেতরে নিয়ে গেলো। এক লোটা জল আর গুড় নিয়ে এলো। লোকটি শুধু জল খেলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, 'অনন্ত কোথায় গেছে? তেরদালে নেই?'

'না—গত সোমবার সে তেরদাল থেকে চলে এসেছে।'

'সঙ্গে কেউ ছিলো?

'না—বোন। একটু ঝগড়াঝাটি হয়—তাই চলে আসে। কোথায় গেছে—কেউ জানে না।'

‘এনাপুরে যায় নি ?’

‘না। এনাপুর থেকে আজ নাভিরাজ এসেছিলো অনন্তকে খুঁজতে। ওকে খুঁজতে-খুঁজতে আমরা তো নাকাল হয়ে গেছি।’

‘যাবার সময় ব’লে যায় নি—কোথায় যাচ্ছে ?’

‘বললাম যে ঝগড়াঝাটি হয়েছিলো। রুককা সেকেলে বুড়ি—কি বলতে কি বলেছিলো! অনন্তর সহ্য হয় নি। আট দিন কোনো কথা বলেনি কারুর সঙ্গে। শুধু যেদিন আসে সেদিন ইন্দিরাকে বলেছিলো, তারার ওখানে যাবো। সেইজন্যেই ইন্দিরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।’

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা পৈঠে থেকে সশব্দে পড়ে গেলো নিচে। মুখ থেকে অনুক্ত একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। লোকটি ওকে তুলছে, এমন সময় বাড়ির আশপাশ থেকে অন্যান্য মেয়ে-বউ ছুটে এলো: কী হয়েছে? তারা পড়ে গেলো কেন?—সবাই মিলে ওকে ধরাধরি ক’রে বসিয়ে দিলো।

অম্বা বাগানে কী কাজে গিয়েছিলো, সে-ও দূর থেকে ব্যাপারটা দেখে ছুটে এলো, বললো: পেটটা একবার ত্যাখ তো…

23

দিন দুয়েকের মধ্যে তারার গর্ভপাত হোলো। সবাই খুব দুঃখিত হোলো। অম্বা বুড়ি গজরাতে লাগলো, ‘এই মেয়েটার একেবারে বাঁচার ইচ্ছে নেই। যাতো নষ্টের গোড়া ওই বুড়ো—কোথায় গেছে মামার ব্যাটা সেই খবর নিতে এসেছে! এ রকম জিনিস আমি সাত জন্ম শুনিনি—মামার ছেলে কোথায় গেছে—এই খবরে ‘মুছছো যাওয়া’ হুঁ। বিয়েরপর তো একবার উঁকি দিয়েও দেখতে আসেনি—’

সেই সময় তারার খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো সে-ও একবার অনন্তকে খুঁজতে বেরোয়। অনন্তর চেহারাটা বার-বার ভেসে উঠলো ওর মনের

চিত্রপটে। পাশাপাশি, আপপার ছবিটা-ও সে দেখলো। ছুনিয়ার বিচারে—ওর পতিদেবতা। একান্ত অনীহা সত্বেও প্রেমালাপ সহ্য করতে হয়। কমনা-বাসনা চরিতার্থ করতে হয়। বিনিময়ে, সে যা চায় তাই পায়। অভাব থাকে না কোনো কিছুর। তবুও, অনন্ত কথাটা ভোলা যায় না। বার-বার মনে পড়ে। সাংসারিক হিসেবে মামাতো ভাই। মামার ছেলে। অসম্ভব এক অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হোলো তারার প্রতিটি স্নায়ু।

তারার খবর পেয়ে রত্না আর মল্ল-ও এসেছিলো। সব ঘটনা শুনে রত্না স্তম্ভিত হয়ে গেলো—তারপর কেঁদে ঈষৎ শান্তি পেলো। মায়ের কান্না দেখে মেয়েও কাঁদলো। ছু জনেই ছুজনকে সান্ত্বনা দিলো। রত্না বললো, 'যা হবার হয়ে গেছে। একবার যখন পোয়াতি হতে পেরেছিস—তখন আবার হবি।'

তারা শূন্য দৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলো। শুধু ভাবলো, এই মুহূর্তেই মৃত্যুই ভালো। বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই—কিন্তু মৃত্যুর আগেও কী অনন্তর সঙ্গে একবার দেখা হবে না? বাবার রক্তাভ চোখ মনে পড়লো ওর: অনন্তর নাম মুখেও আনবি না। মা বলেছিলো: ওর নাম উচ্চারণ করলে আমি তোর সামনে মরবো। সব কথা ওর আস্তে আস্তে মনে পড়তে লাগলো। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলো: আমাকে সুখী করার জন্যে মা বাপ কী কিছুই করে নি? সব জমিজমা, বাড়ি ঘরদোর—আপপাকে মা-বাবা লিখে দিয়েছে। বুড়ো বয়েসে কে দেখবে ওদের? আমি মা-বাবাকে কি সুখ দিয়েছি বিনিময়ে? আমি মারা গেলে—মা-বাবার কী হবে?—সহসা বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা খুব তীব্র হয়ে উঠলো তারার। নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেমন উজ্জ্বলন্ত হয়ে ওঠে, তারাও সেইভাবে উজ্জ্বলন্ত হয়ে উঠলো।

তারা প্রায় মাসখানেক শয্যাশায়ী থাকার পর বদ্যির ওষুধ খেয়ে, মায়ের সেবা-যত্নে একটু সুস্থ হয়ে উঠলো। মাঝে-মাঝে বাইরে এসে বসতে পারতো। শরীর খুবই দুর্বল, রক্তস্রাব বন্ধ হয় নি। গাঁয়ের

লোক, যারা ওষুধপত্তরের খবর রাখে, তারা প্রত্যহ জবাকুসুমের ওষুধ দিয়ে যেতো। রত্নাও এই সময়ের মধ্যে একবারও বাড়ি যায়নি। এই অবস্থায় মেয়েকে একা ছেড়ে যেতে কোন মা চায়? তবুও, একবার বাড়ি না গেলেই নয়। তাই, মেয়েকে বললো, 'তারা—আমি দিন চারেকের জন্যে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি?'

'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

'পাগল! এই শরীর নিয়ে তুই বেরোবি কেমন ক'রে?'

তারা চুপ ক'রে গেলো। মা'র সঙ্গে সে যেতে চেয়েছিলো অন্য কারণে। আপপা আর একটা বিয়ের চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে বাড়িতে রয়েছে ব'লে করতে পারছে না। মা'কে সে জিজ্ঞেস করলো, 'আবার কবে আসবে?' মা বোঝালো, 'তাড়াতাড়ি আসবো—এর মধ্যে তোর বাবাকেও পাঠাবো একদিন।'

যাবার সময় তারা মা'কে চুপি-চুপি বললো, 'অনন্তর কোনো খোঁজ খবর পেলে বাবাকে দিয়ে খবর পাঠিও।'

অনন্তর নাম শুনে তারার ছেলেবেলার কথা রত্নারও মনে পড়লো। একসঙ্গে হেসে-খেলে-লাফিয়ে দু'জনে বড়ো হয়ে উঠেছে—অনন্তর কথা তারার পক্ষে ভোলা সম্ভব কী ক'রে? রত্না তারাকে বললো, 'একটা কথা বলছি—তুই আপপার সামনে এসব খবর নিস নি। অন্তর খবর তোকে নিশ্চয়ই পাঠাবো।'

তারা কথাটা শুনে একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'কেন? এতো জোরজুলুম কেন? জমিজমা সবই তো ওকে দিয়ে দিয়েছো তোমরা। ভেবেছিলো, সবই তোমরা বুঝি অনন্তকে দিয়ে যাবে—কিন্তু এখন তো আর সে ভয় নেই? তবে, আমার ওপর কেন এই জুলুম? নিজের ইচ্ছে মতো আমি কারুর খবর নিতে পারবো না?'

তারাকে চুপ করিয়ে দিলো রত্না, 'ওসব কথা আর তুলিস নি। যা হবার হয়ে গেছে···বলতে বলতে রত্না মেয়ের গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলো জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, 'একী! তোর জ্বর। শুয়ে পড় এখুনি—এসব কথা ভাবছিস কেন? তোকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে!'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা—আমাকে ভূতেও পায়নি—আমি পাগলও হয়ে যাইনি। আমি পাথরের মতো হয়ে গেছি, এই দেখো—' ব'লে তারা নিজের বুক চাপড়াতে লাগলো পাগলের মতো। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো রত্না। তারাকে এই অবস্থায় একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। ফলে, সেদিন আর রত্নার যাওয়া হোলো না।

পরের দিন মেয়ের অবস্থা একটু ভালোর দিকে যেতে রত্না চন্দুরে গেলো।

এইভাবে আরও একটি মাস কাটলো।

তারা মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলো—যদিও মুখটা শীর্ণ, মলিন থেকেই গেলো। মল্ল মেয়েকে দেখতে এসে জামাইকে বললো, 'আমার ওখানে দিন চারেকের জন্যে পাঠিয়ে দাও—জল-হাওয়া বদলালে ওর পক্ষেই ভালোই হবে।' পরের দিনই, আপপা বাপ-বেটিকে চন্দুরে পৌঁছে দিলো। মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে এলেও মল্ল কিন্তু মেয়ের শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে ভাবতে লাগলো। রাস্তায় যেতে-যেতে তাই বললো, একটু থেকে—মানে দু একদিন থেকে আবার আপপার কাছে চলে যাস। মেয়েদের বেশি বাপের বাড়ি থাকাটা ঠিক নয়।' বাড়ি পৌঁছতে, রত্না-ও প্রায় একই কথা মেয়েকে শোনালো।

চন্দুরে এসে অনন্তর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে তীব্র হয়ে উঠলেও তারা মা-বাবার সামনে কিছু বলতে পারলো না। মা বাবা যে রাজি হবে না—তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো। একদিন সে করলো কি, বাড়ির চাকরটার হাতে একটা টাকা দিয়ে বললো, 'এনাপুরে গিয়ে দেখে আয় তো অনন্ত ফিরেছে কি না—যদি ফিরে আসে, তাহলে এখানে দু তিন দিনের জন্যে আসতে বলিস আমার নাম ক'রে।'

পরের দিনই লোকটি এনাপুর থেকে ফিরে এলো। রত্নার সামনেই সে বলে ফেললো, 'এখনো গাঁয়ে ফেরে নি।'

'কে?' রত্না আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

তারা সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলো 'শিব আসেনি এখানো? ঠিক আছে—তুই যা।'

লোকটি আর কিছু বলার সুযোগ না পেয়ে চলে গেলো।

রত্না কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলো, 'তোরা কার কথা বলছিলি ?'

'ওই যে বদ্যি।' গাঁয়ের এক কবিরাজের নাম করলো সে।

ওর ওষুধে তো তোর আগে কোনো কাজ হয় নি—'

'তবুও, একবার দেখছি, যদি এবারটা···'

মা'কে কাটিয়ে তারা মন্দিরে গেলো—মন্দিরে রাস্তায় শিবাপপা—সেই লোকটির সঙ্গে দেখা করার জন্যে। দেখা হতে অনন্ত সম্বন্ধে সে সব খবরই আস্তে আস্তে জেনে নিলো। তেরদাল ছাড়ার পর অনন্তর কোনো খবর কেউ পায় নি, দিন পনেরো পর জানা গেলো সে মিরজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখনো সে হাসপাতালেই আছে। সঙ্গে দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই—আর ডাক্তারও কাউকে অনন্তর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিচ্ছে না।

কয়েকদিন পর তারা হীরাগিরিতে চলে গেলো। অনন্তর সঙ্গে দেখা হোলো না।

এখানে এসে তারা যথারীতি আগের মতো বাড়ির সব কাজ ক'রে যেতে লাগলো। একদিন আপপা গ্রাম থেকে এক ঝুড়ি আম নিয়ে এলো। ক'দিন ধরেই তারা বলছিলো ওর নাকি পেট গরম হয়েছে—প্রস্রাবে অসম্ভব জ্বালা। কাজেই, পেট ঠাণ্ডা করার জন্যে আমই সেরা ওষুধ এই ভেবে আপপা আম এনেছিলো। শস্তা, রোদে পাকা আম। এমনিতে তারা অসুস্থ, এই আম খেয়ে সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লো। জ্বর হোলো অল্প-অল্প।

রাতে, আপপা তারার গায়ে হাত দিলো।

'আজও শরীরটা খারাপ লাগছে।' তারা বলে উঠলো।

'ধ্যুৎ! তোমার ওই রকম মনে হচ্ছে—' বলে' আপপা তারাকে আরো কাছে টানার চেষ্টা করলো, 'দু তিন মাস হয়ে গেলো—'

তারা জবাব দিলো, 'মাঝে দিন চারেক ঠিক ছিলুম, আম খেয়েই—'

'আম খেয়ে কারুর শরীর খারাপ হয় নাকী? যত্তো সব বাজে

কথা !' আপপা একটু রেগে গেলো।

তারা আর কিছু বললো না। শরীরটা স্বামীর উপভোগের বস্তু হিসেবে মেলে ধরলো নিরুপায় হ'য়ে।

ভোর হোলো। তারার বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলো না। আপপা যথারীতি নিজের কাজে বেরিয়ে গেলো। অম্বা এলো তারাকে জাগাতে। তারার সারা শরীর যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে—এতো জ্বর। অম্বা চমকে উঠলো, 'এতো জ্বর! ভগবান ওঃ জ্বর তুমি আমার গায়ে দাও!' অম্বা আকুল প্রার্থনা জানালো ঈশ্বরের কাছে। খবর পেয়ে আপপা-ও এলো! মনে মনে বিব্রত হলেও মুখে বললো: 'ও কিছু নয়—দু একদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু, অস্বস্তি ভাবটা কাটলো না।

দু তিন দিন কেটে গেলো। আপপা রোজই ভাবে, আজ জ্বর কমবে। কাল জ্বর কমবে। কিন্তু, জ্বর কমা তো দূরের কথা, আরও বেড়ে গেলো। মাঝে-মাঝে অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো তারা। আপপার বিব্রতভাব এখনো যায় নি। সে তারার সেবাযত্ন করে যেতে লাগলো এক মনে। একবার তারার মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে মাথাটা টিপে দিচ্ছে, হঠাৎ তারার চোখ খুললো। একজোড়া চোখ এমনভাবে ভেসে উঠলো—আপপা আর তাকিয়ে থাকতে পারলো না, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তারাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো: কেমন লাগছে?

শব্দহীনভবে তারার ঠোঁট নড়ে' উঠলো কথা বলার চেষ্টায়। কোনো ক্রমে কাটা-কাটা শব্দে ক্ষীণ স্বরে বলার চেষ্টা করলো সে: মা'কে—বাবাকে—খবর দাও।

কথাগুলো কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপপার মনে হোলো সে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে সে বেরিয়ে এলো কামরা থেকে। বাইরে এসে একজন চাকরকে চটপট চন্দুরে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসতে ব'লে—সে আবার ফিরে এলো কামরার মধ্যে। মনে-মনে ছটফট করতে লাগলো, ভগবানকে ডাকলো: হে ভগবান—ওকে এইবারটি বাঁচিয়ে দাও। কিন্তু ওর যেন মনে হোলো, বিরাট দুটি কালো হাত তারার মুখ ঢেকে দিচ্ছে, কে যেন বলছে: মূর্খ কোথাকার!

আপপা আরও অস্বস্তি বোধ করে আর দাঁড়াতে পারলো না। তারার কাছ থেকে একটু সরে বসলো। জ্বরের ঘোরে তারার প্রলাপ শোনা গেলো : আমার কাছে বোসো না—আমাকে ছুঁও না—যাও বলছি! যাও—

আপপা এবার কামরা থেকে বেরিয়ে এসে মা'র সঙ্গে কথা বললো। পাশের ঘরে ভাই আর কাকী। সবাই মিলে পরামর্শ করার পর, সন্ধ্যের দিকে—গাড়িতে শুইয়ে—ওরা তারাকে নিয়ে গেলো তেরদালের সরকারী ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার তারাকে পরীক্ষা করার পর, একজন নার্স'কে ডেকে ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন আরো ব্যক্তিগত পরীক্ষার জন্যে। ইতিমধ্যে, তারাকে যারা নিয়ে এসেছিলো তাদের কাছ থেকে গর্ভপাতের ঘটনা থেকে সব বৃত্তান্তই শুনে নিলেন। ভেতরে, নার্স যখন তারাকে পরীক্ষা করছিলো—তারা একবারের জন্যে তাকিয়েছিলো ভীষণ-আশ্চর্য-চোখে। নার্স এসে ডাক্তারকে জানালো, গর্ভপাত নয়, বোধহয় প্রমেহর জন্যে···।

ডাক্তার সকালে আপপাকে চারদিনের মতো ওষুধ দিয়ে তারাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বললেন। তারপর, আপপাদের একজনকে আলাদা ভাবে ডেকে জানালেন, 'বাঁচার আশা নেই। মা বাবা থাকলে চলে আসতে বলো।'

গাড়ির ভেতর তারাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিলো। জ্ঞানও ফিরে এসেছিলো। চোখ খুলে আপপাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি এখানে শুয়ে আছি কেন?

'বাঃ! বাড়ি যাবে না—বুঝি?'

'বাড়ি? আবার বাড়ি?'—তারপর মিনতির সুরে, 'আমাকে একবার মা'র কাছে নিয়ে চলো না!'

'মা'কে খবর দিয়েছি। এতক্ষণে এসে গেছে বোধহয়।'

'এসে গেছে?' তারা চোখ দুটো আবার বুজিয়ে ফেললো। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার আবার চোখ মেললো, জল-ভরা করুণাঘন

চোখে তাকালো আপপার দিকে, 'আমার একটা কথা রাখবে—দোহাই?—আমাকে একবার চন্দুরে নিয়ে যাও। একবারটি—'

আপপারও চোখে জল। সে তারার ইচ্ছে মতো গাড়োয়ানকে বললো চন্দুরের পথ ধরার জন্যে—আর একজন বললো বাগানে খবরটা দিতে। গাড়ি চন্দুরের পথে এগোলো। রোদের তেজ ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠলো। ধুলো-উড়িয়ে-এগিয়ে চলা গাড়িটাকে দূরে থেকে এক পলাতক নক্ষত্রের মতো মনে হোলো। গাড়ির ছাউনির মধ্যে তারা তখন চেতনহীন।

রাত দুটোর সময় মল্লদের উঠোনে এসে গাড়িটা থামলো। ঘরে মল্ল বা রত্না কেউ ছিলো না। ওরা সকালেই হীরাগিরিতে চলে গেছে। তালা ভেঙে তারাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হোলো। একটু জ্ঞান ফিরেছে ওর—গাঁয়ে এসেছে ব'লে ওর শীর্ণ মুখে প্রশান্তির এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো। চেতনাপ্রবাহী মনে একটি চিন্তা ভেসে উঠলো : 'আমার সব আছে, মা বাবা শাশুড়ি স্বামী—কিন্তু ওর কে আছে?'... মনের পর্দায় পর পর তিনটে ছবি সেই মুহূর্তে ঝলসে উঠলো : অনন্ত, ভরমা, আপপা। শুধু অনন্তকে একবার দেখে যদি মরে যেতো—তাহলে কোনো ক্ষেদ থাকতো না জীবনে।

পরের দিন দুপুরে মল্ল আর রত্না এলো হীরাগিরি থেকে। মেয়ের অবস্থা দেখে রত্নার মনটা ধক করে উঠলো।

তারার যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়ছে। দু দিন ধরে অতিকষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসছে। বিছানার পাশে সবাই বসে। তারা মা'কে বললো অতিকষ্টে, 'মা—অনন্তকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব।'

রত্না আপপার দিকে তাকালো। আপপা বললো, 'ঠিক আছে—আমি খবর পাঠাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে আপপা লোক পাঠাবার বন্দোবস্ত করলো এনাপুরে। একদিন কাটলো।

তারার দেহে ছোট্ট একটা দানার মতো গুটি দেখা দিলো। রত্না

'মা'র দয়া' হয়েছে সন্দেহ ক'রে দু একজন লোককে ডেকে দেখালো। ওরা দেখে বললো, 'না—মা'র দয়া' নয়।' তারা নিশ্চুপ হয়ে বিছানায় পড়ে' রইলো। পাঁচ ছ দিন বাড়ি ছাড়া—আপপা একবার বাড়ি গিয়ে—দু দিন পরেই ফিরে এলো।

রাতে, মা'কে জিজ্ঞেস করলো তারা, 'বুড়ো বয়েসে তোমাদের কে দেখবে মা? আমি তো আর বাঁচবো না।'

চোখের জল মুছে রত্না কান্না-ভরা গলায় জবাব দিলো, 'ছিঃ! ওসব বলতে নেই—তুই ঠিক সেরে উঠবি, দেখিস।'

'ভালো লাগছে না মা—বুকটা কেমন করছে—পেট জ্বালা করছে।'

'পেট গরম হয়ে গেছে বোধ হয়।'

'একটু জল দাও মা—বড়ো তেষ্টা পাচ্ছে।'

রত্না জল দিলো, 'বেশি খাসনি কিন্তু—'

'আর কী হবে—' ব'লে তারা বোধহয় একটু বেশিই জল খেলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'অনন্ত এলো না?'

রত্না চুপ করে রইলো। তারা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'অনন্ত এলো না?'

'খবর পাঠিয়েছি। এখনো কেন এলো না, বুঝতে পারছি না।'

'আসবে না।' ব'লে তারা আবার শুয়ে পড়লো। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়লো। আপপা ঘুমচ্ছিলো, জেগে উঠে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

তারা আর একবার তাকালো শূন্য চোখে, 'অনন্ত··· ?'

'অনন্ত গাঁয়ে নেই।' ব'লে আপপা বেরিয়ে এসে সিন্দিকে বললো, 'তুই এখুনি একবার সিরজি হাসপাতালে গিয়ে অনন্তর খোঁজ কর। বল, তারার অবস্থা খারাপ হচ্ছে ক্রমশ—যেভাবে হোক যেন ভোরবেলায় সে এখানে চলে আসে।···দেরি করিস নি, অনন্তকে খুঁজে নিয়ে আয়।' কামরার মধ্যে এসে তারার উদ্দেশে সে জানালো, 'আবার লোক পাঠালুম অনন্তকে ডাকার জন্যে।'

তারা কৃতজ্ঞ চোখে তাকালো আপপার দিকে, তারপর রত্নাকে

বললো, 'মা, তোমাদের কী হবে?' এই ব'লে সে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। রত্নাও।

এইভাবে সকাল হোলো। নিসর্গীয় নিয়ম অনুসারে দিন লাফ মেরে এগিয়ে চললো কড়া রোদের মধ্যে। তারার বিছানা রক্তে ভিজে গেছে। রত্না হতবাক হয়ে শুধু ভাবলো, মেয়ের মৃত্যুও হচ্ছে ভয়ানক কষ্টের মধ্যে। রত্না স্পষ্ট বুঝতে পারছে মেয়ে আর বাঁচবে না। উঠোনে মল্ল ঠায় বসে আছে—তিনদিন তার চোখে ঘুম নেই। লোক এসে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। রত্না তারার কাছ থেকে নড়ছে না। ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে। কাজল ঘন হচ্ছে। গভীর রাতে তারা ক্ষীণস্বরে ডাক দিলো: মা।

'বল।'

'আমাকে বাইরে শুইয়ে দাও।'

'কেন?'

'একটু হাওয়া। দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

মেয়ের অন্তিম ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্যে রত্না বাইরে একটা পুরু গদি দিয়ে বিছানা পাতলো। মল্ল মেয়েকে কোলে ক'রে এনে শুইয়ে দিলো সেখানে। রত্না জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ রে—চা খাবি একটু? করে আনবো?'

'চা?' তারা ঘাড় নেড়ে জানালো, 'খাবো।'

রত্না চা এনে মেয়ের ঠোঁটে একটু-একটু ক'রে ঢেলে দিলো চামচে করে। খুব তৃপ্তির সঙ্গে রত্না সেই চা খেলো। খানিক পরে, তারা আবার অস্ফূট উচ্চারণে জানতে চাইলো: সিন্দা ফিরেছে?

'না তো। কেন রে?'

'বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছে অনন্তকে।'

আরো কিছু সময় কাটলো। বিছানার পাশে জনা চারেক। প্রদীপের আলো আরো ক্ষীণ। শব্দহীন মুহূর্তগুলোর মধ্যে শুধু তারার অস্বাভাবিক নিঃশ্বাস পতনের শব্দ।

'রাত কতো?' তারা মুমূর্ষু গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'ভোর হয়ে এলো।' মল্ল জবাব দিলো।

'অনন্ত?'

'এখনো আসেনি।'

তারা সহসা রত্নাকে বললো, 'মা আমার পায়ে—'

রত্না তাড়াতাড়ি মেয়ের পায়ে হাত দিলো। বিছানার পাশে জনা চারেকের একজন ফিসফিস করে বললো, 'বোধহয় পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।' পায়ের ওপর হাত দিয়েই রত্না কান্নায় ভেঙে পড়লো। সব শেষ হয়ে আসছে।

'রত্না—কেঁদো না, ওকে শান্তিতে যেতে দাও।' সবাই বোঝাবার, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো।

সকাল হোলো। লোকগুলো একভাবে ব'সে। আপপার কোলে তারার মাথা। খুব ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে। মুখে সবাই চামচে করে জল দিচ্ছে। কানে একজন 'ওম্' মন্ত্র দিলো। শেষবারের মতো তারা চোখ খুলে, চারিদিক দেখে, আবার বুজিয়ে ফেললো। শেষ নিঃশ্বাস অনন্ত আকাশের নিঃসীম নীলিমার মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

খবর শুনে বহুজন এলো। তারার দেহটাকে ওরা বয়ে নিয়ে চললো নদির ধার দিয়ে···

ছোট্ট একটা গাড়িতে অনন্তকে বসিয়ে ভঙ্গারি বললো, 'তোমার শরীর খুব দুর্বল। আমি যাবো সঙ্গে?'

'তুমি? তারার সামনে তোমাকে নিয়ে দাঁড়াবো কেমন ক'রে?'

খুব অবহেলার সঙ্গে অনন্ত কথাগুলো বলতে ভঙ্গারির চোখে জল এলো। লুকিয়ে সে চোখ মুছলো।

গাড়ি ছেড়ে দিলো।

সিন্দা বললো, 'তিন দিন ধ'রে আপনাকে খুঁজে খুঁজে হাললাক হয়ে গিয়েছিলুম।'

'তুমি যখন আসো—তখন কেমন দেখে এসেছিলে ওকে?'

'ততো ভালো নয়।

'চন্দুরে ক'দিন হোলো এসেছে ?'

'পাঁচ ছ দিন। এনাপুরে তিন দিন ধরে খুঁজেছি আপনাকে—তারপর এখানে এসে ডাক্তারের অনুমতি না পাওয়ায় আর একদিন গেলো—'

গাড়ি প্রচণ্ড জোরে এগোলেও অনন্তর মনে হোলো গাড়ি বড়ো ধীরে যাচ্ছে। চন্দুর দু ঘণ্টার পথ—কিন্তু এতো দেরি হচ্ছে কেন? অনন্ত ড্রাইভারকে বললো আরো জোরে গাড়ি চালাবার জন্যে। জানালার পাশ দিয়ে চলন্ত গ্রাম ওর চোখে পড়লো না। গাড়ির মধ্যে বসে অনন্ত প্রায় উন্মাদের মতো আশ্চর্য হয়ে উঠলো। ছটফট করতে লাগলো। সিন্দাকে জিজ্ঞেস করলো, 'সিন্দা, আর কতদূর ?'

'এই তো এসে গেলো। আর একটু।'

'আমি গিয়ে ওকে দেখতে পাবো তো ?'

সিন্দা প্রবোধ দিলো, 'নিশ্চয় পাবেন।'

সহসা আকাশের দিকে হাত-জোড়া করলো অনন্ত ঃ ভগবান !

চন্দুরের কাছে এসে গাড়িটা যখন পৌছলো তখন প্রায় ন'টা। গাঁয়ের দিক থেকে একটা লোক আসছে দেখে, অনন্ত গাড়িটা থামাতে বললো ড্রাইভারকে। এগিয়ে-আসা লোকটির উদ্দেশে অনন্ত গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাই—তারা কেমন আছে বলতে পারো ?'

'কোন তারা ?' লোকটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'মগডুমের মল্ল—রত্নার মেয়ে।'

অনন্তর অবস্থা দেখে লোকটি একটু চুপ ক'রে থেকে, তারপর বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিলো, 'তারা—আর নেই। আজ সকালে। সোনার মতো মেয়ে ছিলো আমাদের তারা।'

অনন্তর মনে হোলো ওর হৃৎপিণ্ডটা এখনই বুঝি কেউ ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখ দুটো কেমন যেন রক্তহীন, সাদা দেখালো।

সেই লোকটি আবার বললো, 'নদির ধার দিয়ে এগোলে দেখতে পাবেন, এই আধ ঘণ্টা হোলো ওকে নিয়ে গেছে।'

অনন্ত ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ছুটছে। ছুট। ছুট।

খেত। মাঠ। ঘাট। সিন্দাও ছুটছে : দাঁড়ান—আপনাকে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাবো—আপনার শরীর খারাপ—ভেইয়া—য্যা— !

অনন্ত মরিয়া হয়ে দৌড়তে লাগলো। পেছন ফিরে তাকালো না। কখনো হোঁচট খেয়ে পড়ছে, তবুও ছুটছে। সিন্দা অনন্তর হাত ধরে' ফেললো। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে—সেই অবস্থাতেই অনন্ত ছুটতে-ছুটতে শ্মশানের কাছে এসে পৌঁছলো।

চিতার আগুন জ্বলছে—অনন্ত দূর থেকে দেখলো। তারা জ্বলে' ছাই হয়ে যাচ্ছে—দ্রুত ধাবমান ছবির মতো পুরোনো, পরিচিত দিনগুলো অনন্তর চোখের সামনে ভেসে উঠতে সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটির ওপর।

সিন্দা হাত ধরে ওকে তুলে বসিয়ে দিলো। চুপচাপ, নিশ্চুপ হয়ে অনন্ত বসে রইলো কিছুক্ষণ। মনে হোলো কি যেন ভাবছে। ছেলেবেলার দুপুর থেকে মেলায় দেখা ভোরবেলার চাঁদ—সবই যেন চলচ্চিত্রের মতো দ্রুত ধাবমান হোলো ওর চোখে। সেই মুহূর্তে অনন্তর সারা মুখে আশ্চর্য এক উজ্জ্বল আভা দেখা দিলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, সিন্দার হাত ছাড়িয়ে, সে আচমকা দৌড়ে গেলো তারার জ্বলন্ত চিতার দিকে।

'ধরো! ধরো!' ব'লে সিন্দা চেঁচিয়ে উঠলো।

সিন্দার চিৎকার শুনে সবাই ঘুরে দাঁড়ালো কান্নায় ভেঙে-পড়া মল্লুও ফিরে তাকালো, 'কী হয়েছে?' প্রথমে কেউ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না, সেই অবসরে অনন্ত চিতার মধ্যে ঝাঁপ দিতে সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচ ছ জন মিলে ওকে টেনে বের করে নিলো।

সংজ্ঞাহীন অনন্ত মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো : আর উঠলো না।

'নিসর্গ' এক অসফল বাল্যপ্রণয়ের কাহিনী। কন্নড় ঔপন্যাসিক মির্জি অণ্ণারায় বেলগাঁওয়ের উত্তর সীমার এক গ্রামীণ পরিবেশে নিম্ন মধ্যবিত্ত অসংস্কৃত গ্রাম্য জীবনের পটভূমিতে এই উপন্যাস লিখেছেন। রক্ষণশীলতা মানুষের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্খার প্রস্ফুটন ঘটাতে পারে না। তারই বলি হয় দু'টি কিশোর হৃদয়। নিজেদের অসাফল্যের উপলব্ধি যখন তাদের মধ্যে প্রকট—তখন বয়ে গেছে অনেকদিন। স্মৃতি ছাড়া তাদের কাছে তখন ঐশ্বর্য ব'লে কিছুই নেই।

কন্নড় সাহিত্যে অম্বারায় এক বিশেষ নাম। সমালোচকদের মতে 'নিসর্গ' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-কৃতি.

অনুবাদক ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী সাংবাদিক। এই উপন্যাসটির অনুবাদ তাঁর এক বিশেষ কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া